মাসুদ রানা

সেই কুয়াশা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



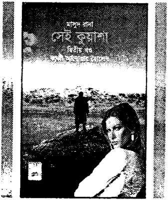
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪১৩

সেই কুয়াশা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7413-0

এক

ভিয়া ফ্রাস্কাতি-তে দামি একটা রেস্তোরাঁ আছে, লুচিনি নামের তিন ভাই সেটার মালিক, যদিও রেস্তোরাঁ চালায় স্রেফ বড়জন। চতুর শেয়ালের মত স্বভাব, তবে সাদাসিধে চেহারা আর নিষ্পাপ অভিনয়ের মুখোশ দিয়ে নিজের আসল চরিত্র লুকিয়ে রাখায় সে ওস্তাদ। রোমের উঁচুমহলের লোকজনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এই লুচিনি, কারণ গোমর রক্ষার ব্যাপারে তার জুড়ি হয় না। উঁচু স্তরের দালাল হিসেবে কাজ করে সে, তার মাধ্যমেই যোগাযোগ রক্ষা করে অগণিত মানুষ—তাঁদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের জালে জড়ানো প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন আছে, তেমনি আছে অসৎ সরকারি কর্মকর্তা আর অন্ধকার জগতের মানুষ। অনিশ্চয়তা আর অবিশ্বাসের সাগরে সে যেন এক অনড় দ্বীপ, যেখানে ভিড় জমায় সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা মানুষেরা।

লুচিনিকে বহুদিন থেকেই ইনফর্মার হিসেবে ব্যবহার করছে মাসুদ রানা, সে-ও টাকার বিনিময়ে খুশিমনেই কাজ করছে ওর হয়ে। এমন কোনও খবর নেই, যা তার কাছে পাওয়া যায় না। যে-কোনও গুজব, বা কানাঘুষোর আড়ালে কতখানি সত্য লুকিয়ে আছে, তা একমাত্র লুচিনি-ই বলতে পারে। বিয়াঞ্চি পরিবারের বংশধরদেরকে ট্র্যাক করবার জন্য তার সাহায্য নেবার কথা এমনিতেই ভাবছিল রানা, সোনিয়া মায়োলার সঙ্গে কথা বলবার

পর লুচিনির সঙ্গে যোগাযোগ করাটা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিয়াঞ্চি পরিবার এখন বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি নামে পরিচিত। ওই সার্কেলের খোঁজখবর নিতে হলে ধূর্ত রেস্তোরাঁমালিকের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। ওখানেই আজ দুপুরে লাঞ্চ সারবে বলে ঠিক করেছে ও।

হোটেলের জানালা গলে কামরায় ঢুকছে রোদ। নীচে... ভিয়া ভেনেতো-র রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ। ঘড়ি দেখল রানা, লাঞ্চের এখনও অনেক দেরি। বারোটাও বাজেনি। রুমিং হাউসে আর ফেরা যাবে না, তাই ডা. চক্রবর্তীর অফিস থেকেই *লানিস্তা* হোটেলের এই স্যুইটটা রিজার্ভ করেছিল ও। ম্যানেজার ওর পূর্ব-পরিচিত, তাই রাত একটার সময় সার্ভিস এন্ট্রান্স দিয়ে ভিতরে ঢুকতে অসুবিধে হয়নি। কামরায় পৌঁছেই জোর করে ঘুমাতে পাঠিয়েছে সোনিয়াকে। নিরাপত্তামূলক কয়েকটা ব্যবস্থা নেবার পর নিজে শুয়েছে রাত আড়াইটার সময়... স্যুইটের বসার ঘরে, সোফায়।

কফির কাপে চুমুক দিল রানা, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। ঘুম ভাল হয়নি। সকাল ন'টায় উঠে পড়েছে, নাশতা সেরে বেরিয়ে গিয়েছিল কেনাকাটার জন্য। রুমিং হাউস ছাড়ার সময় ভিয়া কণ্ডোট্টি থেকে সোনিয়ার জন্য কেনা কাপড়গুলো ডাফল ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছে ও, কিন্তু ওগুলোর সঙ্গে মেকাপের সরঞ্জাম নেই। তাই হোটেল সংলগ্ন একটা দোকানে গিয়ে মেকাপ-কিট কিনেছে মেয়েটার জন্য... আর কিনেছে একটা বড়-সড় *গুচ্চি* সানগ্লাস। মেকাপের রঙ দিয়ে মুখের দাগ ঢাকবে সোনিয়া, আর সানগ্লাসে ঢাকবে কালসিটে পড়া চোখ। যখন ফিরল, তখনও জাগেনি সোনিয়া। ওর পোশাক আর মেকাপের সরঞ্জাম বিছানার পাশে রেখে এসেছে রানা। তারপর সামনের কামরায় বসে অর্ডার দিয়েছে

কফির। জানালার পাশে বসে নজর রাখছে বাইরে।

স্যুইটের বেডরুমের দরজায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। ঘুম ভেঙেছে সোনিয়ার, বেরিয়ে এসেছে কামরা থেকে। কালসিটে দাগে ভরা মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। একহাতে ধরে রেখেছে হ্যাঙারে ঝোলানো সিল্কের ড্রেস। ইস্ত্রি করে ওটাই বিছানার পাশে রেখে এসেছিল রানা।

'গুড মর্নিং!' বলল ও।

পাল্টা অভিবাদন জানাল না সোনিয়া। কপট রাগ ফুটিয়ে বলল, 'তুমি কি আমার কাজের লোক?' উঁচু করল ড্রেসটা। 'পোশাকটা আমি নিজেই ঠিকঠাক করে নিতে পারতাম না?'

'তুমি ইস্ত্রির সময় পাবে না,' রানা বলল। 'তাই কাজ এগিয়ে রেখেছি। অসুবিধে কোথায়?'

'এ-ধরনের সেবা পেতে অভ্যস্ত নই আমি,' সামনে এগিয়ে এল সোনিয়া। 'রাজকুমারীর মত লাগছে নিজেকে, চারপাশে যেন ভক্তরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কাজ করে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমার ভিতরের সমাজবাদী আদর্শ সেটা মানতে পারছে না।'

'আবার ভাষণ শুরু হয়ে গেল?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'স্রেফ একটা ড্রেস ইস্ত্রি করে দিয়েছি, তোমার হাত-পা তো আর টিপে দিইনি! তা হলে নাহয় সেবাযত্ন বলা যেত! অযথা বকবক না করে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি কফির অর্ডার দিচ্ছি।'

'শুধু কফি?' ভুরু কোঁচকাল সোনিয়া।

'ব্রেকফাস্টের সময় নেই। তুমি তৈরি হয়ে নিলে আমরা আর্লি-লাঞ্চে যাব। বিছানার পাশে মেকাপ-কিট পেয়েছ তো? ওটা ব্যবহার কোরো।'

'লাঞ্চ? এত তাড়াতাড়ি?'

'আসলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা। যাও,

দেরি কোরো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সোনিয়া। একটু পর বেডরুম থেকে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জন—মনে হলো কর্সিকান কোনও গানের সুর ভাঁজছে মেয়েটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, স্বাভাবিক হয়ে আসছে সোনিয়া। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে গিয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে শুরু করেছে। এই অনুভূতির স্থায়িত্ব কতটুকু হবে, সেটাই প্রশ্ন। সামনে ভয়ানক বিপদ আসছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে। বিয়াঞ্চি পরিবারের পিছনে লাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবে বিপদ। তখনও কি এই ভাব বজায় থাকবে মেয়েটার?

অর্ডার দিয়ে নতুন করে কফি আনাল রানা। তার খানিক পরেই থেমে গেল গুনগুন। বেডরুমের দরজা খুলে গেল, মার্বেলের মেঝেতে হাই-হিলের আওয়াজ পেল ও। ঘাড় ফেরাল রানা, ক্ষণিকের জন্য প্রশংসা ফুটল চোখে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো অপরূপাকে দেখে। চেনাই যাচ্ছে না সোনিয়াকে, পুরোপুরি বদলে গেছে দামি পোশাক আর মেকাপের কল্যাণে। কর্সিকার রোদে পোড়া ব্রোঞ্জ কালারের কোমল চামড়ার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে লাল-কালো সিল্কের ড্রেস। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটদুটো যেন চুমো খাবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সুন্দর চুলের গোছার একাংশ ঢাকা পড়েছে সাদা রঙের হ্যাটের তলায়, বাকিটা ঝুলে আছে বুকের উপর। তাকাবার পর আর দৃষ্টি সরাতে ইচ্ছে হয় না।

'কেমন লাগছে আমাকে?' জানতে চাইল সোনিয়া।

ঢোঁক গিলল রানা। 'সুন্দর।'

গালের কাছে একটা হাত তুলল সোনিয়া। 'মুখের দাগগুলো দেখা যাচ্ছে না তো?'

'ভুলেই গিয়েছিলাম ওগুলোর কথা!'

'তারমানে ঠিকই আছে।' এগিয়ে এল সোনিয়া। কফির কাপ

তুলে নিল।

'শারীরিক কোনও অসুবিধে নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ন... না।'

'মিথ্যে বলছ,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ব্যথা আছে এখনও, তাই না?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' ইতস্তত করে স্বীকার করল সোনিয়া। তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'কিন্তু সিরিয়াস কিছু নয়। তোমার ওই ডাক্তার ভদ্রলোক দারুণ ওষুধ দিয়েছেন। খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না আর।'

'কখনও কোনও অসুবিধে হলেই চলে যেয়ো ওঁর কাছে,' বলল রানা। 'ঠিকানা মনে আছে তো?'

'এমনভাবে বলছ, যেন তুমি থাকবে না আমার সঙ্গে,' ভুরু কোঁচকাল সোনিয়া। 'একসঙ্গে কাজ করব আমরা, এমনটাই কিন্তু কথা হয়েছে!'

'হুঁ। কিন্তু কাজের ধারা এখনও ব্যাখ্যা করিনি আমি। রোমে আপাতত একসঙ্গে থাকব আমরা। যা তথ্য পাব, সেটার ভিত্তিতে এগিয়ে যাব আমি; আর তুমি এখানে থেকে আমার আর কুয়াশার মধ্যে লিয়াজোঁ মেইনটেইন করবে।'

'পোস্টাফিস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছ আমাকে? ওটা আবার কেমনতরো কাজ?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেতে যেতে ব্যাখ্যা করব। কফি শেষ করো, আমি আমার হ্যাট আর তোমার কোট নিয়ে আসছি।' ক্লজিটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল রানা। সোনিয়াকে চকিতের জন্য ঠোঁট কামড়াতে দেখেছে... নিশ্চয়ই ব্যথায়। 'সোনিয়া, আমার কথা শোনো। ব্যথা পেলে সেটা লুকানোর চেষ্টা কোরো না। তাতে কারও লাভ হবে না। কতটা খারাপ লাগছে?'

'বেশি না... সত্যি। এ-ব্যথা চলে যাবে, আমি শিয়োর! অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'ডাক্তারের কাছে যাবে আরেকবার?'

'না, প্রয়োজন নেই। চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার।'

'অবশ্যই আছে। অসুস্থ মানুষ ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ব্যথা-বেদনার কারণে ভুলভাল হয়ে যায়। আমাদের কাজে ভুলের কোনও অবকাশ নেই।'

'আমি পারব... বিশ্বাস করো! ভুল হবে না কোনও।'

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল রানা। তারপর বলল, 'বেশ, দেখা যাক।'

এক ঘণ্টা পর।

রেস্তোরাঁর ফয়েই-এ দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। লক্ষ করল রানা, আশপাশের লোকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে সোনিয়ার উপর। বিশেষ পাত্তা দিল না। ডাইনিং রুমের প্রবেশপথে, পর্দা সরিয়ে উদয় হয়েছে বড় লুচিনি। রানাকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে, দু'চোখে দানা বাঁধল শঙ্কার মেঘ। তবে তা কেটে গেল পরক্ষণে। বরাবরের মত একগাল কপট হাসি নিয়ে এগিয়ে এল লোকটা।

'বেনভেনুতো, আমিকো মিয়ো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লুচিনি।

'কেমন আছ?' লুচিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল রানা। 'আমার বান্ধবীকে তোমার *ফেটুচিনি* খাওয়াতে নিয়ে এলাম।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' মৃদু মাথা নোয়াল লুচিনি, সঙ্কেত বুঝতে পেরেছে। বিশেষ ওই খাবারটার নাম বলা মানে রানা একান্তে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। 'আমার *ফেটুচিনি* ইটালির সেরা, সিনোরিনা!' দুই অতিথিকে পথ দেখিয়ে ডাইনিং রুমের একপ্রান্তে

নিয়ে গেল রেস্তোরাঁমালিক, খালি একটা টেবিলে বসাল। 'একটু পর আপনিও বলবেন এ-কথা। তবে, আগে একটু ওয়াইন চেখে নিন। মুখের স্বাদ বাড়বে।'

চলে গেল লুচিনি। ওয়েইটার এসে ওয়াইনের বোতল দিয়ে গেল, খানিক পরে নিয়ে এল পাস্তা-সদৃশ ফেটুচিনিও। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার দেখা মিলল রেস্তোরাঁমালিকের। রানার পাশের চেয়ারে এসে বসল সে। সোনিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'আমার সঙ্গে কাজ করছে ও,' বলল রানা। 'তবে সেটা কাউকে বলা যাবে না। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়ই!' মাথা ঝাঁকাল লুচিনি।

'আমার কথাও না। কেউ যদি খোঁজ নিতে আসে, সোজা অস্বীকার করবে। সে যে-ই হোক না কেন।'

'ঠিক আছে, সেনিয়র রানা। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। কিন্তু ব্যাপারটা কী? এত রাখঢাক কেন?'

'সব তোমাকে খুলে বলা যাবে না। তবে এটুকু জেনে রাখো, মাঝে মাঝে সোনিয়া দেখা করবে তোমার সঙ্গে; আমার কাছে, কিংবা অন্য একজনের কাছে মেসেজ পাঠাবার জন্য সাহায্য করতে হবে তোমাকে।'

'আপনার এজেন্সির কী হয়েছে? মেসেজ পাঠানোর জন্য আমার সাহায্য চাইছেন যে?'

'রানা এজেন্সির উপর নজর রাখা হবে বলে সন্দেহ করছি আমি। তাই বিকল্প পন্থা ব্যবহার করা দরকার।'

'হুম! কী করতে হবে আমাকে?'

'আমি চাই মেসেজগুলো রি-রাউটিং করা হোক। আলাদা আলাদা পয়েন্ট অভ অরিজিন থেকে যাবে একেকটা মেসেজ। সেটা

ম্যানেজ করতে পারবে?'

'অসুবিধে হবার কথা না। ফিরেঞ্জ-এ আমার এক কাজিন থাকে; এথেন্স, তিউনিস আর তেল-আবিবেও কয়েকজন এক্সপোর্টার আছে আমার। আমি যা বলব, তা-ই করবে ওরা। ওসব জায়গা থেকে মেসেজ রিলে করা যাবে।'

'আর তোমার ফোন? সেটা ক্লিন তো?'

হাসল লুচিনি। 'পুরো রোমে এমন কোনও লোক নেই, যে আমার ফোনে আড়ি পাতার সাহস করতে পারে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা মনে পড়ল রানার। ক'দিন আগে একই আশ্বাস শুনেছিল তাঁর মুখে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। সেটা বলল লুচিনিকে।

'অ্যামেরিকার উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই,' হালকা গলায় বলল লুচিনি। 'ভিয়া ফ্রাস্কাতি অন্য জগৎ। কারও গোমর ফাঁস হয় না এখান থেকে।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। একটা নাম বলি, দেখি কী জানো। বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি।'

একটা চুরুট ধরাল লুচিনি। বলল, 'রক্ত খোঁজে টাকা, আর টাকা খোঁজে রক্ত। এ-ছাড়া কী-ই বা বলার আছে?'

একটু বিরক্ত হলো রানা। 'হেঁয়ালি শুনতে চাই না।'

চুরুটে টান দিল লুচিনি। 'বিয়াঞ্চিরা রোমের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা। ওদের কন্টেসা এখনও নিজের ঠাট বজায় রেখেছেন, কিন্তু সেসব লোক-দেখানো ব্যাপার। পুরো পরিবার দেউলিয়া হতে বসেছিল। অন্যদিকে পাভোরোনিদের অনেক টাকা, কিন্তু শিরায় এক বিন্দু নীল রক্ত ছিল না। বিয়ের মাধ্যমে একত্র হয়েছে দুই পরিবার... পারস্পরিক সুবিধের জন্য আর কী!'

'কার বিয়ে?'

'কন্টেসার মেয়ের সঙ্গে সেনিয়র বার্নার্দো পাভোরোনির। সে বহু বছর আগের কথা। সে-আমলেই কয়েক কোটি লিরা যৌতুক দিয়েছিল পাভোরিনি-রা; সেই টাকায় কন্টেসার ছেলে বাপের উপাধি গ্রহণ করেছে।'

'নাম কী এই ছেলের?'

'মার্সেলো। কাউন্ট মার্সেলো বিয়াঞ্চি।'

'থাকে কোথায়?'

'নির্দিষ্ট ঠিকানা বলা মুশকিল। ব্যবসার কাজে সারা বছর চরকির মত ঘুরে বেড়ায়। বোনের কাছাকাছি তিভোলিতে একটা এস্টেট আছে—*ভিলা দেস্তে:* তবে সেখানে তেমন একটা থাকে না। এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? কাউন্ট নোংরা কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত বলে ভাবছেন?'

'প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো বটেই।'

'ভুল বলেননি। মার্সেলো বিয়াঞ্চি লোক সুবিধের নয়। ব্যক্তিত্ববান মানুষ, সামনাসামনি দেখলে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি—তার ভিতরে একটা সাপ বসবাস করে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। 'তুমি কী করে জানলে?'

'কাউন্টের সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে আমার,' জানাল লুচিনি। 'বেশ ক'টা কাজ করে দিয়েছি অতীতে। কী করেছি, তা জানতে চাইবেন না। আগেই বলেছি, আমি কারও গোমর ফাঁস করি না।'

'ঠিক আছে, ওসব জিজ্ঞেস করব না,' সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'কিন্তু ওই কাউন্টের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। মাসুদ রানা হিসেবে না, অন্য কোনও পরিচয়ে। ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?'

'হয়তো... যদি উনি ইটালিতে থাকেন আর কী।'

'আছে?'

'সম্ভবত। সেদিন একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম, ক্যাউন্টের বউ একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠান করছেন তাঁদের এস্টেটে। আগামীকাল সন্ধ্যায় হবে ওটা। রোমের নামি-দামি সমস্ত মানুষ থাকবেন ওখানে। এমন ইভেন্টে অনুপস্থিত থাকার কথা না কাউন্টের।'

'আমিও ওটা মিস করতে চাই না,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল লুচিনি। 'দেখি কী করা যায়।'

হোটেলে ফিরে কাপড় বদলাল সোনিয়া। সিল্কের ড্রেসটা ক্লজিটে ঢুকিয়ে রাখার আগে কোলের উপর রেখে হাত বোলাল কিছুক্ষণ, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না জিনিসটা ওর। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল রানা, ভাল লাগল। পোশাক নিয়ে ব্যস্ত মেয়েটা, মন থেকে হারিয়ে গেছে বন্দিত্ব আর বিপদ-আপদের চিন্তা। স্বাভাবিক হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'কী ভাবছ?'

সোনিয়ার কণ্ঠ শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল সোফায়। বলল, 'না... কিছু না।'

'অবশ্যই কিছু ভাবছ,' বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল সোনিয়া। 'তাকিয়ে আছ আমার দিকে, কিন্তু মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।'

'আসলে তোমার কথাই ভাবছি। ড্রেসটা এত তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে কেন? ভালই তো লাগছিল তোমাকে ওটায়।'

'এত দামি একটা জিনিস ঘরের ভিতরে পরে থাকব তাই বলে?'

'অসুবিধে কী? নষ্ট হলে আরেকটা কিনে দিতাম।'

'এমনিতেই কম খরচ করোনি আমার পিছনে,' রানার পাশে বসল সোনিয়া। 'ধন্যবাদ। ক্রিসমাসেও এত দামি উপহার পাইনি

আমি কোনদিন।'

'ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই,' বলল রানা। 'ইকুইপমেণ্ট হিসেবে ধরো ওগুলোকে। কাজ করতে গেলে যন্ত্রপাতি লাগে না? এই পোশাকগুলোই তোমার কাজের যন্ত্রপাতি।'

'মন থেকে বলছ না কথাটা।'

'মানে!'

'বাদ দাও,' হাত নাড়ল সোনিয়া। 'এমনি বললাম।'

সোফা থেকে উঠে বারের কাছে গেল রানা। একটা গ্লাসে উইস্কি ঢালল। সোনিয়াকে বলল, 'তুমি নেবে? রিল্যাক্সেশনের জন্য উইস্কি ভাল কাজ দেয়।'

'না, ধন্যবাদ। এমনিতেই যথেষ্ট রিল্যাক্সড অবস্থায় আছি। কোনও ধরনের চাপ অনুভব করছি না। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট প্ল্যান কী? পুরো বিকেল আর সন্ধ্যা পড়ে আছে সামনে। কী করবে বলে ভাবছ?'

'কিছুই না। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। যাও, শুয়ে পড়ো।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমার সঙ্গ ভাল লাগছে না?'

'আমি কি সেটা বলেছি?'

'বলোনি, কিন্তু একা থাকতে চাইছ তুমি। আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছ।'

ক্ষণিকের জন্য মুখের ভাষা হারাল রানা। সচেতনভাবে নয়, কিন্তু অবচেতনভাবে এ-চিন্তাই খেলা করছিল ওর ভিতর। সোনিয়ার প্রতি যে-আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করছে ও। অসহায়, বিপন্ন একটা মেয়ে; তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠ হওয়া মানে অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়া। সেটাই এড়াতে চাইছিল ও। সোনিয়া তা বুঝে ফেলেছে।

'না... মানে...'

'কীসের ভয় তোমার, রানা?' আহত গলায় বলল সোনিয়া। রানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করছে ও-ও। তাতে ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে। 'কেন দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছ আমাকে? আমার অতীত জেনেছ বলে? বেশ্যার জীবন কাটিয়েছি আমি, নোংরা কাজ করেছি... তাই বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে? এমন মেয়েকে কাছে টানার প্রবৃত্তি হচ্ছে না?'

'ভুল বুঝছ তুমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এমন কিছু ভাবছি না আমি...'

'থাক, মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে হবে না!' আচমকা রেগে গেল সোনিয়া। 'তুমি মহাপুরুষ, আমার মত নরকের কীটকে কেন কাছে ঘেঁষতে দেবে?'

বেডরুমে ছুটে গেল ও। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'সোনিয়া, শোনো!' পিছন থেকে ডাকল রানা, তাতে কোনও লাভ হলো না।

বিকেল পর্যন্ত কামরা থেকে বেরুল না মেয়েটা, রানাও ওকে আর ডাকাডাকি করল না। সময় দিল রাগ কমে আসার জন্য, তারপর নাহয় ভুল ভাঙানো যাবে। সন্ধ্যার ঠিক আগে স্যুইটের দরজায় টোকা পড়ল। শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের বাটে হাত রেখে জবাব দিতে গেল রানা। পাল্লা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'ভিয়া ফ্রাস্কাতি থেকে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি, সেনিয়র।' বলা হলো ওপাশ থেকে। 'সেনিয়র লুচিনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

দরজা খুলে দিয়ে বক্তার মুখোমুখি হলো রানা। পরিচিত মুখ, লাঞ্চের সময় রেস্তোরাঁয় এই লোক ওদেরকে খাবার পরিবেশন করেছিল—একজন ওয়েইটার। লুচিনি কোনও ঝুঁকি নেয়নি, নিজস্ব লোককে পাঠিয়েছে মেসেজ দিয়ে।

লোকটার বাড়ানো হাত থেকে একটা খাম নিল রানা, ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'গ্রাৎসি।' পকেট থেকে পাঁচ লিরার একটা নোট বের করে বখশিশ দিল।

'প্রেগো, সেনিয়র,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল ওয়েইটার। তারপর চলে গেল উল্টো ঘুরে।

দরজা বন্ধ করে স্যুইটের বসার ঘরে ফিরে এল রানা, খামটা খুলল। ভিতর থেকে বেরুল দুটো সোনালি বর্ডারঅলা নিমন্ত্রণপত্র; আর একটা চিঠি। তাতে লেখা:

কাউন্ট আন্তোনেলি খবর পেয়েছেন, ইটালিতে রঘুনাথ সাপ্রে নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোক এসেছেন, যাঁর সঙ্গে ওপেক-ভুক্ত দেশগুলোর ভাল কানেকশন আছে। কাউন্টকে বোঝানো হয়েছে, এই ভারতীয় মানুষটি ওসব দেশের শেখদের হয়ে কেনাবেচার কাজ করেন। এ-সব কাজ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় না, কাজেই কাভার মেইনটেনের জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া থাকলেই উৎরে যেতে পারবেন। তা ছাড়া কাউন্টকে এ-ও বলা হয়েছে; মি. সাপ্রে স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছেন এ-দেশে... আমোদ-ফুর্তি করবার জন্য। তাই বলতে গেলে সেধেই তিনি চ্যারিটি অনুষ্ঠানের দুটো নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। আশা করি কাজে লাগাবেন ওগুলো। সিনোরিনার জন্য শুভেচ্ছা।

—লুচিনি।

মুচকি হাসল রানা। ভালই কাভার বেছেছে রেস্তোরাঁমালিক। আরব শেখদের দালাল কখনোই নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে না

কোথাও। ও-প্রসঙ্গে তাই কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না বিয়াঞ্চি। অন্য বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা যাবে।

বেডরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। কয়েক মুহূর্ত কিছু ঘটল না, সম্ভবত ইতস্তত করছে সোনিয়া। একটু পর বেরিয়ে এল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সাদামাঠা একটা গাউন পরেছে মেয়েটা; অন্তর্বাস নেই, পোশাকের তলায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শরীরের আঁকবাঁক।

বুকের ভিতর কাঁপন অনুভব করল রানা। সামলে নিয়ে মুখে হাসি ফোটাল। জিজ্ঞেস করল, 'রাগ পড়েছে?'

জবাব দিল না সোনিয়া। কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর প্রশ্ন করল, 'কেন তুমি চাও না আমাকে?'

'কারণ ফ্রেইটারের হোল্ডে তোমার সঙ্গে আটকা পড়া পশু নই আমি,' বলল রানা।

'তা আমি জানি,' বলল সোনিয়া। 'তারপরেও তোমার চোখে কামনার আগুন দেখেছি আমি, দেখেছি সে-চোখ ঘুরিয়ে নিতে। কেন বঞ্চিত করছ নিজেকে?'

'বঞ্চিত করছি না। চাইলেই শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারি আমি। সে-ব্যবস্থা করাই যায়।'

'চুপ করো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'বেশ্যা দরকার তোমার? আমাকে নাহয় তা-ই ভাবো!'

'সেটা সম্ভব নয়, সোনিয়া।'

'তা হলে ওভাবে তাকিয়ো না আমার দিকে। কখনও কাছে, কখনও দূরে... এমন খেলা খেলো না আমার সঙ্গে। কেন এমন করো? কী চাও তুমি?'

কাঁপছে মেয়েটা। হাত ধরে ওকে সোফায় এনে বসাল রানা।

নরম গলায় বলল, 'প্লিজ... আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি আমি। জানি, তুমিও তা-ই করছ। কিন্তু সেটাই সব নয়। খুবই কঠিন একটা জীবন আমার... আমার সঙ্গে নিজেকে যতটা জড়াবে, ততটাই বিপদ বাড়বে তোমার। ভালবাসার প্রতিদানে পাবে শুধু কষ্ট আর বিচ্ছেদের যাতনা। কাউকে বাঁধনে জড়াবার জন্য জন্ম হয়নি আমার। জেনেশুনে কীভাবে তোমাকে সে-আগুনে ঝাঁপ দিতে দেব আমি, বলো?'

রানার কণ্ঠের গভীরতা স্পর্শ করল সোনিয়াকে। অন্য এক চোখে ওর দিকে তাকাল সে। রানার মনের ব্যথা অনুভব করতে পেরে অশ্রু জমল চোখে। আস্তে আস্তে কাছ ঘেঁষে এল। বলল, 'দয়া করো আমাকে, রানা। বেশিকিছু চাই না আমি কারও কাছে, একটু শুধু ভালবাসা। হোক তা ক্ষণিকের জন্য। আমার জন্য সেটাই অনেক। কোনোদিন কেউ ভালবাসেনি আমাকে।'

বাধা দিতে পারল না রানা, ওকে জড়িয়ে ধরল সোনিয়া... এবং চুমো খেলো। দীর্ঘ চুম্বন, উষ্ণ এবং চোখের পানিতে ভেজা—এর মধ্যে কাম-লোলুপতার ছিটেফোঁটাও নেই, আছে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি, পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার—ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত এই জগৎসংসারে এটাই যেন একমাত্র সত্য ও সঠিক কাজ। ভাবাবেগেও নয়, নয় শারীরিক চাহিদার কাছে পরাজিত হয়ে, মেয়েটার আকস্মিক পরিবর্তনের প্রতি স্রেফ সমর্থন জানিয়ে পাল্টা চুমো খেলো রানা।

ফিসফিসিয়ে বলল সোনিয়া, 'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে চাই, রানা! এখুনি! কোনও দাবি নেই আমার, কোনও প্রত্যাশা নেই। তাহলে কেন পরস্পরকে আমরা বঞ্চিত করব? নির্লজ্জের মত হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি বলব, আমাকে গ্রহণ করো, রানা, প্লিজ!'

সবকিছু ভুলে গেল রানা। সোনিয়ার নিখাদ আবেগের কাছে হার মানল ও। ওকে টেনে নিল নিজের বুকে।

দুই

সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় *ভিলা দেস্তে*-র জাঁকজমক একবিন্দু কমেনি। আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে পুরো এস্টেট। জ্বেলে দেয়া হয়েছে ফ্লাডলাইট—খাড়া ঢাল বেয়ে নামা ঝর্ণার পানি ঝিকমিকিয়ে উঠছে বহুমূল্য হীরকখণ্ডের মত। বড় বড় পুলগুলোর মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে ফোয়ারা, ছাতার আকৃতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বানানো হয়েছে কৃত্রিম জলপ্রপাত, সেই পানি আছড়ে পড়ছে প্রাচীন একগুচ্ছ বাগান-ভাস্কর্যের সামনে। পানির ছিটেয় চকচক করছে পাথুরে মূর্তির ভেজা শরীর। আজকের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে এস্টেটের বাগান, নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাধারণ জনতা এবং টুরিস্টদের ঘোরাফেরা; প্রবেশাধিকার পেয়েছেন কেবল সমাজের মানী-গুণী ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হিসেবে কাগজে-কলমে এই ঐতিহাসিক এস্টেট ও বাগানের সংস্কার কাজের জন্য ফাণ্ড জোগাড়ের বাহানা দেয়া হয়েছে; কিন্তু ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায়—আসলে বাছাই করা একদল মানুষের মনোরঞ্জনই আজ সন্ধ্যার মূল লক্ষ্য। ভুল বলেনি লুচিনি, পুরো রোম আজ হাজির হয়েছে ভিলা দেস্তে-তে। সাধারণ মানুষের রোম নয়... টাক্সিডোর ভেলভেট ল্যাপেল স্পর্শ করে ভাবল রানা...

ধনীদের রোম।

এস্টেটের মূল ফটকে গাড়ি থামাল ও। দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড এগিয়ে এল, দেখতে চাইল আমন্ত্রণপত্র। খোলা জানালা দিয়ে এনভেলাপে ভরা দুটো কার্ড বের করে দিল রানা। অতিথিদের তালিকা পরীক্ষা করছে গার্ডরা, রানা আর সোনিয়া সত্যি আমন্ত্রিত অতিথি কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। তালিকায় নাম আছে দেখে হলদেটে চেহারায় হাসি ফুটল, কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল, তারপর রিমোট ট্রান্সমিটারে চাপ দিয়ে খুলে দিল গেট। গাড়ি নিয়ে লম্বা পথটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল রানা, থামল ভিলার পোর্টিকোর নীচে।

সোনিয়াকে দেখে মনে হলো কিশোরী একটা মেয়ে তাজমহল দেখতে এসেছে। 'এত বড় পার্টিতে আগে কখনও আসিনি আমি। তোমাকে না বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিই।'

'ফেলবে না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'নিজেকে বোঝাও, এটা স্রেফ একটা সামাজিক নাটক। রোমের এলিট-রা এ-ধরনের পার্টিতে আসেন, কারণ, হয় তাঁরা কিছু বিক্রি করতে চান, নয়তো কিছু কিনতে। হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা হবে, মদ্যপান চলবে, চালচলনে নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে জাহির করবার চেষ্টা থাকবে, তারই ফাঁকে চলবে তথ্য বিনিময়।'

'বোঝা যাচ্ছে, তুমি বহুবার এ-রকম পার্টিতে এসেছ।'

মুচকি হাসল রানা, গাড়ি থেকে নেমে ভ্যালে-র হাতে চাবি ধরিয়ে দিল। তারপর সোনিয়াকে নিয়ে পা বাড়াল ভিলার ভিতরে।

কোর্টইয়ার্ডের আদলে সাজানো হয়েছে ভিলার বৃহদায়তন হলঘর। পুরো কামরা জুড়ে বসানো হয়েছে ব্যাঙ্কোয়েট টেবিল, রয়েছে সোনার গিল্টি করা চেয়ারের সারি, দেয়াল ঢাকা পড়েছে নানা রঙের রেশমি পর্দায়। দামি পোশাক-আশাকে সজ্জিত

মানুষেরা ভিড় জমিয়েছে সেখানে। মহিলাদের নাক-কান-গলায় শোভা পাচ্ছে সোনা-রূপা আর হীরার সমাহার, পুরুষদের পরনে দামি টাক্সিডো আর কোমরবন্ধনী। টাক পড়তে থাকা মাথা, ধূসর চুল আর হাতে দামি সিগার নিয়ে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির নীরব প্রদর্শনী করছে তারা। এককোণে রয়েছে অর্কেস্ট্রা—জনাবিশেক মিউজিশিয়ান ধীর লয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানানসই সঙ্গীত।

এতসব মানুষের মাঝে আলাদা জৌলুস নিয়ে হাজির হয়েছে সোনিয়া। গলায় বা হাতে কোনও অলঙ্কার নেই ওর, তার কোনও প্রয়োজনও পড়েনি। ব্রোঞ্জের মত রঙ আর মাখনের মত কোমল ত্বক-ই ওর অলঙ্কার। পরেছে সোনালি বর্ডারের একটা সাদা গাউন, তাতে পদ্মফুলের মত লাগছে ওকে। মুখের কালসিটে আর ফোলাভাব কমে গেছে ইতিমধ্যে, সানগ্লাসও পরতে হয়নি। পুরো কামরায় ওকে সবচেয়ে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি হয় না মোটেই। যে-ই তাকাচ্ছে, তারই চোখ আটকে যাচ্ছে ওর উপর।

রহস্যময় মি. রঘুনাথ সাপ্রের বান্ধবী হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে সোনিয়ার, এসেছে *লেক কোমো* থেকে। কাভারটা চমৎকার, ওই এলাকা ভূমধ্যসাগরীয় ধনীদের প্রমোদরাজ্য হিসেবে বিখ্যাত। লুচিনির কাজে কোনও খুঁত নেই। অতিথিদের আগ্রহ জাগাবার মত যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছে, সেটা আবার এমন নয় যে কারও মনে খুঁতখুঁতানির সৃষ্টি হবে। প্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই বেশ কিছু মানুষ এগিয়ে এল রানার দিকে, খাতির জমাবার চেষ্টা করল। তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু *মূল্যবান* উপদেশ খয়রাত করে সন্তুষ্ট রাখল ও, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে এল সোনিয়াকে নিয়ে।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে নজর বোলাল রানা,

চারদিকে। অল্পক্ষণেই খুঁজে বের করে নিল কাউন্ট মার্সেলো বিয়াঞ্চিকে। এই প্রথম দেখছে, তারপরেও চিনতে কষ্ট হলো না। হলঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকেশী দুই যুবতীর সঙ্গে খোশগল্প করছে কাউন্ট, কথার ফাঁকে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাচ্ছে অন্যান্য অতিথিদের উপর। লম্বা, একহারা দেহ; তীক্ষ্ণ চেহারা; কপালের দু'পাশের চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। কোটের ল্যাপেলে শোভা পাচ্ছে বহুরঙা রিবন, কোমরে বেঁধেছে একটা সোনালি স্যাশ। রিবনের গুরুত্ব যদি কেউ না-ও বোঝে, সোনালি কাপড়টা দেখে বুঝে নেবে তা। পুরো অনুষ্ঠানে একমাত্র কাউন্ট বিয়াঞ্চি-ই পরেছে ওই জিনিস—প্রকাশ করছে আপন আভিজাত্য এবং অনুষ্ঠানের হোস্ট হিসেবে নিজের পদবী। পঞ্চাশোর্ধ মানুষটা রোমের সর্বোচ্চ সমাজের মূর্ত প্রতীক।

'কোথায় পাবে কাউন্টকে?' ফিসফিসিয়ে পাশ থেকে জানতে চাইল সোনিয়া।

'অলরেডি পেয়ে গেছি,' বলল রানা। 'ওই তো।'

'ওই ভদ্রলোক?' ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে হলঘরের কোনায় তাকাল সোনিয়া। একটু পর মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। পেপারে দেখেছি আমি ওঁর ছবি। কী করবে? এগিয়ে গিয়ে পরিচিত হতে চাও?'

'মনে হয় না তার কোনও প্রয়োজন আছে। যদি ভুল করে না থাকি, কাউন্টই আমাকে খুঁজছে।' হাতের ইশারা করল রানা। 'চলো, ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলের ওপাশটায় চলে যাই। আমাদেরকে দেখতে পাবে তা হলে।'

'নাহয় দেখল... চিনবে কীভাবে?'

'পুরো হলঘরে আমিই একমাত্র ভারতীয় চেহারার লোক। তারপরেও যদি খেয়াল না করে, অন্তত তোমাকে খেয়াল করতে

বাধা।

'বলেছে তোমাকে!' মুচকি হাসল সোনিয়া।

হাসি মুখে ওকে নিয়ে টেবিলের দিকে এগোল রানা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরেই পিছনে গমগম করে উঠল ভরাট গলা।

'সেনিয়র সাপ্রে, আই বিলিভ?'

ধীরে ধীরে পিছন ফিরল রানা। চেহারায় গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল, 'মাফ করবেন, আমরা কি পূর্ব-পরিচিত?'

হেসে উঠল কাউন্ট। বলল, 'জী না, তবে পরিচয়টা গাঢ় হতে সময় লাগবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। 'আমি বিয়াঞ্চি... মার্সেলো বিয়াঞ্চি।' উপাধিটা উহ্য রাখল বুঝি গুরুত্ব বাড়াবার জন্যই। 'আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম, সেনিয়র সাপ্রে।'

'ও! আপনিই সেই বিখ্যাত কাউন্ট বিয়াঞ্চি?' বিস্মিত হবার ভান করে হাত মেলাল রানা। 'লুচিনিকে বলেছিলাম, এখানে এলে আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যাব। আপনিই তো দেখি খুঁজে নিলেন আমাকে! চিনেছেন কীভাবে?'

কাউন্টের মুখের হাসি বিস্তৃত হলো, ঝিকমিকিয়ে উঠল মুক্তোর মত সাদা দাঁতের পাটি। 'লুচিনি কাজের লোক, তবে খানিকটা দুষ্টুও বটে। এই সিনোরিনাকে নিয়ে যেভাবে উচ্ছ্বাস দেখাল...' সোনিয়ার দিকে ইশারা করল সে, '...তাতে বুঝতে পারলাম, পার্টির সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাটিকে খুঁজে বের করলে আপনাকেও পাওয়া যাবে।'

'ওফফো, আপনাদের তো পরিচয় করিয়ে দিইনি,' সোনিয়ার বাহুতে হাত রাখল রানা। 'কাউন্ট বিয়াঞ্চি, এ হলো আমার বান্ধবী... সোনিয়া। লেক কোমো থেকে এসেছে।'

'আ প্লেজার!' ঝুঁকে সোনিয়ার হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেল কাউন্ট। 'এমন রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না।'

'প্লিজ, সেনিয়র!' কপট হাসি দিয়ে বলল সোনিয়া। 'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন!'

মনে মনে ওর প্রশংসা করল রানা। সুন্দর অভিনয়!

রানার দিকে ফিরল বিয়াঞ্চি। 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, সেনিয়র সাপ্রে। শুনলাম আমার বন্ধুরা নাকি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক নানা রকম প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করেছে?'

'না, না, ক্ষমা চাইবার কিছু নেই,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'লুচিনির আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তবে... আমার পেশা জানার পর লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে-ই! এতে আমি অভ্যস্ত।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ।'

'ওটা আসলে কঠিন কিছু না। তবে লোকে যতটা ভাবে, অতটা জ্ঞান আমার থাকলে মন্দ হতো না। এমনিতে আমি শুধু নিয়োগকর্তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি; তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করি না।'

'কিন্তু ওসব সিদ্ধান্তের মাঝেও তো জানার মত অনেক কিছু থাকে, তাই না?'

'তা তো বটেই। নইলে কী আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জলাঞ্জলি দিচ্ছেন শেখ-রা।'

'জলাঞ্জলি? সুন্দর উপমা দিয়েছেন।' একটু যেন গম্ভীর হলো বিয়াঞ্চি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি আমি, সেনিয়র সাপ্রে।'

আচমকা এ-প্রশ্নে ঘাবড়াল না রানা। এমন পরিস্থিতির জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ও। হালকা গলায় তাই বলল,

'দেখা হলে অবশ্যই মনে থাকত আমার। তবে... কোনও এম্বাসির পার্টিতেও দেখে থাকতে পারেন। হয়তো কথা হয়নি...'

'এম্বাসি সার্কেলে নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে আপনার?'

'উঁহুঁ। শুধু পার্টিতে যাই... তাও আবার শেষ মুহূর্তের গেস্ট হিসেবে। কী আর বলব, মাঝে মাঝে লোকের মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে; সেগুলোর জবাব খোঁজার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে যায় তারা। এই আর কী! কিছু তো আর বলতে পারি না, মাঝখান থেকে বিনে পয়সায় খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়।'

'আজকালকার যুগে যুদ্ধজয়ের জন্য... সে যে যুদ্ধই হোক না কেন... তথ্যই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আপনি সে-অস্ত্র লুকিয়ে রাখছেন, সেনিয়র।'

'কী যে বলেন! আমি যুদ্ধ-টুদ্ধ বুঝি না। স্রেফ জীবিকা নির্বাহ করছি।'

'কোনকিছু জানার জন্য চাপাচাপি করব না আপনাকে,' ঠোঁটের কোনা বাঁকা করল বিয়াঞ্চি। 'আমার বিশ্বাস, আপনি অত্যন্ত পাকা বিক্রেতা। লাভক্ষতির হিসেব ছাড়া জিনিস বের-ই করবেন না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' গলার সুর বদলে বলল রানা, যাতে ইটালিয়ান কাউন্ট পরিবর্তনটা ধরতে পারে। 'আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল আমার।'

'তা-ই?' আগ্রহ ফুটল বিয়াঞ্চির কণ্ঠে। 'ইয়ে... সিনোরিনা আবার ব্যবসায়িক আলাপ শুনে বিরক্ত হবেন না তো?'

'আলোচনার সময় ও না থাকলেও চলে। বিকল্প ব্যবস্থা যদি করা যায়...'

'আর কিছু বলতে হবে না।' হাত তুলে কালো চুলের এক যুবককে ডাকল বিয়াঞ্চি। কাছে এলে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হলো আমার ব্যক্তিগত সহকারী—পিয়েত্রো। সিনোরিনার দিকে

নজর রাখবে ও।' সহকারীর দিকে ফিরল, 'খেয়াল রেখো, ওঁর যেন অসুবিধে না হয় কোনও।' তারপর তাকাল সোনিয়ার দিকে। 'চাইলে নাচতে পারেন, সিনোরিনা। পিয়েত্রো খুব ভাল ড্যান্সার।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল যুবক, এক হাত বাড়িয়ে দিল সোনিয়ার দিকে। মৃদু হেসে সেটা গ্রহণ করল ও। এক পা এগিয়ে ঘাড় ফেরাল রানা আর কাউন্ট বিয়াঞ্চির দিকে।

'চাও!' ইটালিয়ানে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল সোনিয়া, তারপর পিয়েত্রোর সঙ্গে চলে গেল একদিকে।

'আপনাকে ঈর্ষা করতে হয়, সেনিয়র সাপ্রে,' মন্তব্য করল বিয়াঞ্চি, সোনিয়ার অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'অপূর্ব এক মেয়ে... লেক কোমো-য় পেয়েছেন ওকে?'

লোকটার কণ্ঠে ফুটে ওঠা কামনার সুর কান এড়াল না রানার। সোনিয়ার ব্যাপারে লোভী হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই খোঁজখবর নেয়ার মতলব... সময়-সুযোগ বুঝে ওকে শয্যাসঙ্গিনী বানাতে চায়। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই রানার, কিন্তু এ-মুহূর্তে যদি খোঁজখবর নিতে শুরু করে, কাভার ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই হালকা গলায় ও বলল, 'সত্যি বলতে কী, আসলে কোত্থেকে এসেছে মেয়েটা, আমি জানি না। বিয়াদের এক বন্ধু নাম্বার দিয়েছিল ওর, ফোনেই ওকে ভাড়া করেছি। ফ্রান্সের নিস-এ আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও। চেহারা-সুরত দেখে এত পছন্দ হয়ে গেল যে, ব্যাকগ্রাউণ্ডের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। বলেছে লেক কোমো থেকে এসেছে, তা-ই মেনে নিয়েছি। এমন হুর-পরী জাহান্নাম থেকে এলেই বা কী এসে-যায়? দু'চারদিনের বেশি তো আর থাকছে না আমার সঙ্গে।'

'তা হলে ওর ক্যালেণ্ডারের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে একটু জানাতে পারেন আমাকে? মানে... যদি আপনার আপত্তি না থাকে আর কী।'

'না, না, আপত্তি কীসের? কবে নাগাদ ওকে চান আপনি?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। ওকে বলবেন, তুরিনের পাভোরোনি অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে আমার সঙ্গে।'

'তুরিন?'

'হুঁ। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশ ক'টা প্ল্যান্ট আছে আমাদের। তুরিন... সেইসঙ্গে ইয়োরোপের একটা বড় অংশ চালাই আমরা—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনিরা।'

'আমার সেটা জানা ছিল না।'

'তা-ই? আমি তো ভেবেছিলাম সেই কারণেই আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে শেষবারের মত চুমুক দিল রানা। ওটা নামিয়ে রেখে নিচু গলায় বলল, 'কিছুক্ষণের জন্য আমরা বাইরে যেতে পারি? আমার এক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কনফিডেন্শিয়াল মেসেজ আছে আপনার জন্য। আসলে... সেজন্যেই আজ আমার এখানে আসা।'

'কোথাকার ক্লায়েন্ট?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বিয়াঞ্চি।

'অ্যারাবিয়ান গালফ... আপাতত এর বেশি বলতে পারছি না আপনাকে।'

'অ্যারাবিয়ান গালফ থেকে মেসেজ?' ভ্রূকুটি স্বাভাবিক হচ্ছে না বিয়াঞ্চির। রোম আর তুরিনের অন্যান্য এলিটদের মত ওখানকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় আছে তার, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নেই কারও সঙ্গে। তা হলে মেসেজ পাঠিয়েছে কে? কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে, বাগানে নাহয় একটু হাঁটব আমরা। আসুন...'

হাত তুলে তাকে থামাল রানা। 'একসঙ্গে আমাদেরকে বেরুতে

দেখা না গেলেই ভাল হয়। কোথায় যেতে হবে বলে দিন। আমি বিশ মিনিট পর পৌঁছুচ্ছি ওখানে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মাথা দোলাল কাউন্ট। 'ইপোলিটোর ফোয়ারা চেনেন?'

'খুঁজে নিতে পারব।'

'বাগানের একটু ভিতরদিকে ওটা। নির্জন।'

'বেশ। বিশ মিনিট।'

কাউন্ট বিয়াঞ্চিকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে অতিথিদের ভিড়ে মিশে গেল রানা।

ফোয়ারার চারপাশ অন্ধকার, কোথাও আলো জ্বলছে না। পানির কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। পাথরসারি আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে সন্তর্পণে ওখানে পৌঁছুল রানা। কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না ও, আশপাশে কাউন্টের মোতায়েন করা প্রহরী থাকতে পারে। তেমন কিছুর আভাস পেলে অন্য জায়গা খুঁজে বের করবে কথা বলবার জন্য

ভালমত তল্লাশি চালিয়েও কারও দেখা পাওয়া গেল না। একটু পর শোনা গেল পদশব্দ। নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ ধরে ফোয়ারার দিকে আসছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি। দৃষ্টিসীমায় উদয় হলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। গলা খাঁকারি দিল। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল কাউন্ট। ফোয়ারার নিচু সীমানা-প্রাচীরের পাশে মুখোমুখি হলো দু'জনে। আবছা আলোয় লোকটার স্রেফ অবয়ব দেখতে পাচ্ছে রানা, ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। ছায়া অপছন্দ ওর।

'এতদূর আসার কোনও প্রয়োজন ছিল কি?' রুক্ষগলায় বলল রানা। 'একান্তে কথা বলতে চেয়েছি, তাই বলে রোমের দিকে

অর্ধেক রাস্তা হাঁটতে চাইনি।'

'অমন কোনও ইচ্ছে আমারও ছিল না, সেনিয়র সাপ্রে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল বিয়াঞ্চি। 'কিন্তু একসঙ্গে বেরুতে চাইলেন না দেখে এ-জায়গার কথা ভাবতে হলো। আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা গেলে সেটা হয়তো নিজের জন্যেই ভাল হবে না। আফটার অল, আপনি আরব শেখদের ব্রোকার।'

'তাতে সমস্যা কোথায়?'

'তা হলে আপনিই বলুন, আলাদাভাবে বেরুতে চাইলেন কেন?'

সন্দেহপ্রবণ লোক, মনে মনে ভাবল রানা। 'স্রেফ সতর্কতা, আর কিছু না। আমাদেরকে একসঙ্গে বেরুতে দেখার কথা কেউ মনে রাখুক, তা চাইছিলাম না। বাগানে কেউ বেড়াতে এসেও আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে, তবে সেটা কো-ইনসিডেন্স বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

'সে-ভয় নেই,' জানাল কাউন্ট। 'ইপোলিটোর ফোয়ারায় পৌঁছুনোর রাস্তা কেবল একটা। এন্ট্রান্সের সামনে আমার এক লোক পাহারা দিচ্ছে। কাউকে ঢুকতে দেবে না। সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্যও করবে না কেউ। আমি যে মাঝে-মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে একাকী এখানে ঘুরতে পছন্দ করি, তা সবার জানা।'

'ধরে নিচ্ছি, পাহারাদার বসিয়েছেন শুধু আমারই কারণে।'

গম্ভীর হয়ে গেল বিয়াঞ্চি। 'মনে রাখবেন, সেনিয়র সাপ্রে, বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি পুরো ইয়োরোপ-আমেরিকা জুড়ে ব্যবসা করছে। নিত্যনতুন মার্কেট খুঁজছি আমরা, তাই বলে আরব্য পুঁজি চাইছি না। কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ-ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ঠেকানোর জন্য দুনিয়াজুড়ে নানা রকম বিধি-নিষেধের দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। চেষ্টা করতে গেলে বিপদে

পড়ব—তদন্ত-টদন্ত কিছুই হবে না, শুধু প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের ইহুদি ব্যবসায়ীরাই আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।'

'যদি বলি বিয়াঞ্চি-পাভারোনির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই?' কণ্ঠে রহস্য ফোটাল রানা। 'সম্পর্ক আছে শুধু বিয়াঞ্চি অংশটুকুর?'

'স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন আপনি, সেনিয়র সাপ্রে। পরিষ্কার করে বলুন ঠিক কী বলতে চান।'

'আপনি তো কাউন্ট আলবার্তো বিয়াঞ্চির ছেলে, তাই না?'

'এ তো সবাই জানে! পাভোরোনি ইণ্ডাস্ট্রিজের বিস্তারের পিছনে আমার অবদানের কথাও অজানা নয় কারও। বিয়াঞ্চি এবং পাভোরোনি নামদুটো এখন অবিচ্ছেদ্য, আশা করি সেটা বলে দিতে হবে না আপনাকে?'

'না, তবে তার কোনও গুরুত্ব নেই। আমি স্রেফ একজন মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করছি—দুটো পক্ষের হয়ে খবর আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই আমার। বাইরের দুনিয়া যদি কোনও প্রশ্ন তোলে, বলব তিভোলির এক পার্টিতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, আর কিছু না। এই মিটিং-টা ঘটেইনি!'

'খুব নাটকীয়তা করছেন। মেসেজটা নিশ্চয়ই ইম্পরট্যান্ট। কে পাঠিয়েছে?'

তাকে থামানোর ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'প্লিজ... যদ্দূর বুঝি, তাতে এ-ধরনের কেসে প্রথম সাক্ষাতে ক্লায়েন্টের পরিচয় ফাঁস না করাই নিয়ম। আমি শুধু আপনাকে জিয়োগ্রাফিকাল লোকেশন এবং একটা রাজনৈতিক সমীকরণের কথা বলতে পারি, যাতে হাইপথেটিক্যালি দুটো পক্ষ রয়েছে।'

সরু হয়ে এল বিয়াঞ্চির দু'চোখ, তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে

পেরেছে রানা। 'বলে যান।'

'আপনি একজন মানীগুণী মানুষ, কাজেই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। ধরা যাক, আরব্য উপসাগরীয় এলাকায় জনৈক প্রিন্স আছেন। তাঁর চাচা... মানে দেশের বাদশাহ, পুরনো জামানার লোক। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও ইস্পাতকঠিন হাতে দেশ চালাচ্ছেন; তাঁর কথাই আইন। বহুকাল আগে বেদুঈন গোত্রের দলপতি ছিলেন, আজও সে-সময়ের মতই একগুঁয়ে তিনি। কারও মতামতের তোয়াক্কা করেন না, বাজে ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছেন... আজও করছেন। এর ফলে পুরো দেশের কোষাগার-ই শূন্য হবার দশা। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে... সেইসঙ্গে নিজের স্বার্থে তো বটেই... আমাদের হাইপথেটিক্যাল প্রিন্স তাঁর চাচাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। তাই আলবার্তো বিয়াঞ্চির ছেলের মাধ্যমে কাউন্সিলের কাছে সাহায্য চাইছেন তিনি... ফেনিস কাউন্সিলের কাছে! মেসেজ বলতে এতটুকুই। তবে এর সঙ্গে আরও ক'টা কথা আমি যোগ করব...'

চমকে গেছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ। 'কে তুমি?' কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'আমার কথা শেষ করতে দিন,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। প্রথম ধাক্কাটা সফলভাবে দেয়া গেছে, এবার দ্বিতীয়টার পালা। 'নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে আপনাকে আমি বলতে পারি, আমাদের এই হাইপথেটিক্যাল সিচুয়েশনটা বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। নষ্ট করবার মত একটা দিনও হাতে নেই। প্রিন্স তাঁর প্রস্তাবের জবাব চান... এবং খুব শীঘ্রি। আমার মাধ্যমেই পাঠাতে হবে ওটা। আপনি এখুনি আমাকে কাউন্সিলের পারিশ্রমিক বলে দিতে পারেন; যত বেশিই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এটুকু

বলে রাখি, আমরা একশো মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।'

'একশো মিলিয়ন!' চমকে উঠল বিয়াঞ্চি।

দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় ধাক্কা। কাউন্ট বিয়াঞ্চির মত ধনী মানুষের জন্যেও একশো মিলিয়ন ডলার হেলাফেলার বস্তু নয়। অন্ধকার ইতিমধ্যে চোখে সয়ে এসেছে, আবছা আলোয় ফলাফল দেখতে পেল রানা। মুখ হাঁ হয়ে গেছে কাউন্টের, লোভীর মত ঠোঁট চাটল। আরেকটু খোঁচানো যেতে পারে।

'বলা বাহুল্য, অফারটার সঙ্গে কিছু শর্ত আছে,' বলল ও। 'যে-অ্যামাউন্ট বলেছি, সেটা আমাদের সর্বোচ্চ অফার; তবে সেজন্যে এক্ষুণি জবাব দিতে হবে, যাতে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করবার দরকার না হয়। কাজটা সারতে হবে সাতদিনের মধ্যে। তবে সেটা সহজ হবে না। বুড়ো বাদশাহ্‌কে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে *সাবাথি* নামে একদল পাহারাদার...' একটু থামল রানা। হাসল। 'অবশ্য... মনে হয় না শেখ নাঈম ইবনে আল-হাসান সম্পর্কে বেশিকিছু ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে। আমার জানামতে, কর্সিকান ব্রাদারহুডের পুরনো মক্কেল তিনি। এনিওয়ে, প্রিন্স চাইছেন ব্যাপারটা যেন আত্মহত্যার মত দেখায়...'

'থামো!' হিসিয়ে উঠল বিয়াঞ্চি। 'কে তুমি, সাপ্রে? কী চাও এখানে? আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ?' গলার স্বর চড়ে গেল তার। 'কবর হয়ে যাওয়া অতীত নিয়ে কথা বলছ তুমি, কোন্ সাহসে!'

'আমি শুধু একশো মিলিয়ন ডলারের কথা বলছি,' শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা। 'আর দয়া করে আমাকে, কিংবা আমার ক্লায়েন্টকে কবর বা অতীতের কথা বলবেন না। কবর তো হয়েছে প্রিন্সের বাবার—কাউন্সিলের পাঠানো খুনির ছুরিতে গলা দু'ফাঁক

হয়ে! আর সেটার পিছনে ছিলেন স্বয়ং নাঈম ইবনে আল-হাসান। সিংহাসন পাবার জন্য ঘটিয়েছিলেন তিনি কাণ্ডটা। যদি আপনাদের কোনও রেকর্ড থাকে, তা ঘেঁটে দেখুন। আমার কথার সত্যতা জানতে পারবেন। এতদিন পর প্রিন্স সে-অন্যায়ের প্রতিশোধ চাইছেন। বাদশাহকে তাঁর নিজের ওষুধই খাওয়াতে চাইছেন। আর সেজন্যে অরিজিন্যাল কন্ট্র্যাক্টের পাঁচগুণ খরচ করবেন তিনি।' কণ্ঠে হতাশা ফোটাল ও। 'পুরোটাই পাগলামি! প্রিন্সকে বলেছিলাম, এর অর্ধেক টাকায় বৈধ একটা আন্দোলন করানো যাবে... ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে তাঁর চাচাকে। জাতিসংঘ থেকেও সাপোর্ট এনে দিতে পারব আমি। কিন্তু না... এভাবেই কাজটা করতে চান তিনি। আমাকে বলেছেন, *ফেনিসের পন্থাই একমাত্র পন্থা। ওরা বুঝবে আমার আদর্শ।* আরও বলেছেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান।'

নার্ভাস হয়ে গেছে কাউন্ট বিয়াঙ্কি, পিছিয়ে গিয়ে হেলান দিল ফোয়ারার সীমানা-প্রাচীরের গায়ে। 'কে তুমি? কেন এসব কথা বলছ? আমি জানি না এসবের অর্থ কী।'

'সত্যি?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'তা হলে ভুল লোকের কাছে এসেছি। অসুবিধে নেই, আসল লোককে খুঁজে নেব আমি। তাকে কী বলতে হবে, তা জানা আছে আমার।'

'কী বলতে হবে?'

হাসল রানা। ফিসফিসাল, 'পার নস্ত্রো...'

কথাটা শেষ করল না ও, আবছা আলোয় চুম্বকের মত সেঁটে রইল ওর দৃষ্টি সামনের মানুষটির মুখের উপর। কাউন্টের ঠোঁট ফাঁক হতে দেখল, তৃতীয় শব্দটা উচ্চারণ করতে চলেছে। কর্সিকার পাহাড়ে শোনা সেই পুরনো মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে যাচ্ছে তিভোলির এই অন্ধকার বাগানে।

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল বিয়াঞ্চি। বিস্ময় কেটে গিয়ে এখন নিখাদ আতঙ্ক ভর করেছে তার ভিতর। বলল, 'মাই গড! তুমি... না, এ হতে পারে না। সত্যি করে বলো, কোত্থেকে এসেছ তুমি? কী বলা হয়েছে তোমাকে?'

'সঠিক লোকের কাছে এসেছি, এটুকু বোঝার জন্য যথেষ্ট। বলুন এখন, আমাদের মধ্যে কি চুক্তি হবে?'

'নিজেকে বড্ড সেয়ানা ভাবছ তুমি, সাপ্রে... অথবা যা-ই তোমার নাম হোক না কেন!' হঠাৎ খেপে গেল বিয়াঞ্চি।

'আপাতত ওই নামটাই থাকুক,' উত্তেজিত হলো না রানা। 'ঠিক আছে, জবাব পেয়ে গেছি আমি। আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন প্রস্তাব। আমার ক্লায়েন্টকে জানাব সেটা।' চলে যাবার জন্য ঘুরল ও।

'অল্টো!' ইটালিয়ানে থামার জন্য চেঁচিয়ে উঠল বিয়াঞ্চি।

থামল রানা, কিন্তু ঘুরল না কাউন্টের দিকে। মাথাটা পাশ ফিরিয়ে বলল, *'পার্শে? চে কসা?'*

'তোমার ইটালিয়ান অত্যন্ত নিখুঁত, সেনিয়র।' ইংরেজিতে বলল বিয়াঞ্চি।

'সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা ভাষা। ঘোরাফেরার সময় খুব কাজে লাগে। আমি প্রচুর ট্র্যাভেল করি কি না! যাক সে-কথা, কী চান আপনি?'

'আমি না বলা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তুমি।'

'তাতে লাভ?' এবার কাউন্টের দিকে ফিরল রানা। 'জবাব তো দিয়েই ফেলেছেন আপনি।'

'যা বলছি, তা-ই করো। কথা না শুনলে শুধু গলা চড়াতে হবে আমাকে। আমার লোক এসে আটকে ফেলবে তোমাকে।'

ভেবে দেখল রানা, এখনও কিছু অর্জন করতে পারেনি ও।

কিছুই স্বীকার করেনি কাউন্ট। হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে, ফেনিসের সঙ্গে তার কানেকশন আছে; কিন্তু এখনও তো মুখে বলেনি সেটা। বরং ঘটনার আকস্মিকতায় যেন বোকা বনে গেছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। নার্ভাসনেস দেখে মনে হচ্ছে, কারও সাহায্য কামনা করছে সে। তবে কী...

হ্যাঁ... কোনও সন্দেহ নেই... নাগালের মধ্যে অন্তত আরেকজন আছে ফেনিসের; হয়তো আজকের পার্টির ভিতরেই। রাঘব-বোয়াল, বিয়াঞ্চির উপরের লোক। তার পরামর্শ নিতে চাইছে কাউন্ট। ফোয়ারার প্রাচীরে পিঠ ঠেকাল রানা, জল আরেকটু ঘোলা করা দরকার।

'তার মানে কি প্রস্তাবটা আবার ভেবে দেখছেন আপনি?' মুচকি হাসির সঙ্গে বলল ও।

'কিছুই ভাবছি না আমি!'

'তা হলে অপেক্ষা করব কেন? আমাকে অর্ডার দেয়া সাজে না আপনার। আমি আপনার পোষা কুকুর নই। ব্যবসায়িক সম্পর্ক হতে পারে কেবল আমাদের মাঝে—হ্যাঁ, কিংবা না। দ্যাট'স অল।'

'ব্যাপারটা এত সোজা নয়, সেনিয়র!' খ্যাপাটে শোনাল বিয়াঞ্চির গলা।

'আমার জন্য সোজা। এখানে স্রেফ সময় নষ্ট করছি আমি।' আবার পা বাড়াল রানা। চাইছে গার্ডকে ডেকে পাঠাক কাউন্ট। বাস্তবেও তা-ই ঘটল।

'নিকো!' অদৃশ্য পাহারাদারের নাম ধরে ডেকে উঠল বিয়াঞ্চি। *'প্রেস্তো!'*

নুড়ি বিছানো পথে দ্রুত পদশব্দ হলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই ফোয়ারার সামনের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মুশকো এক পালোয়ান। মনিবের নির্দেশ পেয়ে কোটের আড়াল থেকে বের করে

আনল একটা ছোট রিভলভার, তাক করল রানার দিকে।

মুখ খুলল বিয়াঞ্চি, কথার সাহায্যে পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনার প্রয়াস চালাল বুঝি। 'জামানা বড়ই কঠিন, সেনিয়র সাপ্রে। আমার মত মানুষকে সাবধানে চলতে-ফিরতে হয়, সশস্ত্র বডিগার্ড রাখতে হয় সঙ্গে। আশা করি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? সবখানে এখন সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য।'

খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না রানা। কথার ছুরি চালাল সঙ্গে সঙ্গে। 'অবাক হচ্ছি না, এসব ব্যাপারে আপনাদেরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা। মানে... টেরোরিস্টদের কথা... ব্রিগেডের কথা। আদেশগুলো কার কাছ থেকে আসে? রাখাল বালক?'

যেন ভয়ানক এক ঘুসি খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল বিয়াঞ্চি। কেঁপে উঠল শরীরের উর্ধ্বাংশ। কপাল বেয়ে ঘাম নামতে দেখল রানা। চোখদুটো যেন ভীত কোনও প্রাণীর।

'খেয়াল রেখো ওর দিকে,' ফিসফিসিয়ে গার্ডকে বলল কাউন্ট। তারপর ত্রস্ত পায়ে চলে গেল হাঁটাপথ ধরে।

নিষ্কম্প হাতে রিভলভার ধরে রানার কাছাকাছি চলে এল গার্ড। তার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হবার অভিনয় করল ও। ইটালিয়ানে বলল, 'কী ঘটল, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার বসের কাছে একটা বড়সড় ব্যবসায়িক প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম, উনি দেখি সেটা শুনে পাগলামি শুরু করলেন! ফর গডস্ সেক, আমি স্রেফ একজন সেলসম্যান! আমাকে আটক করছে কেন?'

চুপ করে রইল গার্ড। কিন্তু রানাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে পেশি একটু ঢিল করল সে। বিপদের আশঙ্কা করছে না আর, ওকে নিরীহ বন্দি বলে ভাবছে।

'একটা সিগারেট ধরাতে পারি?' বলল রানা। 'বন্দুক-টন্দুক

দেখলে ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাই আমি।'

'ধরাও,' অনুমতি দিল গার্ড।

পরের কয়েক ঘণ্টার জন্য ওটাই তার শেষ কথা।

সিগারেটের প্যাকেট বের করবার ভঙ্গিতে ডান হাত কোটের পকেটে ঢোকাল রানা, অন্যহাতটা রাখল শরীরের পাশে, ছায়ার আড়ালে। গার্ডের চোখ ওর মুঠো করা ডানহাতের উপর আটকে যেতেই ছোবল দিল। বাঁ হাতে খপ্ করে আঁকড়ে ধরল রিভলভার-সহ হাত, প্রচণ্ড এক মোচড় দিয়ে কবজি মচকে দিল। চেঁচাতে পারল না লোকটা, ডানহাতও চালিয়েছে রানা প্রায় একই সঙ্গে। সাঁড়াশির মত ও-হাতটা টিপে ধরল গার্ডের গলা, শব্দ বেরুতে দিল না, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে নিয়ে গেল ফোয়ারার পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

তাল হারিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। তার মচকানো হাতের মুঠো থেকে রিভলভার কেড়ে নিল রানা, উল্টে নিয়ে সজোরে নামিয়ে আনল কপালের উপর। বাটের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষের বিচ্ছিরি আওয়াজ হলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল গার্ড। অজ্ঞান দেহটাকে ঝোপঝাড়ের আরেকটু ভিতরে নিয়ে গেল রানা, তারপর রিভলভারটা কোমরে গুঁজে রওনা হলো ভিলার দিকে। হাতে একবিন্দু সময় নেই, কাউন্ট বিয়াঞ্চির হদিস পেতে হবে। দেখতে হবে, রহস্যময় রঘুনাথ সাপ্রে-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ সে কার কাছে দিচ্ছে।

তিন

নুড়ি বিছানো পথটা পাশে রেখে ঘাসের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটল রানা, এগোল ছায়ায় ছায়ায়। ভিলার কাছে পৌঁছে গতি কমাল। সামনে উঁচু সিঁড়ি, গিয়ে মিশেছে মূল ভবনের গায়ে। ওখানেই কোথাও গেছে কাউন্ট বিয়াঞ্চি। কিন্তু কার কাছে? এমন কে আছে, বিয়াঞ্চির মত প্রভাবশালী লোকও যার মুখাপেক্ষী হয়? নীচে বসে থাকলে তার জবাব পাওয়া যাবে না। তাই সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা। বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। কোমরে রয়েছে গার্ডের রিভলভার, কোটের তলায় শোল্ডার হোলস্টারে নিজের সিগ-সাওয়ার।

ফ্রেঞ্চ ডোর ঠেলে কোর্টইয়ার্ডের আদলে সাজানো হলঘরে ঢুকল ও। মিউজিশিয়ানদের বাজনা বদলে গেছে, জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ মেতে উঠেছে যুগল নৃত্যে। এদের মাঝে সোনিয়া নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাকে খোঁজার চেষ্টা করল না রানা। আগে কাউন্ট বিয়াঞ্চিকে চাই। কোথায় সে? চঞ্চল চোখ বোলাল ও কামরার ভিতরে। ভিলার ভিতরদিকে যাবার দুটো দরজা দেখতে পেল, ওগুলোর একটা দিয়ে গেছে বিয়াঞ্চি। কিন্তু কোন্‌টা?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জবাব পাওয়া গেল। নৃত্যরত জুটিদের মাঝ দিয়ে পথ করে দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক ছুটে যাচ্ছে বুফে টেবিলের ওপাশের দিকে। ডাক পেয়েছে তারা... সতর্ক করে

দেয়া হয়েছে! রানাও এগোল ওদিকে।

দরজার ওপাশে সিঁড়ি। লালচে পাথরের ধাপগুলো উঠে গেছে উপরদিকে। পায়ের আওয়াজ শুনল রানা... আর শুনল উত্তেজিত কণ্ঠ—উপর থেকে আসছে। দু'জন মানুষ, একজন কথা বলছে শান্ত ভঙ্গিতে, অন্যজন রীতিমত চেঁচাচ্ছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় কণ্ঠটা কাউন্ট বিয়াঞ্চির।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা, পিঠ মিশিয়ে রেখেছে দেয়ালের সঙ্গে। হাতে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বস্ত সিগ-সাওয়ার। প্রথম বাঁকটার কাছে একটা দরজা আছে, কিন্তু ওটার ওপাশ থেকে কথোপকথনের কোনও আওয়াজ আসছে না। আরেকটু উঠল ও। উপরে... তৃতীয় ল্যাণ্ডিঙের পাশে রয়েছে আরেকটা দরজা; শিকার ওখানেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজার পাশে পৌঁছে গেল ও, চোখ রাখল চাবির ফুটোয়। কাউন্টের পিঠ দেখতে পেল, নাগালের মধ্যে এইমাত্র কামরায় ঢোকা দুই ষণ্ডাও আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা নেই দৃষ্টিসীমার ভিতরে। ভিতরের কণ্ঠদুটো আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। কথাগুলো শুনতে পেল রানা।

'ব্রিগেডের কথা বলছে ও! আর... মাই গড... কর্সিকানদের রাখাল বালকের কথা! সব জানে ও! মাদার অভ গড... স-অ-ব!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো!' মৃদু ধমক শোনা গেল। 'স্রেফ খোঁচাখুঁচি করছে ও, আর কিছু না। এমন চেষ্টা যে করতে পারে, সে-ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে আমাদেরকে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তথ্য আছে আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে, তা তো আমরা জানিই! এক অ্যাডমিরালের ফোন পেয়েছিল আমাদের লোক, তখনই বোঝা গেছে ব্যাপারটা। স্বীকার করছি, ওটা সামান্য চিন্তার বিষয়...'

'সামান্য চিন্তা?' চেঁচিয়ে উঠল বিয়াঞ্চি। 'বলুন বিপর্যয়!

এ-ব্যাপারে কেউ যদি নিঃশ্বাসও ফেলে, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। সবখানে!'

'সর্বনাশ? তোমার?' বিদ্রূপের সুরে বলল অচেনা লোকটি। 'কে তুমি, মার্সেলো? আমরা তোমাকে যা বানিয়েছি, তার বেশি তো কিছুই না। মনে রেখো কথাটা। আর হ্যাঁ... ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তো স্বীকার করোনি কিছু। চলে এসেছ লোকটার সামনে থেকে। কিছুই প্রমাণ হয় না এতে।'

একটু নীরবতা বিরাজ করল। তারপর নিচু স্বরে বিয়াঞ্চি বলল, 'ওকে আটক করেছি আমি। একজন গার্ডের পাহারায় রেখে এসেছি ফোয়ারার পাশে।'

'কী বললে?' এবার দ্বিতীয়জনের চেঁচানোর পালা। 'ওকে আটক করেছ? পাগল হয়েছ নাকি? কেন?'

'কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না...'

'তাই বলে সন্দেহ জাগাবে ওর?'

'সন্দেহ জাগলেই বা কী? সামান্য এক ভারতীয় লোক... ওকে ট্যাকেল করা কঠিন কিছু না।'

'তুমি আমাদের সংগঠনের সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক, মার্সেলো... আবার প্রমাণ করে দিলে সেটা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অদেখা লোকটা। 'এখনও বুঝতে পারোনি, যাকে সামান্য এক ভারতীয় ভাবছ, সে আসলে দুর্ধর্ষ এক বিজ্ঞানী কুয়াশা! গিরগিটির মত রঙ বদলাতে জানে ও, তোমার মত বেকুবকে ধোঁকা দিতে পারে। হাহ্, তোমার ওই গার্ডকে পোকামাকড়ের মত পিষে মারতে একটুও দ্বিধা করবে না সে। না, এ-ভুল অক্ষমণীয়। তোমাকে দলে রেখে আর বিপদ বাড়ানো চলে না। ভিটো! আন্তোনিয়ো!'

দুই ষণ্ডার নাম ধরে ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে বেরিয়ে এল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে

গেল বিয়াঞ্চি, কিন্তু সুযোগ পেল না। ঘাতকদের পিস্তলে দুপ্ দুপ্ শব্দ উঠল। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল কাউন্টের প্রাণহীন দেহ।

লাশের দিকে এগোতে যাচ্ছিল এক ষণ্ডা, তাকে থামাল রহস্যময় লোকটা। বলল, 'থাক, ওকে নিয়ে এখন সময় নষ্ট কোরো না। ওর ডেডবডি পাওয়া যাবে—আগামীকাল সকালে... হেড্রিয়নের খাদে, নিজের গাড়ির ভিতর। এখন ওই রঘুনাথ সাপ্রে ওরফে কুয়াশাকে খুঁজে বের করো। ওকে জ্যান্ত আটকাবার চেষ্টা করবার দরকার নেই। দেখামাত্র গুলি করবে। সঙ্গের ওই সাদা পোশাক পরা মেয়েটাকেও। যাও, দু'জনেরই লাশ চাই আমি!'

চোয়াল শক্ত হলো রানার, ওদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে শত্রু! ইচ্ছে হলো এখুনি ঢুকে পড়ে কামরার ভিতরে, আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করে বসে, খতম করে দেয় ভিতরের দুই খুনি আর তাদের অচেনা মনিবকে। তা-ই করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল লোকটা আবার মুখ খোলায়।

'শালার মার্সেলো... সব গুবলেট করে দিয়েছ তুমি!' এক ষণ্ডাকে নির্দেশ দিল এরপর। 'কাজ শেষ করে তুরিনে যোগাযোগ কোরো। ওদেরকে বলবে দুই ঈগল আর বেড়ালকে খবর দিতে। কী ঘটেছে এখানে, সেটা যেন জানিয়ে দেয়...'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল দুই খুনি। আর দেরি করা যায় না। সোনিয়াকে বাঁচাতে হবে। উল্টো ঘুরে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা... যত দ্রুত পারে। খুব শীঘ্রি বেরিয়ে এল হলঘরে। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল সঙ্গিনীর খোঁজে, কিন্তু প্রথম দর্শনে খুঁজে পেল না। এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসছে। খুনিরা বেরিয়ে আসবে এখুনি। কী করা যায়?

ভেবে দেখল রানা—দু'জন খুনি আসছে... এর মধ্যে একজনকে যদি ঘায়েল করা যায়, তা হলে বিপদের মাত্রা কমিয়ে

আনা যায় অনেকখানি। দু'জন যতটা দ্রুত অন্যান্য গার্ডদেরকে সতর্ক করে দিতে পারবে, একজন ততটা পারবে না। তা ছাড়া যাকে ঘায়েল করবে, তার মুখ থেকে অচেনা লোকটার পরিচয়ও জেনে নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল, দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। একটু পরেই পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে এল দুই খুনি। প্রথমজন ছুটে গেল ফ্রেঞ্চ ডোরের কাছে, ভিলা থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ইপোলিটোর ফোয়ারার কাছে। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েক হাত তফাতে, রানার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে। তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে ড্যান্স ফ্লোরে, খুঁজছে সোনিয়াকে। সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে গেল রানা, আচমকা জাপটে ধরল পিছন থেকে।

ধস্তাধস্তি করল খুনি, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। রানার শক্তিশালী দু'হাতের বজ্র-আঁটুনিতে আটকা পড়েছে। এমনভাবে ধরেছে রানা, তাতে লোকটার পক্ষে কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করা সম্ভব নয়। টান দিয়ে ওকে পিছনে নিয়ে এল ও, হাতের দুটো আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড এক খোঁচা মারল কিডনিতে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল খুনি, কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল হলঘরের উদ্দাম সঙ্গীত, নৃত্যরত জুটিদের কলকাকলিতে। সবাই নাচানাচিতে ব্যস্ত; আশপাশে কী ঘটছে, সেদিকে নজরই দিচ্ছে না। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। কাতরাতে থাকা খুনিকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল দেয়ালের পাশের একটা চেয়ারে, কেড়ে নিল পিস্তল। লোকটার উরুসন্ধির উপরে একটা হাঁটু তুলে দিল ও, চেপে বসল গায়ে। কেড়ে নেয়া পিস্তলটা সবার চোখের আড়ালে রেখে ঠেকাল ব্যাটার বুকে।

খুনির কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল রানা, দূর থেকে তাকালে

মনে হবে, কানে-কানে কথা বলছে দুই মাতাল বন্ধু। ফিসফিস করে ও বলল, 'উপরের লোকটা... কে সে? জলদি বলো, নইলে নিজের পিস্তলের গুলিতেই ফুটো হয়ে যাবে তুমি। সাইলেন্সার লাগানো আছে, কেউ টের পাবে না কিছু। কুইক! কে ওই লোক?'

'না!' শরীর মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল খুনি। হাঁটুর চাপ বাড়িয়ে দিল রানা, এক আঙুলে খোঁচা মারল ব্যাটার শ্বাসনালীতে। চোখে অন্ধকার দেখল খুনি। ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু চেঁচাতে পারছে না বাতাসের অভাবে। টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করল দু'চোখ।

'লাস্ট চান্স। কে ওই লোক?' রানার কণ্ঠে মৃত্যুর শীতলতা।

ওর চোখে চোখ রেখে নিয়তির অমোঘ পরিণতি টের পেল খুনি। বুঝতে পারল, কোনও দয়া পাবে না; কথা না শুনলে মরতে হবে তাকে। তাই ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বলল, 'সেনিয়র পাভোরোনি।'

লোকটার ঘাড়ের উপর একটা কারাতে চপ বসাল রানা। অজ্ঞান দেহটাকে শুইয়ে দিল পাশাপাশি দুটো চেয়ারের উপর। তারপর উল্টো ঘুরে নেমে পড়ল ড্যান্স ফ্লোরে। হাতে সময় নেই, সোনিয়াকে খুঁজে বের করে এখুনি সরে যেতে হবে এ-জায়গা থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করল ও। বিয়াঞ্চির সহকারীকে জড়িয়ে ধরে নেচে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে দু'জনকে থামাল রানা। সহকারীকে বলল, 'তোমার নামই তো পিয়েত্রো, তাই না?'

'জী, সেনিয়র।'

'কাউন্ট বিয়াঞ্চি এখুনি যেতে বলেছেন তোমাকে। কী যেন ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে।'

'নিশ্চয়ই, সেনিয়র! কোথায় উনি?'

'ওপরতলায়।'

সোনিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে তড়িঘড়ি করে চলে গেল পিয়েত্রো। টান দিয়ে মেয়েটাকে এবার ড্যান্স ফ্লোর থেকে সরিয়ে আনল রানা।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'চলে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। ওকে নিয়ে এল হলঘরের একপ্রান্তে। সারি বাঁধা চেয়ারগুলোর উপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে অসংখ্য কাপড়চোপড়। নাচতে যাবার আগে বাড়তি পরিচ্ছদ খুলে রেখে গেছে অতিথিরা। ওখান থেকে একটা কালো রঙের আলখাল্লা খুঁজে নিল রানা, বাড়িয়ে ধরল সঙ্গিনীর দিকে। 'পরে ফেলো এটা।'

'কেন?'

'আমাকে... সেই সঙ্গে সাদা গাউন পরা একটা মেয়েকে খুঁজছে গার্ডরা। কথা বাড়িয়ো না, জলদি পরো।'

ত্রস্ত হাতে গাউনের উপর আলখাল্লা চড়াল সোনিয়া। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'চলো।'

'এখনও না,' মাথা নাড়ল রানা। 'একটু পরে। ডাইভারশনের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'কীসের ডাইভারশন?'

'শীঘ্রি টের পাবে।'

কয়েক মিনিট পরেই ভেসে এল উত্তেজিত হাঁকডাক। জ্যা-মুক্ত তীরের মত সিঁড়ির দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল পিয়েত্রো। ইটালিয়ানে চেঁচামেচি জুড়ল। পরমুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল অতিথিরা। কয়েকটা শব্দ ক্রমাগত ভেসে আসছে কানে।

ওমিসিডিয়ো!

টেরোরিস্তি!

ফুগিনি!

মানে পরিষ্কার—কাউন্ট বিয়াঞ্চির লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হুড়োহুড়ি করে ভিলা থেকে পালাতে চাইছে অতিথিরা, তাদের ভিড়ের মাঝে মিশে গেল রানা আর সোনিয়া। ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়ে এল হলঘর থেকে। যেদিক দিয়ে বেরিয়েছে, সেখানে একটা বড় টেরাস। পা রেখেই থমকে গেল ওরা।

'অ্যাই! থামো তোমরা!' শোনা গেল হুঙ্কার।

পথ আটকে সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম খুনি। হাতে উদ্যত পিস্তল... গুলি করতে যাচ্ছে। এক ধাক্কায় সোনিয়াকে সরিয়ে দিল রানা, নিজে ডাইভ দিল অন্যপাশে। খুনির বুলেট চলটা ওঠাল টেরাসের পাথরের। গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে নিজের সিগ-সাওয়ার। নিমেষে দুটো গুলি ছুঁড়ল ও। বুকে ভারী বুলেটের আঘাত পেয়ে মাটিছাড়া হলো খুনি, আছড়ে পড়ল টেরাসের ওপাশের সিঁড়িতে, গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে।

গুলির আওয়াজে অতিথিরা আরও ভয় পেয়ে গেছে। নারীকণ্ঠের চেঁচামেচিতে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। হামাগুড়ি দিয়ে সোনিয়ার কাছে গেল রানা। টেরাসের একপাশে রেলিঙের উপর গিয়ে পড়েছে বেচারি রানার ধাক্কা খেয়ে। বেমক্কা আঘাত পেয়েছে পেটে আর বুকে। মাটিতে বসে পড়ে চেষ্টা করছে ব্যথা সামলাতে।

'লেগেছে তোমার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

ফ্যাকাসে হাসি দেখা দিল সোনিয়ার ঠোঁটে। 'বেঁচে তো আছি!'

'তা হলে ওঠো!'

টান দিয়ে সোনিয়াকে দাঁড় করাল রানা। উঁকি দিল রেলিঙের

ওপাশে। লন বেশি নীচে নয়। সঙ্গিনীকে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওখানে। সোজা হয়ে সামনে তাকাল, দেখতে পেল সুন্দরভাবে ছাঁটা ঝোপ আর বাগান-ভাস্কর্যের সারি।

'মুভ!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। তারপর ছুটতে শুরু করল নাক বরাবর সামনে, ঢুকে গেল ঝোপঝাড় আর মূর্তির ভিড়ের ভিতর। কৃত্রিম জলপ্রপাতের পানির ছিটেয় ভিজে আছে পুরো জায়গাটা, কিছুদূর গিয়েই আছাড় খেল সোনিয়া, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

থামল রানা, ধরাধরি করে ওকে উঠতে সাহায্য করছে, এমন সময় শোনা গেল নতুন কণ্ঠ।

'দানিযিয়োন!'

'এক্কোলা!'

'ল্যা ডোনা!'

চিৎকারগুলো ভেসে এসেছে পিছন থেকে, তার সঙ্গে এল গুলির আওয়াজ। দাঁড়াল না আর রানা, সোনিয়াকে নিয়ে পিছিয়ে গেল একটা ঝোপের নীচে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাগানের নুড়িপথ ধরে দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল দৃষ্টিসীমায়। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। পিছন থেকে ভেসে আসা আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছে অবয়বদুটো।

নির্দ্বিধায় গুলি করল রানা। একজন বুক চেপে ধরে চিৎ হয়ে গেল, অন্যজন কাঁধে আঘাত পেয়ে ঘুরে গেল আধপাক। ছিটকে পড়ল একটা মূর্তির গায়ে। লোকটার ওজন সহ্য করতে পারল না পুরনো ভাস্কর্য, কাত হয়ে গেল। মূর্তি আর মানুষ... উভয়েই জড়াজড়ি করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। লোকটার বুকের উপর পড়েছে ভারী মূর্তি, পাঁজরের হাড় ভাঙার মটমট শব্দ হলো। ক্ষণিকের জন্য আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপর চুপ।

একটু অপেক্ষা করল রানা, আর কেউ আসে কি না দেখার

জন্য। এল না কেউ, তাই সোনিয়াকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ছুটতে শুরু করল আবার। দূরে কোথাও একের পর এক গাড়ির ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে ওঠার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এগোতে থাকল সেদিক লক্ষ্য করে।

বাগানের সীমানা ভেদ করে একটু পর বেরিয়ে এল ওরা। সামনে বিশাল এক খোলা জায়গা—এস্টেটের পার্কিং লট। ভিলার গোলমাল এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ধোপদুরস্ত শোফার আর ভ্যালে-দের মধ্যেও। ছোটাছুটি করে একেকটা গাড়িতে উঠছে তারা, স্টার্ট দিয়ে ছুটছে মালিকদেরকে উঠিয়ে নেবার জন্য। কিছু অতিথি গাড়ির অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়, রাস্তা ধরে দৌড়ে চলে এসেছে তারা পার্কিং লটে। চেঁচামেচি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজেদের বাহন। মহা-বিশৃঙ্খলা চলছে জায়গাটায়। বুঝতে পারল রানা, এর মাঝখানে নিজের গাড়ি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়... অন্তত সবার অলক্ষে।

কাছাকাছি দাঁড়ানো একটা মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে গেল ও। শোফার দাঁড়িয়ে আছে পাশে, আশ্চর্য রকম শান্ত তার চেহারা, আশপাশের উত্তেজনা যেন স্পর্শ করছে না তাকে। ট্রেইনড় মাল... সম্ভবত শত্রুপক্ষের লোক। বেঢপভাবে ফুলে আছে ইউনিফর্মের একটা পাশ... সশস্ত্র! বোঝা গেল, স্রেফ গাড়ি চালায় না সে, দেহরক্ষীর দায়িত্বও পালন করে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল রানা। 'এটা কি কাউন্ট বিয়াঞ্চির গাড়ি?'

'জী না, সেনিয়র,' রূঢ় কণ্ঠে বলল শোফার। 'দূরে থাকুন...'

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, বিদ্যুৎচমকের মত নড়ে উঠল ওর হাত। সিগ-সাওয়ারের বাট হাতুড়ির মত চালাল লোকটার কপালের পাশে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘায়েল হলো বেচারা।

কাটা কলাগাছের মত হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। তার পকেট হাতড়ে চাবি বের করে নিল রানা, দরজা খুলে চড়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল সঙ্গিনীকে।

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল সোনিয়া। ওকে নির্দেশ দিল রানা, 'মাথা নামিয়ে রাখো।' তারপর স্টার্ট দিয়ে আগে বাড়াল মার্সিডিজকে। তাড়াহুড়ো করল না, শান্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। কিছুদূর গিয়েই অবশ্য থেমে যেতে হলো। এস্টেটের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়েছে প্রহরীরা, গেটের সামনে বিশাল এক যানজট। অস্ত্রধারী একদল লোক, তল্লাশি চালাচ্ছে প্রতিটা গাড়িতে।

দাঁড়িয়ে থাকা মানে ধরা পড়ে যাওয়া। দাঁতে দাঁত পিষে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে সবেগে এগোতে শুরু করল। মার্সিডিজের একপাশের চাকা নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে, রাস্তার পাশের ফুলের কেয়ারি তছনছ করে ছুটছে যান্ত্রিক বাহন। হৈ-হৈ করে উঠল প্রহরীর দল, অস্ত্রহাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল সামনে, চেষ্টা করল পথরোধ করতে। নির্মম ভঙ্গিতে বাম্পারের ধাক্কায় তাদেরকে উড়িয়ে দিল ও, গতি কমাল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে প্রহরীদল, ভুলে গেছে গুলি করতে। সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই গেটের কাছে পৌঁছে গেল মার্সিডিজ। ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর দাবিয়ে রেখেছে রানা, বুনো ষাঁড়ের মত ফটকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িটা। ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল মার্সিডিজের নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো গেটের পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার উপর। ক্ষিপ্ত পশুর মত ওগুলোকে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল মার্সিডিজ, বেরিয়ে গেল এস্টেটের সীমানা

থেকে।

ব্রেকে চাপ দিল রানা, বন্‌বন্‌ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার উপর সিধে করল গাড়িকে। ভারসাম্য ফিরে পেতেই পূর্ণ গতিতে ছুটল। ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ বেরুচ্ছে, সংঘর্ষে সম্ভবত মারাত্মক জখম হয়েছে ওটা; কিন্তু পাত্তা দিল না। বিপদ এখনও কাটেনি। সোনিয়াকে মাথা তোলার চেষ্টা করতে দেখে ধমকে উঠল, 'ওখানেই থাকো!'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ধাওয়াকারীদের দেখা পেতে। খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট, তার পরেই রিয়ারভিউ মিররে উদয় হলো একটা ফিয়াট ইউটিলিটি পিকআপ। দ্রুত এগোচ্ছে, কমিয়ে আনছে দূরত্ব। পিছনে লেগে আছে ছায়ার মত।

দু'মাইল এগিয়ে গেল রানা। তারপর আচমকা মোড় নিল *মন্টে মারিয়ো* হিল-ড্রাইভের দিকে। চুলের কাঁটার মত বাঁক ঘুরে স্প্রিঙের মত পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তা ধরে দ্রুতগতিতে উঠে চলল। লাৎসিয়ো মাউন্টেইন রেঞ্জের অন্তর্গত এ-পাহাড়, ঢালে ফার্নের জঙ্গল। পথের প্রতিটি বাঁক পেরিয়ে একটু করে অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াচ্ছে রানা। ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনুগত রয়েছে মার্সিডিজ, হেয়ারপিন বেণ্ডগুলো নিপুণভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, যেন রেলের ওপরে বসানো রয়েছে গাড়ির চাকা। ফাঁকে ফাঁকে রিয়ারভিউ মিররে দেখছে রানা, মার্সিডিজের সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ফিয়াটের ড্রাইভার। পিকআপ-টার শরীর মার্সিডিজের চেয়ে বড়, নড়তে-চড়তে জায়গাও নেয় বেশি।

প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই শুরু হলো হামলা। কোনোরকম আগাম সঙ্কেত না দিয়েই ছুটে এল বুলেট। দরজার পাশে বসানো ছোট্ট সাইডভিউ মিররটা চুরমার করে দিল গুলি। স্টিয়ারিঙের উপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা, অ্যাকসেলারেটরে পুরো চেপে

বসল পা।

গুলির শব্দ পায়নি রানা, তারমানে ধাওয়াকারীরা সাইলেন্সার ব্যবহার করছে। বিড়বিড় করে গাল দিল নিজেকে, শহরের দিক থেকে সরে হয়তো মস্ত বোকামি করে ফেলেছে। যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চলাটাই বরং নিরাপদ ছিল। এখন ওর একমাত্র চিন্তা কিভাবে গুলি এড়িয়ে রোমে পৌঁছুনো যায়। কপাল ভাল হলে অবশ্য এর আগেই পথে কোনও পুলিশের গাড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রিয়ারভিউ মিররে আবার চোখ পড়তেই আঁতকে উঠতে হলো। মার্সিডিজের পিছনের বাম্পারের ত্রিশ গজের মধ্যে এসে গেছে ফিয়াট।

পরিষ্কার বুঝল রানা, পিকআপের ইঞ্জিনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে—বাইরের চেহারা যা-ই হোক, ধুঁকতে থাকা মার্সিডিজ নিয়ে ওটাকে খসানো ওর সাধ্য নয়। স্পিডেই পারবে না ওটার সঙ্গে।

সামনে দু'হাজার ফুট উপরে উঠে গেছে পথটা, তারপর তীক্ষ্ণ কয়েকটা মোড় নিয়ে আবার নেমে গেছে রাজধানীর দিকে। মাইলখানেক একেবারে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল মার্সিডিজ, এক মাইলে আরও কিছুটা এগিয়ে এল ফিয়াট।

সামনে আবার মোড়। গতিবেগ কমাল না রানা। যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে মাথা। স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই করছে।

মার্সিডিজের একেবারে পাশে চলে এল পিকআপ। নির্দ্বিধায় রাস্তার সেন্টার লাইন ক্রস করে এগিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে একপলকের জন্যে ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। কুৎসিত চেহারার এক লোক। লম্বা কালো চুল। কালো চোখের তারা জ্বলছে। বাদামি চামড়ায় ঢাকা ছোট্ট নাক। পিকআপের খোলা পিছনদিকটায় অটোমেটিক মেশিনগান নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে

আরও দু'জন। ড্রাইভারের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, বাগে পেয়েছে শিকারকে।

ড্রাইভারের হাসির জবাবে, তার বোঁচা নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয়ার ইচ্ছে হলো রানার। রীতিমত অসহায় বোধ করছে। আঁকাবাঁকা রাস্তার কারণে ড্রাইভিঙে দিতে হচ্ছে পুরো মনোযোগ, পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়বে... সে-সুযোগ নেই। পিকআপের খুনিদের গুলিতে এখন স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবার অপেক্ষা।

বিস্ময়ের ব্যাপার, গুলি করল না ওরা। কারণ জানার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা, সামনে... বাঁয়ে চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে রাস্তা। ঝড়ের বেগে একটা সাইনবোর্ড পার হয়ে গেল, হলদে রঙে লেখা—*গতিবেগ বিশ মাইল।* কিন্তু তিন গুণ গতিতে ছুটছে মার্সিডিজ। ওটার মত এত দ্রুত মোড় নিতে পারল না ভারী পিকআপ, বাধ্য হয়েই পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মোড়টা ঘুরেই অ্যাকসেলারেটর পুরো চেপে ধরল ড্রাইভার। দ্রুত এগিয়ে আসছে আবার।

তুমুল বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়। কী করে পার পাওয়া যাবে, ভাবছে। একটার পর একটা ফন্দি আঁটছে, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না কোনোটাই। আরেকটা মোড় আসছে। গতি কমানোর জন্যে ব্রেকে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ব্রেক ছেড়ে অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াতে লাগল, রিয়ারভিউ মিররে ফিয়াট এবং ড্রাইভারের গতিবিধি লক্ষ করছে। ফিয়াটকে আবার মার্সিডিজের পাশে নিয়ে আসতে চাইছে ড্রাইভার।

গুলি চালাচ্ছে না আর প্রতিপক্ষ। পিকআপের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। মার্সিডিজকে *ঠেলে* পাহাড়ের কয়েকশো ফুট নিচের উপত্যকায় ফেলে দিতে চাইছে ওরা। দুশো গজ পরেই

আরেকটা বাঁক। গতি কমাল না রানা। ক্রমেই মার্সিডিজের সামনের লেফট-ফেণ্ডারের কাছে এসে যাচ্ছে ফিয়াট। আর একটু এগিয়ে একটা ধাক্কা লাগাতে পারলেই আকাশে উড়ে যাবে ওদের গাড়ি। পড়বে গিয়ে নীচের পাথুরে মাটিতে।

অ্যাকসেলারেটর পুরো চেপে ধরল রানা। ধরে রাখল, তারপর আচমকা ছেড়ে দিয়ে ব্রেক করল। হঠাৎ মার্সিডিজের এই অদ্ভুত ব্যবহারে ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ড্রাইভার। হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। মার্সিডিজের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গতি বাড়িয়েছিল। পাশে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার সুযোগটা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ গতি বাড়িয়ে অসতর্ক করে দিয়েছে তাকে রানা। বাঁকে পৌঁছে গেছে ওর গাড়ি।

ব্রেক চেপে রেখেই বন্ বন্ করে স্টিয়ারিং কেটে মার্সিডিজের নাক ঘোরাল রানা। রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল টায়ার। মাটি কামড়ে রয়েছে মার্সিডিজ, তবু গাড়ির পিছনটা স্কিড করে রাস্তার বাইরে চলে যেতে শুরু করল। সেইদিকেই সামান্য একটু স্টিয়ারিং কাটল রানা। সোজা হয়ে গেল গাড়ি আবার। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে আড়াআড়িভাবে পুরোপুরি থামিয়ে ফেলল মার্সিডিজকে। গাড়িটা এখন ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে ফিয়াটের পথে।

চাইলে সরাসরি ওটাকে আঘাত করতে পারত ফিয়াটের ড্রাইভার। কিন্তু পরিস্থিতিটার জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিল না সে। চমকে যাওয়ায় ড্রাইভার-সুলভ নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশনে চলে গেল তার দু'হাত। সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘুরিয়ে ফেলল স্টিয়ারিং। নাক ঘুরে গেল পিকআপের, বাঁকের পাশ ঘেঁষে হুড়মুড় করে নেমে গেল ঢালে। ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার আর পাহাড়ি ঢালে ইস্পাতের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ঢালের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে ঝোপঝাড়ের উপরে উড়ছে ধুলোর মেঘ। পাহাড়ের গোড়াটা যেখানে উপত্যকায় মিশেছে, তার কাছ থেকে একটু দূরে পড়ে আছে ফিয়াট। ইঞ্জিনটা ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে একপাশে ছিটকে পড়েছে। তালগোল পাকানো ধাতব বস্তুতে পরিণত হয়েছে পিকআপের শরীর। ড্রাইভার আর দুই খুনি থেঁতলে গেছে ওটার তলায় পড়ে।

নির্বিকার রইল রানা। ফিরে এল গাড়িতে, স্টার্ট দিয়ে নাক ঘোরাল, এগোল সামনে। সোনিয়া উঠে বসেছে সিটের উপরে। হতভম্ব চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটল?'

'পিছনে লেগেছিল,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি ওদেরকে।'

'আর ভিলার ভিতরে?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সংক্ষেপে সব খুলে বলল রানা—ফোয়ারার পাশে বিয়াঙ্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর কাউন্টের খুনের ঘটনা। শেষে যোগ করল, 'ওরা আমাকে কুয়াশা ভেবেছে। কেন, তা বুঝতে পারছি না। মনে হলো আমার কথা ভাবতেই পারেনি ওরা, শুধু কুয়াশাকে আশা করেছে। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না।'

'একটু অদ্ভুত হয়ে গেল না ব্যাপারটা? তোমরা দু'জনেই তো পিছনে লেগেছ ফেনিসের। সেটা তো ওদের জানা থাকার কথা।'

'অবশ্যই! তারপরেও কুয়াশাকে সন্দেহ করল কেন?' একটু ভাবল রানা। 'একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে এর। ওদের ধারণা... কিংবা ওদেরকে জানানো হয়েছে... আমি মারা গেছি!'

'এমন একটা ভুয়া কথা ছড়াবে কেন কেউ?'

'ভাল প্রশ্ন। ছড়াতে হলে আমিই ছড়াতাম সেটা, ওদের চোখে

নিজেকে মৃত দেখিয়ে গোপনে কাজ করতাম। কিন্তু তা করিনি.... তা হলে এ-খবর ছড়াল কে?'

'এমন হতে পারে না, কোনও কারণে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ওদের মনে? হয়তো কোনও লড়াইয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল না তোমার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এমন কোনও সিচুয়েশনে পড়িনি এখন পর্যন্ত। মরে যাবার গুজবও ছড়াইনি। কৌশলটা অবশ্য বেশ ভাল, কিন্তু গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য বানাতে হলে অনেক ধরনের আয়োজন লাগে; এত সময় ছিল না হাতে, তাই আর চেষ্টা করিনি।' চুপ হয়ে গেল ও। মনে পড়ে গেছে পাভোরোনির কথাগুলো।

...তুরিনে যোগাযোগ কোরো। ওদেরকে বলবে দুই ঈগল আর বেড়ালকে খবর দিতে...

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'অন্য একটা বিষয়,' বলল রানা। 'বার্নার্দো পাভোরোনি... ও কি তুরিনে বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি কোম্পানিগুলো চালায়?'

'এককালে চালাত... কন্টেসার মেয়েকে বিয়ে করবার পরে। শুধু তুরিন না; রোম, মিলান, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস—সব জায়গার দায়িত্বই ছিল তার কাঁধে। তবে পরবর্তীতে তার শ্যালক—কাউন্ট মার্সেলো সবকিছু আবার নিজে বুঝে নেয়। এখন তো সে-ই ওদের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের মাথা। মানে... পত্র-পত্রিকায় তা-ই বলে।'

'ওটা স্রেফ কাভার,' বুঝতে পারছে রানা। 'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য দেখিয়েছে। কাউন্ট বিয়াঞ্চি ছিল একটা শো-পিস, আড়াল থেকে এখনও কলকাঠি নাড়ছে পাভোরোনি।'

'তা হলে কাউন্ট বিয়াঞ্চি ফেনিসের অংশ ছিল না?'

'তা ছিল। এক অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বললেও ভুল হবে না। উঁচু বংশের স্ত্রী-র পাশাপাশি ফেনিসকে সে আর তার

মা তুলে দিয়েছে পাভোরোনির পাতে। কথা হলো, পাভারোনি এর সঙ্গে জড়াল কেন? তার মত ব্যবসায়ীর জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ব্যবসায়ীদেরই। এ-জন্যে পলিটিক্যাল প্যার্টিদের পিছনে টাকা ঢালে ওরা, চেষ্টা করে এমন মানুষকে ক্ষমতায় বসাতে, যারা অপরাধ আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের লাগাম টেনে ধরতে পারবে।'

'এমন সরকার ইটালিতে নেই,' মন্তব্য করল সোনিয়া।

'সে-কথা বহু দেশের বেলাতেই খাটে। তার মানে এই নয় যে, ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করে না। ইউ সি, সাধারণ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়লে অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে যায়। তাই অস্থিরতা চায় না ব্যবসায়ীরা, চায় সুস্থ পরিবেশ। কিন্তু ফেনিসের দর্শন ঠিক উল্টো। সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে ওরা, সাহায্য করছে অপরাধী আর টেরোরিস্টদেরকে। পাভোরোনি কীসের জন্য এদের হয়ে কাজ করবে?'

'দু'রকম কথা বেরুচ্ছে তোমার মুখ দিয়ে, রানা,' আস্তে রানার কাঁধে হাত রাখল সোনিয়া। 'একবার বলছ বার্নার্দো পাভোরোনি ফেনিসের সদস্য; আবার বলছ সেটা হতে পারে না।'

'আমি শুধু দ্বিধার কথা বলছি,' রানা বলল। 'পাভারোনি ওদের লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যোগ দিয়েছে, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'জানার চেষ্টা করবে?'

'এখানে আর না। ইটালি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, আমরা সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে। হয়তো পরের জায়গায় সূত্র খুঁজে পাব।'

'*আমরা* সরে পড়ছি মানে! আমার না এখানেই থাকার কথা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'আজ রাতের ঘটনা পরিস্থিতি বদলে

দিয়েছে, সোনিয়া। তোমার জন্য রোমে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'তা হলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'প্যারিস। ওখানে যোগাযোগ মেইনটেন করবার মত নিজস্ব সেটআপ আছে আমার। তোমার থাকার জায়গাও করে দেব।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'লণ্ডন। পাভোরোনির ব্যাপারে জানতে পেরেছি আমরা—ও-ই বিয়াঞ্চি-র উত্তরসূরি। এবার লণ্ডনের পালা।'

'ওখানে কেন?'

'পাভোরোনি তার লোককে দুই *ঈগল* আর *বেড়াল*-কে খবর দিতে বলছিল। কর্সিকায় তোমার দাদীর কাছে যা শুনেছি, তা থেকে কোডগুলোর অর্থ বের করা কঠিন কিছু না। দুই ঈগল হচ্ছে আমেরিকা আর রাশা...'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল সোনিয়া, 'রাশার প্রতীক তো ঈগল না, ভালুক!'

'এ-ক্ষেত্রে নয়,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'রাশান ভালুক আসলে বলশেভিক; কিন্তু রাশান ঈগলটা হচ্ছে জারিস্টদের প্রতীক। ভিলা বারেমির সেই প্রথম সভার তৃতীয় অতিথি ছিল প্রিন্স আলেক্সেই তারাকিন—সেইন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দা, এখন ওটা লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত। ওখানেই গেছে কুয়াশা।'

'আর বেড়াল?'

'ব্রিটিশ সিংহ। সভার দ্বিতীয় অতিথি ছিল স্যর নাথান উইটিংহ্যাম। তাঁর বংশধর, নাইজেল উইটিংহ্যাম, এখন ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি।'

'এ তো খুবই হাই পজিশন।'

'বড্ড বেশি উঁচু, বড্ড বেশি দৃশ্যমান। ইনিও ফেনিসের সঙ্গে

জড়াবেন বলে বিশ্বাস হতে চায় না। একই দশা আমেরিকায়। ওখানকার যে-সিনেটরের নাম বেরিয়ে আসছে, তিনি সম্ভবত আগামীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। এসব লোক ফেনিসের সদস্য হবেন কেন, তার কোনও আগামাথা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আর সে-কারণেই ভয় পাচ্ছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'রহস্যটা সমাধানের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজটা কঠিন হচ্ছে ক্রমে। আমাদের ব্যাপারে সচেতন ফেনিস, সমস্ত সূত্র মুছে দেবার চেষ্টা করবে ওরা। দুই ঈগল আর এক বেড়ালের পিছনে কী লুকানো আছে, তা বের করা সহজ হবে না।'

'তুমি তো বিপদে ঝাঁপ দিচ্ছ, রানা!' নিখাদ উদ্বেগ প্রকাশ পেল সোনিয়ার গলায়।

'আমার চেয়েও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে কুয়াশার জন্য। ওরা ভাবছে আমি মারা গেছি, সে-কারণে খানিকটা হলেও সুবিধে পাব। কিন্তু কুয়াশা তা পাচ্ছে না। আজই যোগাযোগ করব হেলসিঙ্কিতে। ওকে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'ওকে বলে দিতে হবে, লেনিনগ্রাদের রাস্তাঘাটে কাউকে যদি ভারাকিন পরিবারের ব্যাপারে খোঁজ নিতে দেখে ফেনিস, তার মৃত্যু অনিবার্য।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল সোনিয়া।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'অন্ধের মত এগোচ্ছি আমরা। কাউন্সিলের চার প্রতিষ্ঠাতার বংশধরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কারণ তাদের নাম আছে আমাদের হাতে। কিন্তু পুরো ষড়যন্ত্রটার পিছনে বসে আছে আরেকজন! সে-ই নাটের গুরু। তাকে বের করতে না পারলে এই চারজনকে দিয়ে কিছুই হবে না।'

'কে সেটা?'

'কর্সিকার জনৈক *রাখাল বালক*। তাকেই আসলে খুঁজে বের করা দরকার আমাদের, অথচ আমার কোনও আইডিয়া-ই নেই কীভাবে সেটা সম্ভব হতে পারে।'

চার

হেলসিঙ্কির *ইটা কাইভোপুইস্তো*-র রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে কুয়াশা, থেমে দাঁড়াল একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে। আমেরিকান দূতাবাস এখান থেকে বেশি দূরে নয়; যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকেই চোখে পড়ছে বিল্ডিংটার আলো। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, নেমে এসেছে নির্জনতা। আশপাশে না আছে মানুষ, না চলছে গাড়ি।

চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর মাথা। গতকাল পৌঁছেছে ও ফিনল্যাণ্ডে, রাতটা বিশ্রাম নিয়েছে টাভাস্টিয়ান হোটেলে, সকালবেলায় রিসিভ্ করেছে রানার পাঠানো সাঙ্কেতিক মেসেজ। ইটালিয়ান ক্রিস্টালের আমদানি-সংক্রান্ত রিপোর্টের আদলে পাঠানো হয়েছে ওটা, দিনের প্রায় পুরো সময় লেগেছে তার পাঠোদ্ধার করতে। যে-সব তথ্য জানতে পেরেছে ও থেকে, তা একই সঙ্গে বিস্ময়কর এবং জটিল। অল্প সময়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে রানা।

ফেনিসের প্রথম কানেকশন আবিষ্কার করে ফেলেছে দুর্ধর্ষ

ছেলেটা। কাউন্ট বিয়াঞ্চির সূত্র ধরে জানতে পেরেছে, ওই দিকটাতে কে এখন ফেনিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বার্নাদো পাভোরোনি। একটাই অর্থ হতে পারে এর—রানাও তার মেসেজে একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে—ফেনিসের নিয়ন্ত্রণভার এখন আর মূল চার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কালের আবর্তনে পরিবারের বলয় পেরিয়ে এখন সেখানে স্থান নিয়েছে দক্ষ, যোগ্য নেতারা। পারিবারিক উত্তরসূরি, সেইসঙ্গে এ-সব লোকের হাতে পড়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সংগঠনটা। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে ফেনিসের ফিরে আসার পিছনে নিশ্চয়ই এদের হাত আছে।

পরিস্থিতি যে আগের চেয়ে গুরুতর হয়ে পড়েছে, তা বুঝতে পারছে কুয়াশা। বিয়াঞ্চির ওখানে রানাকে উদয় হতে দেখে এবার সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। লেনিনগ্রাদে ভারাকিন পরিবারের বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে কী ধরনের বিপদে পড়তে হবে, তা কল্পনাও করতে পারছে না এ-মুহূর্তে। কিন্তু সে-কারণে পিছিয়ে যাবার মানুষ নয় সে। যত ঝামেলাই আসুক... যত বিপদই দেখা দিক, এগিয়ে সে যাবেই! আজ রাতে *ইটা কাইভোপুইস্তো*-র রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেজন্যই। অপেক্ষা করছে বিশেষ একজন মানুষের, যে ওকে রাশায় ঢোকার পথ করে দেবে।

সোনিয়া মাযোলার ব্যাপারেও বিস্তারিত জানিয়েছে রানা—মেয়েটাকে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই, বরং ওকে দু'জনের মাঝখানে রিলে হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। তাতে বিশেষ আপত্তি নেই কুয়াশার। রানা যে এসব বিষয়ে ওর চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। যোগাযোগের নিয়মও ঠিক করে দিয়েছে ও—সরাসরি প্যারিসে সোনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না কুয়াশা। ওর কন্ট্যাক্ট হবে

টাভাস্টিয়ান হোটেলের ম্যানেজার—পুরনো, বিশ্বস্ত লোক সে। সোনিয়ার সঙ্গে এই ম্যানেজারই যোগাযোগ রক্ষা করবে। কুয়াশাকে শুধু মেসেজ পৌঁছাতে হবে তার কাছে। একইভাবে রানাও নিজের মেসেজ পৌঁছাবে সোনিয়া পর্যন্ত। সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান হবে শুধুমাত্র সোনিয়া এবং ম্যানেজারের মধ্যে।

গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল কুয়াশার। মাথা ঘোরাতে একটা লক্কড়মার্কা সেডান দেখতে পেল। কাছাকাছি এসে একবার হেডলাইট জ্বালল-নেভাল গাড়িটা, রাস্তার উল্টোপাশে পৌঁছে থামল ক্ষণিকের জন্য। চালকের আসনে লেদারের জ্যাকেট পরা এক লোক বসে আছে, গলায় লাল মাফলার। এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল কুয়াশা। কোনও কথা বলল না কেউ কারও সঙ্গে।

আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা। রাশার পথে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

ফিনল্যাণ্ড সীমান্তে, লেক *সাইমা*-র উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ছোট্ট শহর ভাইনিকালা। পানি পাড়ি দিলে প্রতিবেশী দেশ রাশা। হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে টহল দিয়ে বেড়ায় রাশান সীমান্তরক্ষীরা; তবে সে-টহল যত না অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য, তার চেয়ে বেশি স্রেফ রুটিন রক্ষা করবার তাগিদে। এ-অবস্থা চলছে সেই সোভিয়েত আমল থেকেই। আসলে... বলকান অঞ্চলের প্রলম্বিত শীতকালে, কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এ-রুটে চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন। একেবারে অনন্যোপায় না হলে কেউ এমন জায়গা দিয়ে রাশায় ঢুকতে বা বেরুতে চায় না। এ তো গেল শীতকাল, কিন্তু গ্রীষ্মে আবার ভিন্ন চিত্র। গরমের সময়টাতে তালিন আর রিগা, সেইসঙ্গে লেনিনগ্রাদ থেকে এত বেশি ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যু করা হয়

যে, পুরো এলাকায় লেগে থাকে বিদেশি লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়। এতসব মানুষকে মনিটর করা দুঃসাধ্য। ক'জন বৈধ, আর ক'জন অবৈধভাবে ঢুকছে দেশে; তার হদিস রাখা সম্ভব হয় না কিছুতেই। সে-চেষ্টাও করে না কেউ। তাই নর্থ-ওয়েস্টের গ্যারিসনগুলো সবসময়েই রাশান মিলিটারির অলস, বিরক্ত সৈনিকদের আখড়া। শাস্তিমূলক বদলি ছাড়া আর কাউকে পাঠানো হয় না ওখানে। রাশায় ঢোকার জন্য ভাইনিকালা একটা বড় চেকপয়েন্ট, তারপরেও সেখানকার লোকজন একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর... এমনকী পাহারাদার কুকুরগুলোও।

তবে ফিনিশদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। উনিশশো উনচল্লিশে তাদের দেশে সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা ভোলেনি ওরা। এই এলাকার জলাশয় আর বনাঞ্চলের ব্যাপারে নিখুঁত জ্ঞান আছে তাদের, সে-আমলে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ঠেকিয়ে দিয়েছিল বিদেশি হানাদারদেরকে; আজও সে-ধরনের হামলা মোকাবেলার মত প্রস্তুতি রেখেছে। ফিনিশ এসকর্টের গাড়িতে একের পর এক সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যূহ পেরুতে পেরুতে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল কুয়াশা—ভাইনিকালাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে ফিনিশরা।

সারা রাস্তায় সঙ্গীর সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলেনি ও, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল লোকটা মুখ খোলাতে।

'এটা আপনার ওয়ান-ওয়ে ট্রিপ, মিস্টার। শুধু ঢুকতে পারবেন রাশায়, এ-পথে বেরিয়ে আসতে পারবেন না।'

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল কুয়াশা। 'বিশেষ কোনও কারণ আছে তার পিছনে?'

'কী ধরনের গোলমাল পাকাবেন ওখানে, তার কিছুই জানি না। ঢুকতে দিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?'

তর্ক করল না কুয়াশা। লোকটা সরকারি কর্মচারী, গোপনে ফিনিশ আণ্ডারগ্রাউণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কাভার মেইনটেনের জন্য ঝামেলা এড়িয়ে চলতে হয় তাকে। পুরনো এক উপকারের প্রতিদান হিসেবে চেকপয়েন্ট পার করে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে ওকে, তার মানে এই নয় যে, বিপদ দেখা দিলেও পাশে থাকবে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল কুয়াশা। 'রিল্যাক্স, নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল সেডান। ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল বন্ধুর পথ ধরে। মাইলখানেক গেল, তারপর থেমে দাঁড়াল। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ফিনিশ এসকর্ট বলল, 'এ-পর্যন্তই আমার দৌড়।' হাত তুলে তুষার আর ঝরাপাতায় ছাওয়া সামনের পথ দেখাল। 'নাক বরাবর হাঁটতে থাকুন। জঙ্গল পেরোলে আরেকটা রাস্তা পাবেন—রাশান হাইওয়ে। গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ওটা আপনাকে দক্ষিণে ভাইবর্গ হয়ে যেলেনোগরস্ক পর্যন্ত নিয়ে যাবে।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। এ-ধরনের কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট চায়নি ও। 'আমি তো ওর জন্য টাকা দিইনি।'

'ব্যাপারটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই করা,' হাসল ফিনিশ এসকর্ট। 'বর্ডারের কাছে আপনি ধরা পড়ে গেলে সমস্যা। ইন্টারোগেশনে আপনার সাহায্যকারীদের নাম-ধাম বেরিয়ে যেতে পারে। আমার বসেরা চাইছেন না তেমন কোনও ঝুঁকি নিতে।'

'ঝুঁকি এতেও কম নেই। যে-লোক গাড়ি নিয়ে এসেছে, সে যদি ধরিয়ে দেয় আমাকে?'

'সে-ভয় নেই। পুরনো বন্ধু আমাদের, বর্ডারের ওপারে স্মাগলিঙের সবকিছু ও-ই দেখে।'

'ওকে আমি চিনব কী করে?'

'গাড়ি দেখলেই কাছে গিয়ে সময় জিজ্ঞেস করবেন... রাশান ভাষায়। জবাব না দিয়ে সে যদি ঘড়িতে চাবি দিতে শুরু করে, তা হলে বুঝবেন ও-ই আপনার ড্রাইভার।'

'এ-সবের দরকার ছিল না। রাশায় ঢোকার পর আমি একা থাকলেই সবচেয়ে ভাল হতো... আমাদের দু'পক্ষের জন্যই।'

'এটাও ভাল হয়েছে। আমাদের লোক আপনাকে খুব সহজে রাশান চেকপোস্টগুলো পার করে নিয়ে যেতে পারবে। একা থাকলে আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হতো না। এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ওকে তো আপনার অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে দিইনি। যখন প্রয়োজন ফুরোবে, তখন নাহয় ছেড়ে দেবেন!'

কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

দূর থেকেই দেখা গেল গাড়িটা—পুরনো মডেলের একটা *পোবেদা*... রাস্তার পাশে [illegible] মাঝে পার্ক করে রাখা হয়েছে, চারপাশে সাদা তুষার। ভোর হতে বেশি দেরি নেই; খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা, তারপরেই সূর্যের প্রখর কিরণ আছড়ে পড়বে কুয়াশার আবরণে মোড়া প্রকৃতির উপর। রাতভর বিরাজ থাকা হিম আবহাওয়া বদলে দিয়ে আসবে আরামদায়ক উষ্ণতা। কিন্তু সে-সব নিয়ে উচ্ছ্বাস নেই কুয়াশার মাঝে। গ্লাভ-পরা হাতে নিজের পিস্তল বের করে নিয়েছে ও, হাতটা শরীরের আড়ালে লুকিয়ে লঘু পায়ে চলল পোবেদার দিকে। সরাসরি এগোল না, একটু ঘুরপথে চলে গেল গাড়ির পিছনে, সেখান থেকে সন্তর্পণে অগ্রসর হলো বাহনটার দিকে।

ফারের কোট আর ভারী মাফলার জড়িয়ে মাঝবয়েসী একজন মানুষ বসে আছে ড্রাইভিং সিটে। ক্ষণে ক্ষণে মুখের কাছে উঠে

আসা সিগারেটের আগুনে আলোকিত হয়ে উঠছে চেহারা। সাইডভিউ মিররে সে-চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল কুয়াশা। এ-লোককে ও চেনে। ক্যাপ্টেন গ্রিগোরি সিমকিন—ভাইবর্গে রাশান পুলিশ স্টেশনের প্রধান! কুয়াশাকে গ্রেফতারের জন্য এককালে আদাজল খেয়ে লেগেছিল লোকটা, হাবভাবে মনে হয়েছিল তার মত নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ অফিসার আর কেউ হতে পারে না। আর এখন বুঝি এ-ই ফিনিশ অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্মাগলিং করছে? বিশ্বাস করা কঠিন, টাকার জন্য মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হলো ও। লম্বা লম্বা কদম ফেলে চলে গেল গাড়ির পাশে।

অন্যমনস্ক ছিল সিমকিন, কুয়াশা একেবারে পাশে না আসা পর্যন্ত টেরই পেল না কিছু। হঠাৎ জানালার পাশে একটা অবয়ব দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা টর্চলাইট তুলে আলো ফেলল বাইরে। আগন্তুকের চেহারা দেখল না, তার বদলে দেখল পিস্তলের নিষ্কম্প নল... সোজা তার মাথার দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। স্থির হয়ে গেল সে।

'গুড মর্নিং, কমরেড সিমকিন! কী সৌভাগ্য, আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের!'

কণ্ঠটা পরিচিত মনে হলো সিমকিনের, কিন্তু মনে করতে পারল না কোথায় শুনেছে। কয়েক মুহূর্ত পর কুয়াশা একটু ঝুঁকে মুখোমুখি হলো তার, চেহারা দেখে চমকে উঠল সে।

'মাই গড! কুয়াশা... আপনি?'

হাসল কুয়াশা। 'যদি ভুল করে না থাকি, গাড়ি নিয়ে আমার জন্যই অপেক্ষা করছ তুমি। ক'টা বাজে, জানতে পারি?'

'ক্... কী?'

'সময় জানতে চাইছি। বাই দ্য ওয়ে, যদি সত্যিই টাইম বলো,

তোমাকে খুন করা ছাড়া গতি থাকবে না আমার।'

সচকিত হয়ে উঠল সিমকিন। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে দম দিতে শুরু করল।

'গুড,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কুয়াশা, তবে পিস্তল সরাল না। 'অত আপসেট হবার কিছু নেই। আমরা দু'জনেই এখন একই পথের পথিক। কিছু মনে না করলে... গাড়ির চাবিটা আমাকে দেবে?'

'ক... কেন?' তোতলাচ্ছে সিমকিন।

'ইনশিয়োরেন্স। গাড়িতে ঢোকার পর ওটা আবার ফেরত পাবে তুমি। হয়েছে কী, তুমি এখন নার্ভাস হয়ে আছ। আর নার্ভাস লোক উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আমি চাই না তুমি আমাকে ফেলে চলে যাও। চাবি দাও, প্লিজ।'

মুখের কয়েক ইঞ্চি তফাতে স্থির হয়ে থাকা পিস্তলের ব্যারেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সিমকিন। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে ইগনিশন থেকে খুলে আনল চাবির গোছা, তুলে দিল কুয়াশার হাতে।

'ধন্যবাদ,' বলল কুয়াশা। পিস্তল ঢুকিয়ে ফেলল কোটের আড়ালে। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে প্যাসেঞ্জার সাইডে চলে এল, দরজা খুলে উঠে বসল সিমকিনের পাশে। 'সো নাইস অভ ইউ, ক্যাপ্টেন।' চাবির গোছা ফিরিয়ে দিল ও। 'এসো, বন্ধু হই আমরা। পুরনো শত্রুতার কথা ভুলে যাই। কেউ কারও দুর্বলতার সুযোগ নেব না, তাতে দু'জনেরই ক্ষতি।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে সিমকিন। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'যদি জানতাম, তোমাকে তুলে নেবার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে...'

'কী করতে? অ্যারেস্ট করতে আমাকে?' বিদ্রূপের সুরে বলল কুয়াশা। 'তাতে তোমার ফিনিশ বন্ধুরা কেমন খেপে যেত, জানো

না? ওদের সঙ্গে পার্টনারশিপের ইতি ঘটত তোমার, বাড়তি ইনকাম বন্ধ হয়ে যেত চিরতরে, খেতে হত জেলের ভাত।'

'হুম, হয়তো ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল সিমকিন। 'আমাকে বলা হয়েছে—যাকে রিসিভ করব, সে ফিনিশদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেকদিন আগে নাকি ওদের এক মাফিয়া চিফের মেয়ে কিডনি ফেইলিওরের কারণে মরতে বসেছিল। কোথাও ওই মেয়ের উপযোগী কিডনি পাওয়া যাচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত তুমি নিজের কিডনি দান করে দিয়েছিলে।'

'পুরনো ইতিহাস,' উদাস গলায় বলল কুয়াশা। 'ওসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে তোমার।'

'না ঘুমিয়ে পরছি না। মাফিয়া জাতীয় ক্রিমিনালদের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক তোমার। ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নাও যখন-তখন। অথচ নিজের কিডনি একজন মাফিয়া-সন্তানকে দিয়ে দিলে?'

'বাপ মাফিয়া হতে পারে, মেয়ে তো নয়! যাক গে, কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালু করো। অনেকদূর যেতে হবে আমাদেরকে।'

ইগনিশন-কী ঘোরাল সিমকিন। 'কোথায় যাবে?'

'লেনিনগ্রাদ,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। একাকী কাজ করবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। সিমকিনের মত একজন বড় পুলিশ অফিসার সঙ্গে থাকলে সুবিধে পাবে অনেক। লোকটা বেঈমানীও করতে পারবে না। তার গোপন স্মাগলিঙের খবর জেনে গেছে কুয়াশা, বেঈমানী করতে গেলে সেটা ফাঁস হয়ে যাবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও কুয়াশার অনুগত থাকতে হবে তাকে।

'কিন্তু তোমাকে শুধু যেলেনোগরস্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা আমার!' প্রতিবাদ করল সিমকিন।

'এত খেপছ কেন? নাহয় বাড়তি কয়েক ঘণ্টা ড্রাইভ করতে

হবে তোমাকে। খুব বেশি কিছু তো নয়।'

'কিন্তু সকালে আমাকে ভাইবর্গে থাকতে হবে! একটা মিটিং আছে।'

'ফোন করে অন্য কাউকে যেতে বলো। বিশ্বাসযোগ্য একটা অজুহাত খাড়া করতে খুব অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই? চাইলে আমিও সাহায্য করতে পারি।'

অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে উঠল সিমকিনের চেহারায়। বেকায়দা পরিস্থিতির মুখে পড়ে গেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে কুয়াশা। উপায়ান্তর না দেখে গাল দিল ভাগ্যকে নিচু কণ্ঠে।

'পাগলামি করছ তুমি,' বলল সে। 'কেউ কিছু টের পেলে আমরা দু'জনেই শেষ!'

'এখুনি সেটা ঘটছে না। লেনিনগ্রাদে কাজ আছে আমাদের। চলো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে পোবেদাকে আগে বাড়াল সিমকিন।

ওরা যখন কিরভ ব্রিজ অতিক্রম করল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। শহর এলাকায় ঢুকেছে গাড়ি, তারপরেও দু'পাশে তাকিয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে পেল কুয়াশা—পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা শীতকালীন বাগানগুলো নববধূর সাজে সেজেছে, ফুলে-ফুলে ভরে গেছে গাছগাছালি। ব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণে চওড়া রাস্তা চলে গেছে নেভ্স্কি প্রসপেক্টের দিকে। জানালা দিয়ে লেনিনগ্রাদের মনুমেন্ট দেখতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল ও। লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে নেভা নদীর তীরের বরফে ঢাকা বন্ধ্যাভূমি পরিণত হয়েছে আজকের এই সুসজ্জিত নগরে।

নেভ্স্কি প্রসপেক্ট পেরিয়ে এল পোবেদা, অ্যাডমিরাল্টি বিল্ডিঙের দর্শনীয় অগ্নিশিখাকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গেল নদীর

ধারে। সামনেই জারিস্ট আমলের হৃত গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উইন্টার প্যালেস। সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আলেক্সেই ভারাকিনের কথা ভাবল কুয়াশা—জারিস্ট বংশের শেষ মানুষদের একজন। লেনিনগ্রাদে এখনও কি আছে তার পরিবার? শীঘ্রি এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হবে ওকে।

'আনিচভ ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নাও,' নির্দেশ দিল কুয়াশা। 'পুরনো হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্টে ঢোকো। কোথায় থামবে, সেটা বলে দেব আমি।'

'কী আছে ওখানে?' জানতে চাইল সিমকিন। ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠছে সে।

'জানো না বুঝি? একগাদা অবৈধ বোর্ডিং হাউস আর সস্তা দরের হোটেল। সরকারকে পছন্দ করে না ওখানকার লোকজন, পুরোপুরি আলাদা একটা জগতে বাস করে। গা-ঢাকা দেবার জন্য পুরো লেনিনগ্রাদে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর দুটো নেই।'

'এখানেই লুকাও তুমি সবসময়?'

হাসল কুয়াশা। 'আগে জানা থাকলে খুব সুবিধে হতো তোমার, তাই না? আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারতে সহজে। উঁহুঁ, ধারণাটা ভুল। ওখানকার প্রতিটা বিল্ডিঙে পালাবার জন্য গোপন পথ আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিমকিন। 'ওসব কিছুই ভাবছি না আমি। আমাকে কতক্ষণ আটকে রাখবে তুমি, জানতে পারি?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আগে অবস্থা বুঝে নিই।' কুয়াশা নির্বিকার।

বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল সিমকিন।

সাদোভায়ার ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে পুরনো হাউজিং ডিস্ট্রিক্টে ঢুকল পোবেদা। চারপাশে মান্ধাতা আমলের বিবর্ণ বিল্ডিঙের সারি।

এমনিতে জায়গাটা পরিচ্ছন্ন... দেখে বোঝার উপায় নেই, কী কষ্টের জীবন যাপন করছে এখানকার মানুষেরা। একেকটা ফ্ল্যাটে দুই থেকে তিনটা পরিবার বাস করে, কামরাগুলোতে থাকে পাঁচ-ছ'জন করে মানুষ। আধুনিক নাগরিক সুবিধা বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই এখানে কোথাও। এ-কারণে চাপা ক্ষোভে ফুঁসছে অধিবাসীরা, মাঝে-মাঝে গণবিক্ষোভের মাধ্যমে তার বিস্ফোরণও ঘটে।

'সামনের বাঁকের পাশে গাড়ি রাখো,' একটু পর বলল কুয়াশা। 'অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। যার কাছে যাচ্ছি, সে যদি না থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসব। আর যদি দেখা পেয়েই যাই, হয়তো বা ঘণ্টাখানেক থাকতে হতে পারে আমাকে।'

রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা কতগুলো সাইকেলের পিছনে গাড়ি থামাল সিমকিন। নামার আগে কুয়াশা তাকে বলল, 'একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। দুটো অপশন আছে তোমার হাতে—এখানকার পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারো, অথবা সাহায্য করতে পারো আমাকে। প্রথমটা যদি করো, তা হলে তোমার গোমর ফাঁস করে দেব আমি। নিজের পজিশনের সুযোগ নিয়ে কী ধরনের অপকর্ম করে বেড়াচ্ছ, তা জানিয়ে দেব সবাইকে। শাস্তি একা আমার হবে না, তোমারও হবে তাতে। আর যদি দু'নম্বর পন্থা অবলম্বন করো... কাজশেষে বড় অঙ্কের একথোক টাকা দেব আমি, তোমার উপরি কামাই-ও চলতে থাকবে আগের মত। এখন নিজেই ভেবে দেখো, কোন্টা তোমার জন্য লাভজনক।'

মুখ বাঁকাল সিমকিন। 'কী করব, তা তুমি খুব ভাল করেই জানো। কোনও বিকল্প নেই আমার হাতে... এখানেই অপেক্ষা করছি আমি।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। দরজা খুলে নেমে গেল গাড়ি থেকে। মোড় পেরিয়ে একটা চারতলা বিল্ডিং, সেটার সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল। সবমিলিয়ে বিশটা ফ্ল্যাট আছে এ-বিল্ডিঙে, অন্তত দু'শো লোক বাস করে। একমাত্র নাতালিয়া সিমোনোভার ফ্ল্যাটটা তার ব্যতিক্রম। একাকী থাকে ও, কোনও রুমমেট নেই... মানে, শেষ খবর যদ্দূর জানে আর কী। অনেকদিন কোনও যোগাযোগ হয়নি ওদের মধ্যে।

তিনতলায় উঠতে উঠতে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল কুয়াশার—মনে পড়ল কীভাবে দু'জনের পরিচয় হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে মহা-বিপদে পড়ে গিয়েছিল নাতালিয়া... এমনই বিপদ, যার কারণে মৃত্যুদণ্ড হতে যাচ্ছিল ওর। রাশান ইন্টেলিজেন্সে কাজ করত মেয়েটা, গণিতবিদ হিসেবে। এমনিতে অত্যন্ত মেধাবী, মস্কো ইউনিভার্সিটি-র ডক্টোরাল গ্র্যাজুয়েট, লেনিন ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া। ফিল্ডে ওর মত দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার খুব কমই আছে। এ-কারণে লেনিনগ্রাদের ইন্টেলিজেন্স অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছিল ওকে। হঠাৎ করে সেখান থেকে বেশ কিছু ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট চুরি যাওয়ায় ফেঁসে যায় বেচারি। অ্যারেস্ট করা হয় ওকে, শুরু হয় বিচার। আসল অপরাধী ছিল অন্য আরেকজন, কিন্তু পুরো ঘটনাটা সে এমনভাবে ঘটায়, যাতে নাতালিয়ার উপরেই সমস্ত সন্দেহের তীর বিদ্ধ হয়। এমন সব মিথ্যে প্রমাণ ছড়িয়ে রেখেছিল, যার কারণে সরকারি তথ্য-পাচারের অভিযোগে চরম শাস্তি হতে যাচ্ছিল মেয়েটির। কেউ ছিল না ওকে সাহায্য করবার।

এ-পরিস্থিতিতে ব্যাপারটার মধ্যে নাক গলায় কুয়াশা... এবং সেটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। রাশান ইন্টেলিজেন্সের এক কন্ট্যাক্টের মুখে নাতালিয়ার কথা শোনার পর খারাপ লেগেছিল

ওর—নিরপরাধ একটা মেয়ে অকারণে মারা যাবে, সেটা মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। তাই নিজের স্বভাবজাত কৌশলে সমাধান করেছিল রহস্যটা, আড়াল থেকে বের করে এনেছিল সত্যিকার অপরাধীকে, মুক্ত করেছিল নাতালিয়াকে। কাজটা করতে গিয়ে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিল ও, তারপরেও ছাড়া পাবার পর কীভাবে যেন ওর খোঁজ বের করে ফেলে মেয়েটা। মুখোমুখি হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। সেই থেকে চমৎকার এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিরাজ করছে ওদের মধ্যে। সম্পর্কটা হয়তো আরও গভীর হতে পারত, কিন্তু সচেতনভাবে সেটাকে এড়িয়ে চলেছে কুয়াশা। ওর ফেরারী জীবনের সঙ্গে কোনও মেয়েকে জড়ানো চলে না, তেমন কোনও ইচ্ছেও নেই ওর। তা ছাড়া নাতালিয়ার নিরাপত্তার জন্যই দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন, শত্রুরা কুয়াশার নাগাল পাবার জন্য যেন ওকে ব্যবহার করতে না পারে। ইন্টেলিজেন্সের চাকরি এখনও করছে মেয়েটা, রাশান ইন্টেলিজেন্সের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ওর রয়েছে অবাধ গতিবিধি। সে-কারণেই এতদিন পর আবার ওর কাছে চলেছে কুয়াশা।

নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল ও—একটা বাজতে দশ মিনিট। দুপুরের এ-সময়টাতে ঘরেই থাকার কথা মেয়েটার। রাতের শিফটে ডিউটি করে, সকাল আটটায় ছুটি। এরপর বাসায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়। এখনও কি সে-রুটিন আছে? একটু দ্বিধায় ভুগল কুয়াশা কলিংবেল চাপার আগে। বোতামটাতে চাপ দেয়া মানেই গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে নাতালিয়াকে জড়িয়ে ফেলা। কিন্তু এ-ছাড়া উপায়ও নেই আর। লেনিনগ্রাদে বিশেষ যে-মানুষটির নাগাল পেতে চাইছে ও, তার কাছে সরাসরি পৌঁছুনো সম্ভব নয়। কী আর করা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে

দরজার পাশে হাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশা, কলিংবেলের বোতাম চাপল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নাতালিয়াকে সবকিছু খুলে বলবে। এরপর ও-ই ঠিক করুক, কুয়াশাকে সাহায্য করবে কি করবে না।

দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ হলো—হিল পরে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে কেউ। কয়েক মুহূর্ত পর নামানো হলো ছিটকিনি, আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করল পাল্লা... পুরোপুরি নয়, অর্ধেক। দেখা গেল নাতালিয়ার সুঠাম অবয়ব। ওকে দেখেই খটকা লেগে গেল কুয়াশার—উজ্জ্বল রঙের একটা পোশাক পরে আছে মেয়েটা... সামার ড্রেস, ঘরের পোশাক বলা যাবে না মোটেই। মাথাভরা বাদামি চুলের গোছা এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে কাঁধের উপর। চোখের তারায় শঙ্কা, সুন্দর মুখশ্রী আড়ষ্ট হয়ে আছে। এতদিন পর ওকে দেখে যতটা অবাক হওয়া উচিত, তার ছিটেফোঁটাও হলো না।

'কুয়াশা!' বলল নাতালিয়া। 'কী সৌভাগ্য আমার!'

গলার স্বরটা স্বাভাবিক নয়। সতর্ক হয়ে উঠল কুয়াশা, নাতালিয়া কি সতর্ক করতে চাইছে ওকে? ওর চোখে চোখ রাখল, পরমুহূর্তে নিশ্চিত হলো—ঠিকই অনুমান করেছে। একা নয় মেয়েটা। ভিতরে আরও কেউ আছে... অপেক্ষা করছে ওর-ই জন্য!

'সৌভাগ্য আসলে আমার, নাতালিয়া,' কুয়াশা বলল, মৃদু মাথা ঝোঁকাল পাল্টা সঙ্কেত দেবার জন্য। আড়চোখে তাকাল দরজার কবজা আর চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে। জ্যাকেটের একাংশ আর ধূসর প্যান্ট দেখতে পাচ্ছে; পাল্লার পিছনে লুকিয়ে আছে শত্রু। 'কতদিন পর দেখা, বলো তো?'

'কী জানি, হিসেব রাখিনি আমি।' বলতে বলতে পিছিয়ে গেল নাতালিয়া।

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে।' পা বাড়াল কুয়াশা। ডোরওয়েতে পৌঁছেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আধখোলা দরজার উপর। ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড বেগে কবজার উপর ঘুরল পাল্লা, থ্যাঁচ করে আছড়ে পড়ল আত্মগোপনকারীর গায়ে। ককিয়ে উঠল লোকটা, দরজার পাল্লা আর দেয়ালের মাঝখানে পিষ্ট হয়েছে সে।

লাফ দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল কুয়াশা। দরজার পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রতিপক্ষ, পাল্লাটা একটু টেনে আবার তাকে ছ্যাঁচা দিল ও। এবার রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। কাত হয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে চলে গেল মেঝেতে। একটা পিস্তল দেখা গেল হাতে, লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিল কুয়াশা। নিজের পিস্তল এরই মধ্যে চলে এসেছে মুঠোয়, সেটাকে উল্টো করে ধরে প্রচণ্ড এক ঘা বসাল লোকটার মাথার পিছনে। হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

শান্ত ভঙ্গিতে দরজা বন্ধ করে দিল কুয়াশা। তাকাল নাতালিয়ার দিকে। 'তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'থ্যাঙ্ক গড, আমার ইশারা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

'না বোঝার কিছু ছিল না,' হাসল কুয়াশা। 'শীতকাল চলছে এখন... অথচ তোমার গায়ে গ্রীষ্মের পোশাক!'

'বেশিরভাগ পুরুষ কিন্তু বুঝতে পারত না সেটা। ভাগ্য ভাল যে তুমি পেরেছ।'

'তা হলে অন্য কোনও বুদ্ধি খাটাওনি কেন?'

'সুযোগ ছিল না। কাপড় বদলানো ছাড়া আর কোনও কিছু করতে দেয়নি ব্যাটা আমাকে।'

'হুম! কে ও? কিছু ধারণা করতে পারো?'

'আর যা-ই হোক, রাশান নয়। খুব সম্ভবত ইংরেজ। ওর রাশান উচ্চারণে ব্রিটিশ টান লক্ষ করেছি আমি।'

'ঘরে ঢুকল কীভাবে?'

'ভুয়া একটা আই.ডি. কার্ড দেখিয়ে। অভিনয় করছিল, যেন মস্কোর হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে। চ্যালেঞ্জ করতেই পিস্তল বের করল। তখন আর কিছু করবার ছিল না আমার। অনেকক্ষণ অনুরোধ করবার পর শুধু ঘরের জামাটা বদলে নিতে দিয়েছে... তাও আবার ওর চোখের সামনে!'

'কী জন্যে এসেছে, তা বলেনি?'

'তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। বলেছি কিছু জানি না আমি, কিন্তু বিশ্বাস করেনি আমার কথা। তার খানিক পর তো তুমিই হাজির হলে।'

পিছনে নড়াচড়ার শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল কুয়াশা। জ্ঞান ফিরে এসেছে ইংরেজের। ওঠার চেষ্টা করছে না দেখে অবাক হলো, পরক্ষণেই ধরতে পারল রহস্যটা। মুখ নড়ছে ব্যাটার। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, দু'হাতে গলা চেপে ধরে চেষ্টা করল ঠেকাতে... কিন্তু লাভ হলো না। লোকটার কষা বেয়ে নেমে এল সাদাটে ফেনা। ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'হোয়াট দ্য...' বিস্মিত গলায় বলল নাতালিয়া। 'কী ঘটল?'

পরাজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। বলল, 'সায়ানাইড পিল—মুখের ভিতরে লুকানো ছিল। আত্মহত্যা করেছে ব্যাটা।'

পাঁচ

লাশের শরীর সার্চ করল কুয়াশা আর নাতালিয়া. কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। টাকাভর্তি ওয়ালেট আছে, ভুয়া আই.ডি. আছে, পিস্তলের বাড়তি অ্যামিউনিশনও আছে—কিন্তু এসব থেকে তার আসল পরিচয় বের করা সম্ভব নয়। একটা মোবাইল ফোনও বেরিয়েছে পকেট থেকে, তবে সেটার মেমোরি সম্পূর্ণ খালি। ফোনবুক বা কললিস্টে একটা নাম্বারও নেই। বিরক্ত হয়ে মেঝে থেকে উঠে পড়ল নাতালিয়া. মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল খেদোক্তি।

'কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি আমরা,' চিন্তিত গলায় বলল কুয়াশা। 'একেবারে কিছুই জানতে পারব না, তা কী করে হয়?' নাতালিয়ার দিকে মুখ ফেরাল। 'কী কথা হয়েছে ওর সঙ্গে, তা প্রথম থেকে খুলে বলো আমাকে।'

'বলতে গেলে কিছুই না,' নাতালিয়া জানাল। 'গল্প করবার মুডে ছিল না ও।'

'তারপরেও সব শুনতে চাই আমি। ওর কথা থেকে তুমি হয়তো কিছু আঁচ করতে পারোনি, কিন্তু আমি পারব।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নীরব রইল নাতালিয়া। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'কী লুকাচ্ছ তুমি আমার কাছে, কুয়াশা? সত্যি করে বলো তো, কেন এই লোক খুঁজছিল তোমাকে?'

'ক'দিন আগে আমার নামে নতুন একটা হুলিয়া জারি হয়েছে,

জানো নিশ্চয়ই?' বলল কুয়াশা। 'অনেকেই খুঁজছে আমাকে।'

'হেঁয়ালি করছ তুমি!' অভিযোগের সুরে বলল নাতালিয়া। 'এ-লোক আইনের কেউ নয়... তার ওপর বিদেশি। মুখে যেভাবে **সায়ানাইড পিল লুকিয়ে রেখেছিল**, তাতে তো মনে হয় চরমপন্থী, কিংবা ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সঙ্গে জড়িত! পুলিশ-টুলিশ ছাড়িয়ে আজকাল কি ওদের সঙ্গেও শত্রুতা বাধিয়েছ নাকি?'

'আমি কিছুই করিনি, যা করবার ওরাই করছে। ড. ইভানোভিচকে খুন করেছে, আমাকে দিয়েছে ফাঁসিয়ে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য লড়ছি আমি।'

'বলতে চাইছ, আমার দেশের একজন বিজ্ঞানীকে খুন করবার পিছনে ব্রিটিশদের হাত আছে?'

'উঁহুঁ। এই খুনিদের নির্দিষ্ট কোনও দেশ নেই, দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে রিক্রুট করা হয়েছে এদেরকে। খুবই ভয়ানক এক সংগঠন... পরে সব খুলে বলব তোমাকে। আগে এই লোকটার ব্যাপারে শিয়োর হয়ে নেয়া দরকার।'

'কী শিয়োর হবে?'

'অস্পষ্ট ব্যাপারগুলো...'

'কোনোটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে নাকি তোমার কাছে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল নাতালিয়া।

'অবশ্যই!' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কয়েকটা বিষয় তো এমনিতেই পরিষ্কার—আমার জন্য এসেছিল ও, কিন্তু ব্যর্থ হলে জ্যান্ত ধরা পড়তে চায়নি। নিশ্চয়ই এমন কিছু জানত, যা আমাকে জানানো চলে না। ব্যাটার কোনও সঙ্গীও নেই আশপাশে, থাকলে এখনও আমরা বেঁচে থাকতাম না।'

'কিন্তু তুমি যে আমার কাছে আসবে, সেটা জেনেছে কীভাবে? আমি নিজেই তো জানতাম না!'

'ওটা সম্ভবত অনুমান... সেজন্যেই মাত্র একজনকে পাঠানো হয়েছে এখানে।'

'অনুমান!'

'রাশান ইন্টেলিজেন্সের ফাইলে নিশ্চয়ই এ-দেশে আমার সমস্ত কন্ট্যাক্টের রেকর্ড আছে... সেটাই ফলো করছে ওরা। যাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি, বিশেষ করে লেনিনগ্রাদে, তাদের পিছনে লোক লাগানো হয়েছে।'

'লেনিনগ্রাদ কেন?'

'কারণ এখানেই আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি। সে-কাজে যারা আমাকে সাহায্য করতে পারে, তাদের সবাই এখন আমার শত্রুদের টার্গেট।'

'আমি ছাড়া আর ক'জন আছে অমন?'

'খুব বেশি না, দু-তিনজন। লেনিনগ্রাদ ভার্সিটির একজন প্রফেসর আছেন, আরেকজন আছে দানভ-এ... জনৈক পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিস্ট। আর হ্যাঁ, লোকাল ক্রিমিনালদের মধ্যেও একজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'সতর্ক করে দেবে ওদেরকে?'

'দরকার নেই। যত খুশি লোক লাগাক, ওদের কারও কাছেই আমি যাচ্ছি না। তবে এর বাইরে আরেকজনকে চিনি আমি, তার সঙ্গে দেখা করা জরুরি। সেজন্যেই আমাদের এই ইংরেজ বন্ধুর ব্যাপারে শিয়োর হওয়া দরকার। কতখানি জানে ওরা... যার সঙ্গে দেখা করব বলে ভাবছি, তার পিছনেও লোক লাগিয়েছে কি না...'

'সম্ভাবনা কতটুকু?'

'নির্ভর করছে কতখানি রিসার্চ করেছে ওরা, তার ওপর। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে গত এক যুগ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি আমার। ব্যাপারটা সিরিয়াস, নাতালিয়া। ভাল করে ভাবো, কী বলেছিল

লোকটা তোমাকে?'

'বললাম তো, কিছুই না। তবে হ্যাঁ, একবার ফোন এসেছিল ওর মোবাইলে। অন্যপাশের লোকটার সঙ্গে নদীর ধার নিয়ে কথা বলছিল... **মাছি মারা ছাড়া** নাকি আর কিছু করবার নেই ওখানে। কথা শেষ করেই কললিস্ট থেকে নাম্বারটা মুছে দিতে দেখেছি ওকে।'

'নদীর ধার?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা। একটু পরেই মাথা ঝাঁকাল। 'অভ কোর্স! *দ্য হার্মিটেজ! ম্যালাচিট হল!* নদীর ধারে, হ্যাঁ... ওখানকার এক মহিলাকে চিনি আমি। ব্যাটারা দেখি কিছুই মিস করেনি. আমি নিজেও তো ভুলে গিয়েছিলাম ওখানকার কথা!'

'কোন মহিলা সেটা?' গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল নাতালিয়া। **'তোমার বান্ধবী?'**

'হ্যাঁ... সিনিয়র বান্ধবী,' হাসল কুয়াশা। 'বয়স সত্তরের কাছাকাছি, হার্মিটেজ মিউজিয়ামের অ্যাসিসটেন্ট কিউরেটর। এককালে প্রায়ই চা খেতে যেতাম তাঁর ওখানে। ইতিহাস নিয়ে জ্ঞানগর্ভ তর্ক-বিতর্ক চলত আমাদের। একেবারে সাদাসিধে মানুষ, ভাবতেও পারিনি আমার ফাইলে বেচারির নাম উঠে যাবে।'

'এতেই অবাক হচ্ছ? ওঁর ছেলেমেয়ে আর নাতিপুতির নামও উঠে আছে কি না দেখো গিয়ে। এসব ব্যাপারে আমাদের ইন্টেলিজেন্স অত্যন্ত সিরিয়াস।'

'এনিওয়ে,' হাত নাড়ল কুয়াশা, 'আর কী কথা হয়েছে ওদের মধ্যে?'

'ওটুকুই।' একটু ভাবল নাতালিয়া। 'ও হ্যাঁ... আমি যখন কাপড় বদলাচ্ছিলাম, ব্যাটা মশকরা করছিল আমার সঙ্গে।'

'কী ধরনের মশকরা?'

'বাজে কিছু না। বলছিল—**কিউরেটর,** অ্যাকাডেমিকস্ আর

লাইব্রেরিয়ানদের তুলনায় গণিতবিদের শরীর যে অনেক সুন্দর হবে, তা ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমরা *ফিগার* নিয়ে গবেষণা করি কিনা...'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল কুয়াশার। 'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'তারমানে ভদ্রলোকের খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা!'

'কার কথা বলছ?' বিস্মিত হলো নাতালিয়া।

'ঠাট্টা করতে গিয়ে আসল খবর ফাঁস করে দিয়েছে লোকটা।' ব্যাখ্যা করল কুয়াশা, 'কিউরেটর মানে ওই বৃদ্ধা মহিলা, অ্যাকাডেমিকস্ হলো আমার প্রফেসর বন্ধু, আর লাইব্রেরিয়ান হচ্ছেন সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরির আরেক বৃদ্ধ... তাঁর কাছেই যেতে চাইছিলাম আমি।'

'কে এই বৃদ্ধ?'

'মিউজিয়ামের ওই বৃদ্ধার মত আরেক জ্ঞানতাপস। বই সংগ্রহের জন্য লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতাম আমি, সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক দুনিয়ার অসংখ্য ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

'কেন দেখা করতে চাইছ ওঁর সঙ্গে?'

'ভদ্রলোককে চলন্ত বিশ্বকোষ বললে ভুল হয় না। বিশেষ করে রাশা আর লেনিনগ্রাদের বিষয়ে তাঁর মত গভীর জ্ঞান আর কারও মধ্যে নেই। এমন সব তথ্য জানেন, যা বইয়ের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেজন্যেই ভারাকিন নামে একটা প্রভাবশালী পরিবারের খোঁজ নেবার জন্য তাঁর কাছে যাব ভেবেছিলাম।'

'প্রভাবশালী পরিবার? এই লেনিনগ্রাদে?'

'হুঁ।'

মুখ বাঁকাল নাতালিয়া। 'এত সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত দুশ্চিন্তা! তুমি না... অ্যাই, আমি কী কাজ করি, তা ভুলে গেছ?

রাশান ইন্টেলিজেন্সের ডেটাবেজ থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ওই তথ্য তো আমিই তোমাকে বের করে দিতে পারি!'

'উঁহুঁ, ওটা করবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে।' মেঝেতে পড়ে থাকা লাশের দিকে ইশারা করল কুয়াশা। 'এই লোকের সঙ্গী-সাথীরা ছড়িয়ে আছে সবখানে।' পায়চারি শুরু করল ও। 'তা ছাড়া... কম্পিউটারে কিছু পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। যা খুঁজছি, তা বহু বছর আগের কথা। মাঝে অনেক কিছু ঘটেছে, বহুবার সরকার বদলেছে... বদলেছে প্রযুক্তিও। রেকর্ডে কোনোকালে যদি ভারাকিনদের নাম থেকেও থাকে, এখন আর আছে কি না সন্দেহ। আমার তো ধারণা, সরকারি সব ধরনের ডেটাবেজ থেকে নামধাম মুছে ফেলা হয়েছে ওদের।'

'প্রভাবশালী কোনও পরিবারের নাম এত সহজে রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা যায় না, কুয়াশা,' প্রতিবাদ করল নাতালিয়া।

'নাম মোছা না গেলেও সংশ্লিষ্টতার তথ্য মোছা যায়।'

'কীসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা?'

জবাব না দিয়ে মৃত লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা, খুলে ফেলল তার শার্টের বোতাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল উন্মুক্ত বুকটা। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল একটু পরেই—বুকের মাঝখানে একটা বৃত্তাকার উল্কি... ফেনিসের চিহ্ন। নাতালিয়াকে কাছে ডেকে দেখাল ওটা।

'কী এটা?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নাতালিয়া। 'জন্মদাগ?'

মাথা নাড়াল কুয়াশা। নিচু গলায় বলল, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো... জন্মের সময় এ-জিনিস ছিল না আমাদের ইংরেজ বন্ধুর শরীরে। চিহ্নটা অর্জন করে নিতে হয়েছে ওকে।'

'তোমার কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'এখুনি বুঝবে। সবকিছু খুলে বলছি। নিজের নিরাপত্তার জন্যই এ-সব জানা দরকার তোমার। ফেনিস নামে একটা গুপ্তসংঘ...'

আস্তে আস্তে নাতালিয়াকে সবকিছু বলল কুয়াশা—ফেনিসের কথা, এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে... স-অ-ব। ওর কথা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা, সময় নিল এতসব তথ্য হজম করবার জন্য। একটু পর হেঁটে জানালার সামনে গেল, বাইরে দৃষ্টি ফেলে বলল, 'তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, কুয়াশা। বুঝতে পারছি, যা বলেছ তার মধ্যে মিথ্যে নেই একবিন্দুও। সেজন্যেই জানতে চাইছি, এত ভয়ানক একটা সংগঠনের সঙ্গে সংঘাতে নামা কি উচিত হয়েছে তোমার? এরা তোমার পুরনো শত্রুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী...'

'জানি,' বলল কুয়াশা। 'সেজন্যেই রানার সাহায্য নিচ্ছি। এ-ধরনের সংগঠনের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে ওর।'

'ওকে এর ভিতরে টেনে আনাও ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। আর যা-ই হোক, রানা তোমার বন্ধু নয়। স্রেফ পরিস্থিতির চাপে পড়ে হাত মিলিয়েছে তোমার সঙ্গে, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ামাত্র... মানে যদি আদৌ শেষ করতে পারো আর কী... তোমাকে অ্যারেস্ট করবে ও।'

'তা হলে কী করা উচিত ছিল আমার?'

'ব্যাপারটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারতে। গা-ঢাকা দেবার বিষয়ে তুমি একটা প্রতিভা। যদি না চাইতে, তা হলে ফেনিসের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হতো না তোমাকে খুঁজে পাওয়া।'

'ওটা কাপুরুষের কাজ হতো। আমার বাবার মত একজন পরমাত্মীয়কে খুন করেছে ওরা, তারপর আবার সেটার জন্য ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাকেই! না, এ থেকে কিছুতেই পিছু হটা সম্ভব

নয় আমার পক্ষে।'

কুয়াশার কণ্ঠে উত্তেজনা লক্ষ করে উল্টো ঘুরল নাতালিয়া। বলল, 'কিন্তু তোমরা অসহায়! যদ্দূর বুঝতে পারছি, তোমাদেরকে কোণঠাসাও করে ফেলেছে ফেনিস। কী করতে পারবে তোমরা এ-অবস্থায়?'

'ভুল ভাবছ,' কুয়াশা বলল। 'এরই মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছি আমরা। লিস্টের প্রথম নাম—বিয়াঞ্চির ব্যাপারটা ভেরিফাই করা হয়েছে। আর এই যে... এখানে পড়ে থাকা ইংরেজকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। লেনিনগ্রাদে ভারাকিন পরিবারকে যেন ট্রেস করতে না পারি আমরা, সে-চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা। তোমার এখানে একজন এসেছে, আরও দু'জন নজর রাখছে হার্মিটেজ মিউজিয়াম আর শেদ্রিন লাইব্রেরিতে। মরিয়া হয়ে উঠছে ওরা। এটা আমার জন্য সুসংবাদ।'

'নাহয় বের করলে ফেনিসের পিছনে কারা আছে... কিন্তু সে-খবর কার কাছে নিয়ে যাবে তোমরা? কে সাহায্য করবে তোমাদেরকে?'

'সময় এলে সেটা জানা যাবে। দুনিয়ার সবাই তো আর ফেনিসের সঙ্গে জড়িত নয়। এমন লোকজন নিশ্চয়ই আছে, যারা ওদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। আমাদেরকে শুধু তার জন্য তথ্য-প্রমাণ একাট্টা করে দিতে হবে। তুমি সাহায্য করবে আমাদেরকে? আমাকে?'

'ঝামেলায় জড়াতে চাইছ আমাকে?'

'দুঃখিত। এ-ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই আমার হাতে। বৃদ্ধ ওই লাইব্রেরিয়ানের কাছে সরাসরি যেতে পারব না আমি। যখন বন্ধুত্ব ছিল, তখন আমার আসল পরিচয় জানা ছিল না তাঁর। পরে পুলিশের হাতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বেচারাকে

এ-কারণে। আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, আর কোনোদিন যেন দেখা করবার চেষ্টা না করি তাঁর সঙ্গে, আমাকে ধরিয়ে দেবেন সেক্ষেত্রে। তাঁর ইচ্ছেকে সম্মান দেখিয়েছি এতদিন, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তাঁকে বোঝানো দরকার, কেন দেখা করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে... সেজন্য তৃতীয় কাউকে দরকার।'

হালকা হাসি ফুটল নাতালিয়ার ঠোঁটে। সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'থাক, অত কৈফিয়ত দিতে হবে না। অবশ্যই সাহায্য করব আমি তোমাকে। তুমি না থাকলে এতদিনে নামহীন কোনও কবরে পচে যেত আমার লাশ।'

ওর হাত ধরল কুয়াশা। 'আমি চাই না শুধু কৃতজ্ঞতার বশে তুমি সাহায্য করো আমাকে।'

'তা করছি না। যা শুনেছি তোমার মুখে, তাতে ভয় লাগছে আমার। ফেনিসকে ঠেকাতে হবে... আর তা এ-মুহূর্তে তোমাদের পক্ষেই সম্ভব।'

সিমকিনকে নাতালিয়ার পরিচয় জানতে দেয়া যাবে না। তাই ঘর থেকে বেরুনোর আগে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা, নীচে তাকাল লোকটা কী করছে দেখার জন্য। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, গাড়ি থেকে নেমে তাকে পেভমেণ্টের উপর পায়চারি করতে দেখল।

'ও শিয়োর না, কোন্ বিল্ডিঙে ঢুকেছি আমি—এটা, না পাশেরটায়,' বলল কুয়াশা। ঘাড় ফিরিয়ে নাতালিয়ার দিকে তাকাল। 'নীচের সেলারগুলোর মধ্যে কি এখনও কানেকশন আছে?'

'হ্যাঁ।' জবাব এল।

'আমি তা হলে যাই। পাশের আরেকটা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে

ওকে বিভ্রান্ত করে দেব। একঘণ্টার কথা বলে এসেছি, এখন যদি না ফিরি, নার্ভাস হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।'

'আবার আসবে এখানে? কী করতে হবে আমাকে, তার কিছুই তো বলোনি এখনও।'

'আসব তো বটেই। সিমকিনের কাছ থেকে আরও আধঘণ্টা সময় নিয়ে আসি। তারপর তোমাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেব।'

'ওটার কী হবে?' ইশারায় ইংরেজ লোকটার লাশ দেখাল নাতালিয়া। 'এভাবে সামনের কামরায় ফেলে রাখা নিরাপদ নয়।'

'আপাতত থাকুক ওখানে। ফিরে আসার পর ভেবে দেখব লাশটা কোথায় সরানো যায়।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ও নীচের সেলারে। নাতালিয়ার কথাই ঠিক, পুরনো বিল্ডিংগুলোর কিছুই বদলায়নি। প্রতিটা সেলার-ই পাশেরটার সঙ্গে অন্ধকার প্যাসেজওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত। পুরো ব্লকজুড়ে জালের মত বিছিয়ে আছে এসব প্যাসেজ। একের পর এক সেলার পেরুল কুয়াশা, চারটে বিল্ডিং পেরিয়ে উঠে এল মূল সড়কে। ওদিক থেকে ওকে আশা করেনি সিমকিন, পিঠ ফিরিয়ে রেখেছিল, পিছনে গিয়ে কাঁধে টোকা দিল ও।

চমকে উঠে কুয়াশার দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আরে... কোত্থেকে এলে? আমার তো মনে হচ্ছিল সামনের ওই বিল্ডিঙে ঢুকেছ তুমি!' হাত তুলে নাতালিয়ার বিল্ডিংটা দেখাল।

'বড্ড নার্ভাস হয়ে আছ তুমি, বন্ধু,' মুখে হাসি এনে বলল কুয়াশা। 'চোখে ভুলভাল দেখছ। এনিওয়ে, বলতে এলাম যে আমার আরেকটু সময় লাগবে। গাড়িতে গিয়ে বসো তুমি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তা ছাড়া... হাঁটাহাঁটি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছ অযথা।'

'তোমার কি বেশি দেরি হবে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সিমকিন।

'বড়জোর আধঘণ্টা। কেন, আমাকে ফেলে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল সিমকিন। 'আমার আসলে বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

'ব্লাডারকে কন্ট্রোল করতে শেখো,' কড়া গলায় বলল কুয়াশা। 'নিতান্তই যদি না পারো, ড্রেনের কাছে গিয়ে ছেড়ে দাও কল।'

সিমকিনকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সরে গেল ও।

পরের বিশ মিনিট ধরে নাতালিয়ার সঙ্গে আলোচনা করল কুয়াশা—ঠিক করে নিল, কীভাবে মাইয়োরভ প্রসপেক্টের সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরির বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের কাছে ওর সাক্ষাতের খবর পৌঁছে দেয়া হবে। বাইরের একটা ফোনবুদ থেকে ভদ্রলোকের কাছে ফোন করবে নাতালিয়া: জানাবে, তাঁর এক পুরনো অনুরাগীর প্রতিনিধি ও। আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে, মানুষটা কুয়াশা। ব্যাপারটা পরিষ্কার হবার পর এ-ও বলবে, কুয়াশা বিপদে পড়েছে, গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এ-খবর পাবার পর বৃদ্ধের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। চমকে যাবেন তিনি, ঘাবড়েও যাবেন। গোপন সাক্ষাতের জন্য যে-সব নির্দেশনা দেয়া হবে, তা একজন সাধাসিধে মানুষকে বিচলিত করবার জন্য যথেষ্ট। সন্ধ্যা ছ'টা বাজার দশ মিনিট আগে বৃদ্ধকে লাইব্রেরি কমপ্লেক্স থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম একজিট দিয়ে বেরিয়ে আসতে বলবে নাতালিয়া। ওদিককার রাস্তাঘাট তখন অন্ধকার থাকবে, লোক চলাচলও থাকবে না খুব বেশি। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পর্যন্ত একদিকে হাঁটতে হবে তাঁকে, তারপর কয়েক দফা দিক বদলে যেতে হবে আরও কিছুদূর। এর মাঝে কুয়াশা

যদি দেখা না করে, তা হলে লাইব্রেরিতে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সুযোগ বুঝে ওখানেই পরে হাজির হবে কুয়াশা। বলা বাহুল্য, এসব কথায় এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হবে তাঁর মধ্যে। চালচলনে ছাপ পড়বে সেটার, কাজেকর্মেও। যে-ই তাঁর উপর নজর রাখুক, ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক আচরণ দেখতে পাবে নিঃসন্দেহে। এর কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে তাকে, ফলে কাভার মেইনটেন করতে পারবে না। লোকটাকে চিনতে পারামাত্র আঘাত হানবে কুয়াশা, সরিয়ে দেবে দৃশ্যপট থেকে। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে এরপর ও দেখা করতে পারবে নিশ্চিন্তে।

'ওঁর সঙ্গে কথা বলবার পর কী করবে?' জানতে চাইল নাতালিয়া।

'সেটা নির্ভর করছে ভদ্রলোক আমাকে কী বলেন, আর ওঁর পিছনে লাগা ফেউয়ের কাছ থেকে কী জানতে পারি... তার ওপর,' কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। 'দেখা যাক কী হয়।'

'রাতে থাকবে কোথায় তুমি? আমার এখানে আসবে?'

'না এলেই তোমার জন্য মঙ্গল।'

'ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার।'

'আমার আপত্তি আছে। তা ছাড়া রাতের শিফটে কাজ করো তুমি, সকাল পর্যন্ত তো বাসাতেই থাকো না।'

'আজকের রুটিন বদলে নিতে পারি। বিকেলের শিফটে যদি ডিউটি সেরে আসি, মাঝরাতে ফিরতে পারব।'

'শিফট বদলাবার কারণ জানতে চাইবে লোকে।'

'বলব আমার এক আত্মীয় এসেছে মস্কো থেকে।'

'আইডিয়াটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কিন্তু এখানে থাকলে নিরাপদ থাকবে তুমি। রাত-বিরেতে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? অন্তত আমার সিকিউরিটির জন্যও কাছে

থাকা প্রয়োজন তোমার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'বেশ, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু কোনও কথা দিচ্ছি না।' উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'আমাকে যেতে হয় এবার। তুমিও ফোন করবার জন্য একটু পর বেরিয়ে পোড়ো।'

'লাশটা?'

'সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। দূরের কোনও সেলারে ফেলে দেব। তোমার কাছে ভদকা আছে?'

'কেন, ড্রিঙ্ক করতে চাও?'

'উঁহুঁ, ইংরেজ ব্যাটার গায়ে ঢালব। তারপর কেটে দেব দু'হাতের রগ। মনে হবে মাতাল হয়ে আত্মহত্যা করেছে। একটা ব্লেডও দাও আমাকে।'

ছয়

সল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরির দক্ষিণ-পশ্চিম এন্ট্রান্সের উল্টোপাশে, একটা আর্চওয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা আর সিমকিন। সামনে... কমপ্লেক্সের আঙিনা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত—সারি সারি ফ্লাডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ছে উঁচু দেয়ালের মাথা থেকে... সৃষ্টি করছে দৃষ্টিবিভ্রম—মনে হচ্ছে যেন কোনও প্রিজন কম্পাউণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পার্থক্য স্রেফ এ-ই যে, এই কারাগারে ইচ্ছেমত ঢুকতে-বেরুতে পারে মানুষ। আজ সন্ধ্যায় লাইব্রেরি

অত্যন্ত ব্যস্ত। দলে দলে পুস্তকপ্রেমী আনাগোনা করছে আর্চওয়ে ধরে।

'কী করছি আমরা, বুঝিয়ে বলো আমাকে,' হঠাৎ অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল সিমকিন। 'বুড়ো লোকটা কে? তাকে যে-অনুসরণ করছে, সে-ই বা কোন্ পক্ষের?'

বিরক্ত হলো কুয়াশা। 'এত কথা জানার দরকার কী তোমার?'

'দরকার আছে, কুয়াশা। ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখিয়ে দেশবিরোধী কোনও কাজ করিয়ে নিচ্ছ কি না, সেটা শিয়োর হয়ে নিতে চাই।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, অমন কিছুতে অংশ নিচ্ছ না তুমি। মি. শেভচেঙ্কো নিপাট ভালমানুষ, তাঁকে ফলো করছে আমার এক শত্রু। ব্যাটাকে আটক করতে হবে আমাদেরকে, যাতে ওর কাছ থেকে ইনফরমেশন আদায় করা যায়।'

'শেভচেঙ্কো... ওটাই বুড়ো ভদ্রলোকের নাম?'

'নামটা ভুলে গেলেই ভাল করবে তুমি... ওই তো, বেরিয়েছেন উনি।' চাপাস্বরে বলল কুয়াশা।

ওভারকোট আর কালো রঙের ফারের হ্যাট পরা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসেছেন এন্ট্রান্স দিয়ে। হিম বাতাসে কেঁপে উঠলেন একটু। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, যেন বুঝতে পারছেন না, কোন্ আর্চওয়ে ধরে রাস্তায় যাবেন। মুখে ছোট করে ছাঁটা সাদা দাড়ি; উন্মুক্ত ফ্যাকাসে চামড়া বলিরেখায় ভরা। মিনিটখানেক দ্বিধায় থাকার পর পা বাড়ালেন তিনি, নামতে শুরু করলেন সিঁড়ি দিয়ে, আঙিনায় নামার পর বামদিকের আর্চওয়ে ধরে চলে গেলেন রাস্তার দিকে।

শেভচেঙ্কোর পিছনের ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল কুয়াশা, অনুসরণকারীকে সনাক্ত করতে চায়। খুব বেশি সময়

লাগল না, নিঃসঙ্গ একটা মেয়ের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর—ভিড় ঠেলে দ্রুত আগে বাড়ছে। তাড়াহুড়ো করে নামছে সিঁড়ি ধরে, এক মুহূর্তের জন্যও নজর সরাচ্ছে না বৃদ্ধের উপর থেকে। ভাল কৌশল, মনে মনে স্বীকার করল কুয়াশা। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা ফেউ হিসেবে ভাল, কেউ সহজে সন্দেহ করে না মেয়েদেরকে। তবে এই মেয়ে শুধু অনুসরণের জন্য আসেনি এখানে, ওর আসল মিশন নিঃসন্দেহে কুয়াশাকে খুন করা। কতখানি ভয়ানক হতে পারে মেয়েটা, মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল ও।

'ওই মেয়েটাকে দেখছ?' ফিসফিসিয়ে বলল কুয়াশা। 'খয়েরি ওভারকোট আর টুপি পরা... ও-ই আমাদের টার্গেট। মি. শেভচেঙ্কোর কাছে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না ওকে। এসো।'

'একটা মেয়ে?' দ্বিধা ফুটল সিমকিনের কণ্ঠে, যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'সাধারণ মেয়ে নয়, বন্ধু। ওর থলের ভিতর অনেক চমক লুকানো আছে। চলো এগোই। এখুনি মি. শেভচেঙ্কোর কাছে যাবে না ও, ভদ্রলোককে একাকী পাবার জন্য অপেক্ষা করবে। সে-সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা, ওকে দূরে সরিয়ে আনব কৌশলে। যাতে চেঁচামেচি করলে কারও কানে না যায়।'

'চেঁচাবে?'

'অবশ্যই! মেয়েমানুষকে কখনও চুপচাপ হার মানতে দেখেছ? আর কথা নয়। চলো।'

পরের বিশ মিনিট প্রত্যাশিতভাবেই কাটল। চরম বিভ্রান্তি আর অশান্ত ভঙ্গি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। হাঁটলেন নার্ভাসভাবে—কখনও ফুটপাতে, কখনও বা বরফ ঢাকা সড়কে। ঘড়ি দেখলেন বার বার, তা করতে গিয়ে ক্রমাগত ধাক্কা

খেলেন পথচারী লোকজনের সঙ্গে। বিড় বিড় করে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলেন অনবরত। কয়েক বারই উল্টো ঘুরে অনেক দূর চলে এলেন, সম্ভবত নির্দেশনা ঠিকমত ফলো করতে পারেননি বলে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন নিজের উপর। ভদ্রলোকের এই অনিশ্চিত আচরণের ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটল—অনুসরণকারী মেয়েটাকেও একই ধরনের আচরণ করতে হলো। চিহ্নিত হয়ে যাবার ভয়ে কাছে যেতে পারল না বৃদ্ধের, দূরত্ব বজায় রাখতে হলো, থাকতে হলো ছায়ায় ঢাকা গলি কিংবা স্বল্পালোকিত দোকানপাটের সামনে।

সামনের চওড়া অ্যাভিনিউ জরিপ করে নিল কুয়াশা। দু'পাশে দুটো অন্ধকার গলি দেখতে পাচ্ছে। শেভচেঙ্কো সামনে এগোনোর পর নিঃসন্দেহে ও-দুটোর একটাতে পজিশন নিতে হবে মেয়েটাকে।

'এসো,' সিমকিনকে বলল কুয়াশা, 'ভিড়ের আড়াল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব আমরা। একটু পরেই ওই গলিগুলোর একটাতে ঢুকবে মেয়েটা, ওখানেই ফাঁদ পাতব।'

'যদি না ঢোকে?' সন্দেহ প্রকাশ করল সিমকিন।

'ঢুকবে,' কুয়াশা নিশ্চিত। 'এতক্ষণ ধরে এ-পদ্ধতিই ব্যবহার করছে ও।'

যে-সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল, তা সমাগত। উত্তেজনা অনুভব করল কুয়াশা। গত বিশ মিনিট ধরে ওর সাজানো পরিকল্পনা চমৎকারভাবে কাজ দিয়েছে, এবার সেটার সফল সমাপ্তি ঘটাবার পালা। দুটো বিষয়ে ও নিশ্চিত—প্রথমত, ওকে দেখামাত্র চিনতে পারবে মেয়েটা; নিঃসন্দেহে তাকে ছবি আর শারীরিক গঠনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাকে দ্রুত ঘায়েল করতে না পারলে আরেকবার ইংরেজ আততায়ীর মত আত্মহত্যার ঘটনা

ঘটবে। পুরো প্ল্যানের সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিং এবং চমকে দেবার উপরে। প্রথমটা ওর দায়িত্ব, দ্বিতীয়টা সিমকিনের।

পথচারীদের আড়াল নিয়ে রাস্তা পেরুল দুজনে, মিশে গেল কিরভ থিয়েটারের সামনে জড়ো হওয়া দর্শকদের ভিড়ে। আড়চোখে পিছনটা দেখে নিল কুয়াশা। টিকেটের জন্য লাইন ধরা লোকজনের কাছাকাছি হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন শেভচেঙ্কো, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শ্বাস টানছেন জোরে জোরে।

সিমকিনের বাহু ধরে কাছে টানল কুয়াশা। 'শোনো কী করতে হবে...'

ইউনিফর্মধারী কয়েকজন সৈনিক হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। তাদের পিছু পিছু আবার এগোতে শুরু করল ওরা। প্রথম গলিটা পেরিয়ে এল দু'জনে, দ্বিতীয় গলির সামনে পৌঁছে থামল। ইশারা পেয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সিমকিন, আর কুয়াশা কয়েক কদম এগিয়ে গলির পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওভারকোটের কলার তুলে দিল, মাথায় পরা হ্যাট একটু নামিয়ে নিল সামনে—মাথা নামিয়ে রাখায় ওর চেহারা এখন আর দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

আর মাত্র কয়েক মিনিট...

হ্যাটের কার্নিশের তলা দিয়ে শেভচেঙ্কোকে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল কুয়াশা। চোখ ঘোরাল—ক্ষণিকের জন্য প্রথম গলিতে ঢুকেছিল মেয়েটা, আবার বেরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় গলির সামনে চলে এল দ্রুতপায়ে, গলিমুখে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য, ভিতরে ঢুকে পড়ল পরক্ষণে।

কয়েক পা গিয়েই থেমে দাঁড়াল মেয়েটা। বুঝতে পেরেছে, গলিতে সে একা নয়। তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল বেরিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু থেমে গেল পিছনে সিমকিনের কণ্ঠ শুনে।

'কমরেড, দাঁড়াও! সার্কোলো... পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

থমকে গেল মেয়েটা। চমকে উঠেছে। ধীরে ধীরে ফিরল সিমকিনের দিকে। হিসিয়ে উঠে বলল, 'কে তুমি?'

'বন্ধু।' কয়েক পা সামনে এগোল সিমকিন। 'জরুরি মেসেজ আছে তোমার জন্য... রাখাল বালক পাঠিয়েছেন।'

আরেক দফা চমকাবার পালা মেয়েটার। বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। শিকারি শ্বাপদের মত ছুটল ও, দেয়ালের কোনা ঘুরে ঢুকে গেল গলিতে। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল মেয়েটা, কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশা।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল মেয়েটা। ব্যথা পেয়ে চেঁচানোর চেষ্টা করতেই তার খোলা মুখে একটা দলা পাকানো রুমাল গুঁজে দিল কুয়াশা, আঙুলের খোঁচায় মুখ-গহ্বরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ভালমত। দুই চোয়াল আর একত্র করবার উপায় রইল না মেয়েটার, মুখের ভিতর লুকানো সায়ানাইড পিলের আবরণ আর ভাঙতে পারবে না দাঁত দিয়ে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র দশ সেকেণ্ড। কিন্তু এরপরেই সচল হয়ে উঠল মেয়েটা। পাক্কা প্রফেশনাল, মুখে গোঁজা রুমাল বের করবার চেষ্টা করল না, ওটাকে মেনে নিয়েই অ্যাকশনে গেল। দেয়ালের উপর তাকে চেপে ধরতে গেল কুয়াশা, কিন্তু বাউলি কেটে ওকে ফাঁকি দিল সে। শরীর বেঁকে গেল একটু, চাবুকের মত উঠে এল এক পা, মুখের একপাশে সজোরে আঘাত করল কুয়াশাকে। মাথা ঝনঝন করে উঠল, ছিটকে মাটিতে পড়ল কুয়াশা।

'অ্যাই! থামো!' গর্জে উঠল সিমকিন, কোটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল হাত... পিস্তল বের করবার জন্য।

তাকে সে-সুযোগ দিল না মেয়েটা, দুই লাফে পৌঁছে গেল নাগালের মধ্যে। সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল রাশান পুলিশ অফিসারের মুখ দিয়ে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। মাথার পাশে লাথি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল পরক্ষণে। সিমকিনের উপর মরণ-আঘাত হানতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু পারল না... পিছন থেকে শক্তিশালী একজোড়া হাত জাপটে ধরে ফেলল তাকে, একটানে সরিয়ে আনল। আঘাত সামলে উঠে এসেছে কুয়াশা, আক্রমণ করেছে পিছন থেকে।

আলিঙ্গনের ভিতর মোচড়ামুচড়ি করল মেয়েটা, কিন্তু একচুল আলগা হলো না কুয়াশার হাতের বাঁধন। হিড় হিড় করে বন্দিনীকে টেনে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। আচমকা কনুই চালাল মেয়েটা, পাঁজরের একপাশে আঘাত পেয়ে হুঁক্ করে উঠল ও, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঢিল পড়ল দুই হাতে। নড়াচড়া করতে পেরে একটা পা উঁচু করল মেয়েটা, জুতোর তীক্ষ্ণ হিল নামিয়ে আনল কুয়াশার পায়ের পাতায়। তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মেয়েটাকে দেয়ালের উপর ছুঁড়ে ফেলল কুয়াশা, ইঁটের উপর নাক-মুখ-কপাল ঠুকে গেল তার। মুখে রুমাল গোঁজা, তাই শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুল।

প্রায় একই সময়ে আঘাত সামলে নিল দু'জনে। পরস্পরের মুখোমুখি হলো দুই ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ। কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে আবারও লাথি চালাল মেয়েটা। তবে এবার ও তৈরি আছে, আলতোভাবে ডান হাত তুলে ঠেকাল আঘাত, অন্যহাতে সজোরে বসাল একটা লেফট হুক। ঘুসি খেয়ে একপাশে মুখ ঘুরে গেল মেয়েটার, ডান হাতের আরেক ঘুসিতে তাকে সিধে করল কুয়াশা। তারপর তলপেটের উপর লাথি বসিয়ে তৃতীয়বারের মত ছিটকে ফেলল দেয়ালের গায়ে।

দম ফুরিয়ে গেছে মেয়েটার, শরীরের পুরো ভর তার গায়ে চাপিয়ে দিল কুয়াশা, একটা হাত রাখল কণ্ঠার উপরে, চাপ দিল মৃদুভাবে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল বন্দিনী।

'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে তুমি,' শীতল গলায় বলল কুয়াশা। আড়চোখে তাকাল সিমকিনের দিকে, ব্যথা সয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ?'

মাথা ঝাঁকাল রাশান পুলিশ অফিসার।

'গুড,' বলল কুয়াশা। 'পিস্তল বের করে কাভার দাও এই কুত্তিটাকে।'

শরীরের চাপ একটু কমাল কুয়াশা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো গলি। ছিটকে পিছিয়ে এল ও, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটার, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শরীরের একপাশ ভিজে উঠেছে রক্তে। ঝট্ করে সিমকিনের দিকে তাকাল কুয়াশা।

'আমি না!' সভয়ে পিছিয়ে গেল রাশান পুলিশ অফিসার। 'আমি না!!' আবার বলল সে।

তাড়াতাড়ি মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা, দ্রুত হাতে পরখ করল দেহটা। রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল—নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পিল ব্যবহার করতে পারেনি তো কী হয়েছে, কোটের আড়ালে লুকানো নিজের পিস্তলের ট্রিগার টিপে আত্মহত্যা করেছে ফেনিসের গুপ্তচর। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় দেরি করেনি এক সেকেণ্ডও। পাঁজরের একপাশে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল এক গর্ত... পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে ফায়ার করবার ফলাফল। ধোঁয়া বেরুতে থাকা পিস্তলটা বের করে নিল কুয়াশা।

'মাই গড!, ও মারা গেছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সিমকিন। 'গুলির আওয়াজ... সবাই শুনতে পেয়েছে! আমাদেরকে সরে যেতে হবে, কুয়াশা!'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন গলির মুখে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল কৌতূহলী পথচারীরা।

'শান্ত থাকো!' ধমক দিয়ে উঠল কুয়াশা। 'তোমার আই.ডি. কার্ড বের করো, ওটা দেখিয়ে ভাগাও ওদের। কাউকে ঢুকতে দিয়ো না গলিতে। দু'মিনিট চাই আমি।'

মেয়েটার পোশাকের সবগুলো পকেট হাতড়াল ও—যা যা পেল, ঢোকাল নিজের পকেটে। এক ফাঁকে শার্টের বোতাম খুলে লাইটারের আলোয় দেখে নিল বুকের নীচটা। হ্যাঁ, আছে... ছোট একটা বৃত্তাকার উল্কি—ফেনিসের চিহ্ন।

'জলদি করো!' গলিমুখ থেকে চাপা গলায় তাড়া দিল সিমকিন।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। সঙ্গীকে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল গলির আরও ভিতরে। আরেক পথে বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। সিমকিন কাঁপছে, মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। তার একটা হাত ধরে রাখল ও, যাতে নার্ভাসনেসের কারণে হঠাৎ দৌড় না দেয় লোকটা। ভাইবর্গের পুলিশ চিফকে এখনও মুক্তি দেবার সময় আসেনি। একটা মেসেজ পাঠাতে হবে রানার কাছে, সরকারি ইন্টারসেপশন এড়িয়ে এ-মুহূর্তে একমাত্র সিমকিনই পাঠাতে পারবে সেটা। কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই, গলির ভিতরের গোলমাল শেভচেঙ্কো দেখতে পেয়েছেন কি না কে জানে! এমনিতেই নার্ভাস মানুষ, গোলমালের আভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবেন অফিসে। হয়তো বা খবর দেবেন পুলিশে। তার আগেই পৌঁছুতে হবে ভদ্রলোকের কাছে। আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি

বোলাল কুয়াশা, সুস্থির হয়ে বসবার জন্য একটা জায়গা দরকার। রানার জন্য মেসেজ লিখতে হবে, ওটা আবার সাইফার-ও করতে হবে।

খুনে মেয়েটার লাথির প্রভাব এখনও যায়নি, মাথার এক পাশ টন টন করছে ওর। হাত তুলে আঘাতের জায়গাটা ছুঁলো। কপালের চামড়া কেটে গেছে ওখানটায়, রক্ত লেগে গেল গ্লাভে। কাটা জায়গাটা চেপে ধরল তাড়াতাড়ি। কপাল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলে লোকের চোখে পড়বে।

তড়িঘড়ি করে হাঁটছে সিমকিন। 'আস্তে হাঁটো,' তাকে নিচু গলায় বলল কুয়াশা। 'ওই যে একটা ক্যাফে; ওখানে কয়েক মিনিটের জন্য ঢুকব আমরা।'

'ভাল প্রস্তাব, আমার ড্রিঙ্ক দরকার,' বলল সিমকিন। 'মাই গড! আত্মহত্যা করল মেয়েটা... কে ছিল ও?'

'এমন একজন, যে-একটা বড় ভুল করে ফেলেছিল। তুমি সেটা করতে যেয়ো না।'

ক্যাফেতে প্রচুর মানুষ। কপাল ভাল, এক কোণের একটা টেবিল খালি পেয়ে গেল। মুখোমুখি বসল কুয়াশা আর সিমকিন। চারপাশটা দেখে নিল কুয়াশা।

'ম্যানেজারের কাছে যাও,' সিমকিনকে বলল ও। 'বলো যে, মাতাল হয়ে আছাড় খেয়েছে তোমার বন্ধু... কপাল কেটে গেছে। ব্যাণ্ডেজ আর অ্যান্টিসেপটিক নিয়ে এসো।' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সিমকিন, সে-সুযোগ দিল না। 'রিল্যাক্স, এ-সব জায়গায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল পুলিশ অফিসার।

পকেট হাতড়ে একটা বলপেন বের করল কুয়াশা। সামনে থেকে একটা কাগজের ন্যাপকিন টেনে নিয়ে রানার জন্য মেসেজ

লিখতে শুরু করল। সাবধানে একেকটা অক্ষর আর তার সাইফার বাছাই করছে। কয়েক দফা কাটাকাটি করতে হলো। একটু পরেই ফিরে এল সিমকিন। তার পিছু পিছু উদয় হলো ওয়েইট্রেস, একসঙ্গে তিনটে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল রাশান অফিসার—দুটো নিজের, অন্যটা সঙ্গীর জন্য। কুয়াশা মাথা তুলল না, লিখে চলল আপনমনে।

আট মিনিট লাগল মেসেজ শেষ করতে। এরপর ন্যাপকিনটা ভাঁজ করে সিমকিনের হাতে তুলে দিল ও। 'এটা কেইবল করে হেলসিঙ্কিতে পাঠাতে হবে তোমাকে। হোটেলের নাম-ঠিকানা উপরে দেয়া আছে।' তুলোয় অ্যান্টিসেপটিক পাউডার নিয়ে ক্ষতের উপর ঘষতে শুরু করল। 'গোপন চ্যানেল ব্যবহার কোরো, আমি চাই না কেউ এটা ইন্টারসেপ্ট করুক।'

ভুরু কোঁচকাল সিমকিন। 'সেটা কীভাবে সম্ভব, বলতে পারো?'

'ন্যাকামি কোরো না,' শান্তস্বরে বলল কুয়াশা। 'নিশ্চয়ই ফিনিশ বন্ধুদের সঙ্গে নরমাল চ্যানেলে যোগাযোগ করো না তুমি?'

'ওটার জন্য আলাদা শিডিউল আছে... যখন-তখন পাঠানো যায় না মেসেজ।'

'সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করো। আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। আজ রাতেই মেসেজটা চলে যাওয়া চাই।'

মুখ গোমড়া করে ফেলল সিমকিন। 'তা হলে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। টাকা-পয়সাও লাগবে বেশ কিছু, আমি তো কিছুই আনিনি।'

'দুটোই পাচ্ছ তুমি...' বলল কুয়াশা, '...আমার তরফ থেকে।'

বিস্ময় ফুটল সিমকিনের চেহারায়। 'একাকী যেতে দেবে তুমি আমাকে? বিশ্বাস করবে?'

'কেন নয়? বেঈমানী করলে আমার চেয়ে অনেক বেশি কিছু হারাবে তুমি। তাই না?' অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে।

সাত

ডিনারের সময় হয়ে গেছে। সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরির বৃহদায়তন রিডিং রুমগুলো এখন আর আগের মত কর্মব্যস্ত নয়। লম্বা লম্বা টেবিলগুলোয় বিক্ষিপ্তভাবে বসে আছে কিছু পাঠক; হাতে গোনা অল্প ক'জন ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, মুগ্ধচোখে দেখছে প্রাচীন এই ভবনের ট্যাপেস্ট্রি আর অয়েল পেইন্টিংগুলো।

পশ্চিম উইঙের মার্বেলে গড়া হলওয়ের মাঝে ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল কুয়াশার। জ্ঞান আহরণের নেশায় কত দিন... কত বিনিদ্র প্রহর কাটিয়েছে ও এই লাইব্রেরিতে! বইয়ের ভিড়ে ঢুকলেই ভুলে যেত বাইরের জগতের কথা... ভুলে যেত সার্বক্ষণিক বিপদ আর ধরা পড়ার ভয়। ওই সময়টুকুর জন্য বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান আইভান শেভচেঙ্কো-ই ছিলেন ওর একমাত্র বন্ধু, সহমর্মী। কুয়াশার সত্যিকার পরিচয় জানার পর থেকে বদলে গেছে সে-সব। বন্ধুত্বের খাতিরে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেননি ভদ্রলোক, কিন্তু মানা করে দিয়েছেন এখানে পা রাখার ব্যাপারে। তাঁর এই ইচ্ছেকে সম্মান দেখিয়েছে কুয়াশা এতদিন, কিন্তু আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের খোঁজ পেতেই হবে ওকে... আর সে-জন্য এই লাইব্রেরি এবং এর

লাইব্রেরিয়ানের সহায়তা না নিয়ে উপায় নেই।

রাশার এ-অঞ্চলে সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরির চেয়ে বড় কোনও লাইব্রেরি নেই। বিশাল এক জ্ঞানের আধার... সেইসঙ্গে দেশের সবচেয়ে বড় আর্কাইভগুলোর একটা রয়েছে এখানে। জারিস্ট, মানে রাজকীয় শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে রাশায় বহুকাল আগে। নীল রক্তধারী পরিবারগুলো তার পরেও বেশ কিছুদিন ব্যবহার করেছে ডিউক, কাউন্ট, প্রিন্স এ-জাতীয় পদবী... তবে ধীরে ধীরে তাদেরকে বিতাড়িত কিংবা সাধারণ জনতার ভিড়ে মিশিয়ে ছেড়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। রোষানল থেকে বাঁচার জন্য বেশিরভাগ অভিজাত পরিবারই নিজেদের নামধাম পাল্টে ফেলেছিল, তাই কুয়াশা নিশ্চিত—শুধু নাম দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের খোঁজ পাওয়া যাবে না আর। কী ঘটেছে এই বিশেষ মানুষটির এবং তার পরিবারের ভাগ্যে—তা জানা যেতে পারে শুধুমাত্র প্রাচীন এই লাইব্রেরির আর্কাইভ, বা লাইব্রেরিয়ানের বিশ্বকোষ-তুল্য মস্তিষ্ক থেকে।

করিডোরের বাঁক ঘুরে ঘোলা কাঁচের একটা দরজার সামনে পৌঁছুল কুয়াশা। আশপাশের সব কামরা অন্ধকার, শুধু এই একটাতেই ম্লান আলো জ্বলছে। ভিতরে কার যেন নড়াচড়ার আভাস। মি. শেভচেঙ্কোর অফিস এটা—গত পঁচিশ বছর ধরে এখানেই কাটছে তাঁর দিনরাতের একটা বড় অংশ। একটু ইতস্তত করল ও, তারপর মৃদু টোকা দিল দরজায়।

ওপাশ থেকে একটা ছায়া পড়ল, ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। শেভচেঙ্কোর মুখোমুখি হলো কুয়াশা। চশমার পিছনে ভদ্রলোকের দু'চোখে শঙ্কার মেঘ ঘনাল। বেশিক্ষণ হয়নি বাইরে থেকে ফিরেছেন, এখনও পরে আছেন ওভারকোটটা। ঠাণ্ডা বাতাসে কুঞ্চিত চামড়া এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

'কুয়াশা!'

'হ্যালো, মি. শেভচেঙ্কো। দুঃখিত, আপনাকে এতদিন পর আবার বিরক্ত করতে হলো।'

'কী চাও তুমি? কেন এসেছ এখানে?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে বলব? একটু ভিতরে আসি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা ছাড়লেন শেভচেঙ্কো। অফিসের ভিতরে ঢুকে চারপাশে তাকাল কুয়াশা। একদমই বদলায়নি জায়গাটা। দু'দিকের দেয়ালে শেলফ, মাঝখানে পুরনো এক ডেস্ক... উপরে স্তূপ হয়ে আছে নানা রকম কাগজপত্র আর বই। এক কোণে একটা বিশ-ইঞ্চি পর্দার টিভি—চলছে, তবে কমিয়ে রাখা হয়েছে ভলিউম। কামরার আরেক কোণে নিচু টেবিলের উপরে রয়েছে একটা বিদ্যুৎ-চালিত হট প্লেট, তার উপরে বসিয়ে রাখা হয়েছে চায়ের কেতলি। আগের কেতলিটাই কি না, ঠিক বোঝা গেল না।

দরজা ঠেলে দিয়ে উল্টো ঘুরলেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। কুয়াশাকে অবাক করে দিয়ে আলিঙ্গন করে বসলেন ওকে। কঠিন... আন্তরিক আলিঙ্গন। একটু পর ওকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম স্যরি, মাই বয়। অনেক খারাপ কথা বলেছি তোমাকে, মানা করেছি আর কোনোদিন দেখা করতে... কিন্তু ওসবের একটাও আমার মনের কথা ছিল না।'

'ভুলে যান, স্যর,' হাসল কুয়াশা। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'না, বলতে দাও আমাকে। লোকে যা-ই বলুক, আমি তো জানতাম তুমি আসলে কী। আর দশটা সাধারণ মানুষের মত ছিলে না তুমি, সেটাই তোমার অপরাধ... কিন্তু কী করব, পরিবারের কথা ভাবতে হয়েছে আমাকে। একা আমি নাহয় পুলিশি হাঙ্গামা সহ্য করলাম, আমার বউ-ছেলে-মেয়েরা কেন করবে?'

'প্লিজ, স্যর,' বৃদ্ধের কাঁধে হাত রাখল কুয়াশা, 'এসব নিয়ে

আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনার। সবই বুঝেছি আমি। তা ছাড়া... আপনার ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে দূরে সরে যাইনি আমি। সরে গেছি আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে। আমার কোনও অভিযোগ নেই, স্যর।'

মলিন হাসি ফুটল শেভচেঙ্কোর ঠোঁটে। কুয়াশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। কপালের কাটা জায়গাটা দেখে ভুরু কোঁচকালেন। 'ব্যথা পেয়েছ কীভাবে?'

'ও কিছু না, সামান্য অ্যাকসিডেন্ট।'

'ওষুধ-টষুধ লাগবে কিছু?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'তবে একটু চা পেলে মন্দ হয় না।' কেতলির দিকে ইশারা করল। 'আপনার চা লেনিনগ্রাদের সেরা।'

হেসে ফেললেন শেভচেঙ্কো। অস্বস্তিকর পরিবেশটা সহজ হয়ে এল তাতে। 'বাড়িয়ে বলবার স্বভাব তোমার যায়নি দেখছি! বসো।'

চেয়ার টেনে বসল কুয়াশা। দু'কাপ চা নিয়ে এলেন বৃদ্ধ—একটা দিলেন ওকে, অন্যটায় চুমুক দিতে দিতে বসলেন মুখোমুখি।

'কী বলতে এসেছ, সেটা শুনি এবার,' বললেন বৃদ্ধ। 'আধঘণ্টা ধরে লেনিনগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছি, কিন্তু তুমি দেখা দাওনি। কারণ কী?'

'দুঃখিত,' বলল কুয়াশা, 'নিরাপত্তার খাতিরে কষ্টটা দিতে হয়েছে আপনাকে। এখন আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারব।'

'সমস্যায় পড়েছ?'

'হুঁ, সমস্যাই বটে।' চা খেতে খেতে বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানকে সংক্ষেপে ফেনিস সম্পর্কে খুলে বলল কুয়াশা। ব্যাখ্যা করল সংগঠনটার সূচনার সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের কানেকশনের

ব্যাপারটা।

'তা হলে ভারাকিন পরিবারকে ট্র্যাক করতে চাও তুমি?' ওর কথা শেষ হলে প্রশ্ন করলেন শেভচেঙ্কো।

মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'আপনি সাহায্য করতে পারবেন আমাকে?'

'দেখা যাক,' চেয়ারে হেলান দিলেন বৃদ্ধ। 'নামটা অপরিচিত নয় আমার কাছে। যদ্দূর মনে পড়ে... রাশান বিপ্লবের পর ওদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল নতুন সরকার। অবশ্য তার আগে থেকেই ধীরে ধীরে সব গ্রাস করে নিচ্ছিলেন রোমানভ আর তাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্টনাররা। নিকোলাস আর তার ভাই... মিখায়েল... একেবারেই পছন্দ করতেন না ভারাকিন পরিবারকে। প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছিলেন, ভারাকিন-রা নাকি গোটা উত্তর রাশার সবচেয়ে বড় ডাকাত। বলা বাহুল্য, তোমার ওই প্রিন্সকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল বলশেভিক-রা। ভারাকিনদের একমাত্র ঢাল ছিলেন আলেকজান্দার কেরেনস্কি... মানে রাশান প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের দ্বিতীয় প্রাইম মিনিস্টার। অভিজাত পরিবারগুলোকে এক টানে মাটিতে নামাবার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। কিন্তু উইন্টার প্যালেসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওই ঢাল হারায় ভারাকিন পরিবার।'

'প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?'

'নথিপত্র তো বলে, ফাঁসি দেয়া হয়েছে তাকে। তবে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগেই বিভিন্ন কায়দায় বহু লোক পালিয়ে গিয়েছিল... সঠিক কোনও তালিকা পাওয়া যাবে না তাদের। এদের অনেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উদয় হয়েছে, কিন্তু আন্দ্রেই ভারাকিনকে দেখা যায়নি কোথাও।'

'হয়তো গেছে, কিন্তু টের পায়নি কেউ,' ধারণা করল কুয়াশা।

'উঁহুঁ,' মাথা দোলালেন শেভচেঙ্কো। 'প্রিন্স ভারাকিনের পক্ষে

অতটা লো-প্রোফাইল মেইনটেন করা সম্ভব ছিল না।'

'এ-কথা কেন বলছেন?'

'ওদের রেপিউটেশনের কারণে। পুরো পরিবারই ছিল কুখ্যাত, কুয়াশা। প্রিন্সের বাপ-দাদা ছিল চায়নিজ আর আফ্রিকান স্লেভ ট্রেডার। ভারত মহাসাগর থেকে আমেরিকান দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত ছিল ওদের আধিপত্য। রাজকীয় ব্যাঙ্কগুলোকে ম্যানিপুলেট করত ওরা, ইচ্ছেমাফিক যে-কোনও মার্চেন্ট ফ্লিট বা কোম্পানিকে পথে বসাতে পারত। যা পছন্দ হতো, তা-ই দখল করে নিত। আমি শুনেছি, ওদেরকে রাজদরবার থেকে গোপনে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন *জার*, কিন্তু পারেননি। প্রিন্সের বাবা জারের মুখের উপর কথাও শুনিয়ে দিয়ে এসেছিল... এমনই ছিল ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। এসব অবশ্য বিপ্লবের বহু বছর আগের কথা।'

'আপনি বলছেন, গোপনে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন... কারণ কী? জার যদি প্রকাশ্যেই কাজটা করতেন, অসুবিধে কী ছিল?'

'সে-আমলে অভিজাত পরিবারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদের কোনও ধরনের সংঘাতের খবর প্রকাশ করা হতো না। স্ক্যাণ্ডাল এড়ানোর একটা উপায় আর কী!'

'হুম। প্রিন্স ভারাকিনের কোনও ছেলে-মেয়ে ছিল?'

'জানি না। তবে থাকারই কথা... বৈধ না হলেও অবৈধ তো বটেই। রক্ষিতার অভাব ছিল না তার।'

'আর বাকি পরিবার? তাদের কী হয়েছে?'

'ও-ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। তবে আমার ধারণা ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিপ্লব-পরবর্তী বিচারগুলোতে নারী এবং শিশুদের ব্যাপারে নমনীয় ছিল নতুন সরকার, তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছিল... কিন্তু কথাটা সব পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিছু কিছু পরিবারের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল

বিপ্লবীদের, তাদেরকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দিয়েছে। ভারাকিন-রা তেমনই একটা পরিবার ছিল, তাই কাউকে বাঁচতে দেবার কথা নয় ওদের। তবে... আগেই বলেছি, আমি শিয়োর নই।'

'আমাকে শিয়োর হতে হবে।'

'বুঝতে পারছি। তবে এখন পর্যন্ত যা বলেছি, তাতে তো তোমার ওই ফেনিস কাউন্সিলের থিয়োরির সঙ্গে মতদ্বৈততা দেখা দিচ্ছে।'

'কীভাবে?'

'নিজেই ভেবে দেখো, প্রিন্স যদি পালাতে পারত, তা হলে গা-ঢাকা দিয়ে তে কোনও লাভ হতো না তার। সে-আমলে পলাতকরা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল, সত্যিকার পদবীধারীদেরকে দু'হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিচ্ছিল বিদেশি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আর প্রতিষ্ঠান। পলাতক হলেও কানেকশন কম ছিল না ওদের, এ-কারণে ওদের মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যবসা পাচ্ছিল ওসব প্রতিষ্ঠান। এমন প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার মানুষ ছিল না প্রিন্স ভারাকিন। উঁহুঁ, কুয়াশা, আমার মনে হয় মারাই গিয়েছিল সে।'

বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল কুয়াশা, চেষ্টা করল তাঁর ধারণার মধ্যে খুঁত বের করতে। উঠে দাঁড়াল ও, চায়ের কেতলি থেকে ভরে নিল নিজের কাপ, তারপর ফিরে এল নিজের চেয়ারে। চায়ে চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা কারণে ও-কাজ করতে পারে ভারাকিন। যদি ও-সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি টাকা দেয়া হয় তাকে... নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য।'

'ফেনিস?' জিজ্ঞেস করলেন শেভচেঙ্কো।

'হ্যাঁ। রোম আর জেনোয়ায় ওদের কাজ শুরু করবার জন্য ফাণ্ড রেখে গিয়েছিলেন কাউন্ট বারেমি। নিঃসন্দেহে সেখান থেকে বড় অঙ্কের শেয়ার পেয়েছিল প্রিন্স।'

'কিন্তু ও-টাকার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন,' যুক্তি দেখালেন শেভচেঙ্কো। 'যদ্দূর বুঝেছি তোমার কথা থেকে... টাকাটা দেয়া হয়েছিল খুনি ভাড়া করবার জন্যে... গিলবার্তো বারেমির প্রতিহিংসার দীক্ষা ছড়িয়ে দেবার জন্যে। রাইট?'

'পাহাড়ের ওই বৃদ্ধা মহিলা তো তা-ই বলেছেন আমাকে।'

'তারমানে টাকাটা কারও হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ, বা নতুন পুঁজির জন্য নয়। ইউ সি, এখানেই আমার খটকা লাগছে। যদি পালাতেই পারত, নতুন সুযোগগুলোর দিকে পিঠ ফেরাত না সে... অন্তত দুনিয়ায় অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নামা একটা গুপ্তসংঘের জন্য তো নয়ই! লোভী এবং বাস্তববাদী স্বভাবের মানুষ ছিল প্রিন্স ভারাকিন।'

ঠোঁটের কাছে কাপ তুলছিল কুয়াশা, থেমে গেল মাঝপথে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের দিকে। 'কী বললেন আপনি?'

'বলছি যে, লোভী এবং বাস্তববাদী স্বভাবের লোক ছিল...'

'না, না। তার আগে। টাকাটা কারও হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ বা...'

'নতুন পুঁজির জন্য নয়,' বাক্যটা শেষ করলেন শেভচেঙ্কো। 'যে-টাকা ব্যবসায় খাটাতে পারবে না, তার জন্য বাইরের সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন প্রিন্স? ব্যাঙ্ক আর কোম্পানিগুলো অভিজাত রাশানদের প্রচুর টাকা সাধছিল!'

ডেস্কের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল কুয়াশা। দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'জায়গামত তীর লাগিয়েছেন আপনি,

স্যর। নতুন পুঁজি... দ্যাটস্ ইট! দীক্ষা কীভাবে ছড়ানো যায়? ভিখিরি আর উন্মাদ-রা ছড়ায় রাস্তাঘাটে, ধর্মযাজকরা ছড়ান উপাসনালয়ে... আর রাজনীতিকরা ছড়ায় ভাষণ-মঞ্চ থেকে। কিন্তু সন্ত্রাসের দীক্ষা, যা প্রচারে বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তা ছড়াবেন কীভাবে? উত্তরটা খুব সহজ—আড়াল থেকে... সংগোপনে। অলরেডি বিদ্যমান আছে, এমন সব স্ট্রাকচারের সাহায্য নিয়ে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে সেটা—বিভিন্ন দেশে যার শাখা আছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্র থেকে। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করবেন আপনি, এ-ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কিনে নেবেন... ব্যস, ওটাকে ব্যবহারের উপায় পেয়ে গেলেন।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ,' বললেন শেভচেঙ্কো, 'কাউন্ট বারেমি তার টাকাগুলো রেখে গিয়েছিল বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনার জন্য?'

'এগজ্যাক্টলি!' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'ভুল জায়গাতে খোঁজ নিতে এসেছি আমি। প্রিন্স ভারাকিন পালিয়ে যায়নি... পালাবার প্রয়োজনই হয়নি তার। সম্ভবত বিপ্লব-টিপ্লবের বহু আগেই রাশা ছেড়ে চলে গেছে সে। এখানে এমনিতেই কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না তার, রোমানভ সরকার গ্রাস করে নিচ্ছিল তার সহায়-সম্পত্তি। কোনও উপায় ছিল না কাউন্ট বারেমির টাকাগুলো এখানকার কোনও ব্যবসায় খাটানোর। ভেবে দেখুন, এমন পরিস্থিতিতে রাশায় কেন থাকবে সে? বিপ্লব ঘটার আগেই তাই দেশত্যাগ করেছে... এ-কারণেই পলাতক অভিজাতদের মাঝে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার বহু আগেই নামধাম পাল্টে নতুন পরিচয় নিয়েছিল।'

'তুমি ভুল করছ, কুয়াশা। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় প্রিন্স

ভারাকিনের নাম দেখেছি আমি।'

'কিন্তু সত্যিই ফাঁসি হয়েছিল কি না, তা তো বলতে পারছেন না।'

'এত লোকের মাঝে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে পাওয়া...'

'ওটাই আমার পয়েন্ট।'

'কিন্তু কেরেনস্কি-র প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার যোগাযোগের রেকর্ড আছে। সেটা ব্যাখ্যা করবে কীভাবে?'

'রেকর্ড জাল করা হয়েছে,' দৃঢ় গলায় বলল কুয়াশা। প্রতিটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে, সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। 'আত্মগোপনের জন্য বিপ্লবের সময়টা চমৎকার একটা সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল প্রিন্স ভারাকিনের সামনে। বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতায় ডুবে গিয়েছিল গোটা রাশা... স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লেগেছে। সরকারি রেকর্ড ম্যানিপুলেট করা খুব সহজ হয়েছে তার জন্য।'

'যতটা সহজ ভাবছ, ততটা মোটেই ছিল না,' দ্বিমত পোষণ করলেন শেভচেঙ্কো। 'হ্যাঁ, বিশৃঙ্খলা চলছিল রাশায়, কিন্তু তার ভিতরে একদল পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়েছিল দেশের আনাচে-কানাচে, নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ঘটনার বিবরণ লেখার জন্য। বুদ্ধিজীবীরা জানতেন, ভবিষ্যতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ওই বিশেষ সময়টা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক দেখা দেবে। তাই নেয়া হয়েছিল ওই পদক্ষেপ। পর্যবেক্ষক-রা সবকিছুর রেকর্ড রেখেছেন, কুয়াশা... ঘটনা বা তথ্য যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।'

'তা হলে ওসব রেকর্ডে চোখ বোলাতে চাই আমি,' বলল কুয়াশা। 'লাইব্রেরির আর্কাইভে নিশ্চয়ই রাখা আছে ওগুলো?'

'অনুরোধটা রাখতে পারলে খুশি হতাম,' বিব্রত কণ্ঠে বললেন শেভচেঙ্কো। 'কিন্তু সমস্যা হলো, আর্কাইভ খোলার ক্ষমতা নেই

আমার।'

'কার আছে?'

'অনুমতি আসে মস্কো থেকে—মিনিস্ট্রি অভ কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের মাধ্যমে। ওটা পাবার পর লেনিনগ্রাদ অফিস থেকে লোক পাঠানো হয় নীচতলার চাবি দিয়ে। এখানে আর্কাইভের কোনও চাবিই থাকে না।'

'যাকে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে আর্কাইভের কোনও সম্পর্ক আছে? মানে... সে কি কোনও ধরনের স্কলার?'

'উঁহুঁ। স্রেফ চাবিঅলা।'

'শেষ কবে খোলা হয়েছে আর্কাইভ?'

'উমম্... সম্ভবত মাসখানেক আগে। দানোভের এক হিস্টোরিয়ান এসেছিল রিসার্চের কাজে।'

'কাজ করেছে কোথায়?'

'নীচের আর্কাইভ রুমে। ওখান থেকে কোনও কিছু বের করা নিষেধ।'

হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। 'ধরে নিন, কিছু একটা বের করে নিয়েছিল সে। ওটা আবার ফেরতও পাওয়া গেছে। যত দ্রুত সম্ভব জিনিসটা আবার রেখে দেয়া দরকার আর্কাইভে। একটা ফোন করবেন নাকি কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসে?'

বিশ মিনিটের মাথায় এক যুবক হাজির হলো বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের অফিসে। হাতে ব্রিফকেস, ঠাণ্ডায় মুখ নীল হয়ে আছে। পকেট থেকে আই.ডি. কার্ড বের করে দেখাল; বলল, 'আমি দিমিত্রি শেপিলভ, স্যার। কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিস থেকে এসেছি। নাইট ডিউটি অফিসার বললেন, ব্যাপারটা নাকি জরুরি...'

কথা বলতে বলতে চেয়ারে বসা কুয়াশার উপর দিয়ে ঘুরে

গেল তার দৃষ্টি।

'জরুরি তো বটেই,' বললেন শেভচেঙ্কো। 'একই সঙ্গে অত্যন্ত সিরিয়াস। কিন্তু...' একটু দ্বিধা করলেন তিনি, '...তোমাকে তো আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'অফ-আওয়ারে ফোন করেছেন আপনি,' কৈফিয়ত দিল যুবক। 'সাধারণত যিনি চাবি নিয়ে আসেন, তাঁকে পাওয়া যায়নি।'

'তুমি চাবি এনেছ তো?'

'হ্যাঁ।' ব্রিফকেস খুলে একটা লম্বা চাবি বের করল যুবক। বার বার তাকাচ্ছে কুয়াশার দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটতে দেখে ইতস্তত করল। 'কিছু মনে করবেন না, আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'আমার ধারণা, তুমি আমাকে চেনো,' হালকা গলায় বলল কুয়াশা। 'আর কিছু না হোক... চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। স্থির হয়ে গেল যুবক। শীতল চোখে মাপতে শুরু করল ওকে। ধীরে ধীরে চেহারা বদলে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল ওরা।

এক লাফে চারফুট এগিয়ে এল যুবক। ফেলে দিয়েছে চাবি, ভোজবাজির মত হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ধারালো ছুরি। কোমরের কাছ থেকে উপর দিকে, কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে ছুটে এল ছুরি। লাফিয়ে চেয়ার থেকে শূন্যে উঠে গেছে কুয়াশা, একটু কাত হয়ে পিছনে হেলল, সেইসাথে ভাঁজ করে নিল ডান পা।

ছুরির ফলা নাগালের মধ্যে পেল না কুয়াশাকে। নেমে এল ও। বাম পা মেঝে স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড এক লাথি মারল যুবকের হাঁটুতে। ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এমনিতেই ভারসাম্য

হারিয়েছিল সে, হাঁটুর উপর প্রচণ্ড সাইড কিক খেয়ে পা মচকে গেল তার, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ব্যালান্স হারিয়ে। কব্জির উপরে আরেকটা লাথি পড়তেই ছিটকে চলে গেল ছুরিটা নাগালের বাইরে।

তবে হার মানতে রাজি নয় যুবক। ক্রুদ্ধ গর্জন করে কুয়াশার দু'পা ধরে ফেলল সে, প্রচণ্ড এক ঝটকায় ওকে ভূপাতিত করল। মেঝেতে আছাড় খেয়ে দাঁতে দাঁত চাপল কুয়াশা, পরমুহূর্তে কনুই দিয়ে ওর বুকে আঘাত হানল যুবক। চোখে অন্ধকার দেখল কুয়াশা, দম নিতে পারছে না। ব্যথা সামলে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রমাদ গুনল। ছুরিটা আবার কুড়িয়ে নিয়েছে যুবক, ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসছে ওর পেটে গেঁথে দেবার জন্য।

চট্ করে সরে গেল ও প্রতিপক্ষের গতিপথ থেকে, যুবক ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কষে একটা লাথি মারল। ছিটকে লাইব্রেরিয়ানের টিভির উপর মাথা দিয়ে পড়ল শত্রু।

সচল টিভির পিকচারটিউব বিস্ফোরিত হলো, ফলে পথ পেয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল যুবকের মাথা। আগুনের ফুলকি মেঘের আকৃতি পেল। তারপর একরাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠল ঘর। লোকটার শরীর টান টান হয়ে উঠল, তারপর শুরু হলো অদম্য ঝাঁকুনি। কয়েক সেকেণ্ড পর নির্জীব, অসাড় হয়ে গেল সে। টেলিভিশন এখনও মাথার চারধারে ফিট করা, কার্পেটের উপর আছাড় খেল প্রকাণ্ড শরীরটা। তারপর আর নড়ল না।

প্রয়োজন নেই, তাও গিয়ে পালস চেক করল কুয়াশা। নাহ্, বেঁচে নেই যুবক।

'শিট!' নিজেকে গাল দিয়ে উঠল ও। 'একটাকেও জ্যান্ত ধরতে পারছি না!'

ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কি... ও কি...'

'ফেনিসের লোক,' বলল কুয়াশা। লাশের বুক উন্মুক্ত করে বৃত্তাকার উল্কিটা দেখাল তাঁকে।

চমক কাটছে না শেভচেঙ্কোর। আবার প্রশ্ন করলেন, 'ত্... তুমি ব্... বুঝলে কী করে?'

'নতুন লোক শুনেই সন্দেহ জাগল। তাই একটু খোঁচা দিলাম... ফলাফল তো নিজ চোখেই দেখতে পেলেন।' উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'মিনিস্ট্রি-র অফিসে ফোন করুন। বলে দিন যে, ডকুমেন্টগুলো আর্কাইভে সাজিয়ে রাখার জন্য সময় দরকার; তাই ওদের লোকের ফিরতে একটু দেরি হবে। নইলে পুলিশ-টুলিশে খবর দিয়ে বসতে পারে।'

নিজেকে একটু সামলে নিলেন শেভচেঙ্কো। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, ওখানে ফেনিসের লোক এল কীভাবে। অফিসটা তো একেবারেই গুরুত্বহীন!'

'অফিস থেকে আসেনি এ-লোক,' বলল কুয়াশা। 'আপনার ফোন লাইন ট্যাপ করেছিল। চাবিঅলাকে সম্ভবত পথের মাঝখানে অ্যামবুশ করেছে, তারপর নিজে এসেছে এখানে। আমার জন্য ফাঁদ পাততে চেয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন শেভচেঙ্কো। ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন মিনিস্ট্রি অভ কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের অফিসে।

আট

আর্কাইভের মেটাল র‍্যাক থেকে ঢাউস দুটো খতিয়ান নামালেন শেভচেঙ্কো, তুলে দিলেন কুয়াশার হাতে। এর আগে আরও ষোলোটা বই দেখা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিন সংক্রান্ত কোনও তথ্য।

'কাজটা মস্কোতে করা গেলে অনেক দ্রুত সারা যেত,' হাত থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন তিনি। 'ওখানে কম্পিউটারাইজড় ইনডেক্স বানানো আছে। সহজে দরকারি তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।'

'সঙ্গত কারণেই ওখানে যেতে পারছি না আমরা,' বলল কুয়াশা। 'এখানেই চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

বইদুটো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। হলদেটে পাতাগুলো উল্টে চোখ বোলাল প্রাচীন রেকর্ডে।

'পেয়েছি!' একটু পর বলে উঠলেন শেভচেঙ্কো।

'কী?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'ভারাকিন পরিবারের ইতিহাস। এই তো... এখানে আছে সব।'

'দেখি।'

বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের পাশে চলে এল কুয়াশা। পড়তে শুরু করল লেখাটা। পরিষ্কার, গুটি গুটি হরফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে

সব। প্রিন্স ভারাকিনের পিতা আর পিতামহের কথা আছে ওতে। সাধারণ জনতার শত্রু বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাদেরকে। দেয়া আছে অপরাধের বিবরণ—প্রিন্সের পূর্বপুরুষদের কারণে মারা পড়েছে বহু মানুষ, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক; একটা সময়ে গোটা রাশা-জুড়ে দেখা দেয়া অর্থনৈতিক মন্দার জন্যও দায়ী করা হয়েছে তাদেরকে। প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিনকে দক্ষিণ ইয়োরোপে পাঠানো হয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য, পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে সে ফিরে আসে পূর্বপুরুষদের স্থাপন করা ঐতিহ্যকে আরও সুসংহত করবার মানসিকতা নিয়ে।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'কোথায় লেখাপড়া করেছে ও?'

পাতা ওল্টালেন শেভচেঙ্কো। 'ক্রেফেল্ড... ইউনিভার্সিটি অভ ক্রেফেল্ড। এই তো, লেখা আছে এখানে।'

'তারমানে জার্মানি!' একটু ভাবল কুয়াশা। 'মনে হচ্ছে এটাই আমাদের ক্লু।'

'কীসের ক্লু?'

'ভারাকিনের নতুন পরিচয়ের। আসুন, পুরোটা পড়ে দেখি।'

পড়ল ওরা। তিন বছর ক্রেফেল্ডে পড়াশোনা করেছে প্রিন্স, তার মধ্যে দু'বছর ছিল ডুসেলডর্ফে... গ্র্যাজুয়েট হবার জন্য। ভবিষ্যৎ জার্মান-ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট গুস্তাভ ফন বোলেনহলবাখ, ফ্রেডরিখ শট আর উইলহেলম্ হ্যাবারনিশ-এর মত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সে-সময়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার।

বিখ্যাত এসব ব্যবসায়ী সম্পর্কে কী জানে, ভেবে দেখল কুয়াশা। 'জার্মানির এসেন-কেন্দ্রিক ব্যবসা ছিল ওদের,' বলল ও, 'মনে হচ্ছে ওখানেই পাড়ি জমিয়েছিল ভারাকিন। আফটার অল, ওখানে বন্ধুবান্ধব ছিল তার, ভাষাটাও ভাল করে জানত।

টাইমিং-ও ছিল চমৎকার। রাশায় বিপ্লব, ইয়োরোপ-জুড়ে যুদ্ধ... গোলমালের মাঝে হারিয়ে যাওয়া সহজ ছিল খুব। আমি বলব, এসেনের আর্মামেন্ট কোম্পানিগুলোর একটায় ঢুকে পড়েছিল সে।'

'ক্রুপ?'

'অথবা ভর্গেন... ক্রুপদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'কীভাবে?'

'পিছনের দরজা দিয়ে... নতুন পরিচয় নিয়ে। সে-আমলে জার্মান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্যানশন চলছিল পূর্ণোদ্যমে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট এত ঘন ঘন বদলাত যে, ঠিকমত ট্র্যাক রাখতে পারত না কেউ। পরিস্থিতি ভারাকিনের অনুকূলে ছিল।'

'এক মিনিট,' বলে উঠলেন শেভচেঙ্কো, খতিয়ানের একটা অংশে চোখ আটকে গেছে তাঁর। 'এই তো প্রিন্সের মারা যাবার বিবরণ! স্যরি, কুয়াশা, তোমার থিয়োরি আর বিশ্বাসযোগ্য থাকছে না।'

বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল কুয়াশা। হ্যাঁ, বিবরণই বটে... রাশান বিপ্লব শেষে বউ, দুই ছেলে আর এক মেয়ে-সহ প্রিন্স ভারাকিনের নিহত হবার বিবরণ। স্লোভিয়াঙ্কা নদীর তীরে, ভারাকিনদের ব্যক্তিগত এস্টেটে হামলা করেছিল উন্মত্ত জনতা। বাড়ির ভিতরে আটকা পড়ে প্রিন্স ভারাকিন আর তার পরিবার। আত্মসমর্পণের প্রস্তাব মেনে না নিয়ে চাকর-বাকরদেরকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে। তারপর শুরু করে লড়াই। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় জনতা, সে-আগুনে পুড়ে মরে সবাই। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা কঙ্কালের মাধ্যমে মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

'এটা মানতে পারছি না আমি,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'মরেনি ভারাকিন... এই রেকর্ড ভুয়া।'

'তোমার এ-ধারণা ভুল, কুয়াশা,' নরম গলায় বললেন শেভচেঙ্কো। 'এটা সরকারি আর্কাইভ। প্রতিটি তথ্য অনেক যাচাই-বাছাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

'সরকারি রেকর্ড জাল করাই বরং সহজ,' কুয়াশা বলল। 'আমি অস্বীকার করছি না, ভারাকিনদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল; কিন্তু ওরা যে মারা গিয়েছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছিল... সেটা যে-কারুরই হতে পারে। আমার তো মনে হয়, সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য নাটক করা হয়েছিল ওখানে।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

'লেখাটা ভাল করে পড়ুন। লক্ষ করেছেন, সবকিছু কেমন ভাসা ভাসা ভঙ্গিতে লেখা?' পাতা উল্টে খতিয়ানের পিছনদিকে গেল কুয়াশা। 'এই যে... এখানে আরেকজন উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকের মৃত্যুর বিবরণ আছে। এটার সঙ্গে মেলান। প্রতিটা বর্ণনা নিখুঁত। কখন কী ঘটেছিল, কতজন লোক গিয়েছিল, কার নেতৃত্বে... কার আদেশে গিয়েছিল, কতগুলো গুলি করা হয়েছে—কোনও কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। আগের বইগুলোতেও একই কায়দা লক্ষ করেছি আমি। অথচ ভারাকিনের অংশটাতে একটাও খুঁটিনাটি নেই। পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন? আসলে ঘটেইনি যে-ঘটনা, সেটার খুঁটিনাটি আসবে কোত্থেকে?'

নাকের উপর চশমাটা ভাল করে বসালেন শেভচেঙ্কো। গম্ভীর হয়ে মেলালেন দুটো এন্ট্রি-ই। চেহারা বদলে গেল তাঁর। বললেন, 'বোধহয় ঠিকই ধরেছ। গোলমাল আছে এতে।'

'শুধু গোলমাল না, মহা-গোলমাল,' বইটা বন্ধ করল কুয়াশা। 'ভারাকিন পরিবারের কিচ্ছু হয়নি সেদিন। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে ওরা।'

লাইব্রেরিয়ানের অফিসে ফিরে এল ওরা। কুয়াশার কথামত আবার একবার কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের অফিসে ফোন করলেন শেভচেঙ্কো। গলায় কৃত্রিম রাগ ফুটিয়ে ডিউটি অফিসারকে বললেন, 'কমপ্লেইন জানাবার জন্য ফোন করেছি আমি। তখন আপনাকে বলে দিলাম, আর্কাইভের কাজ শেষ করতে সময় লাগবে... চাবি যিনি আনবেন, তিনি যেন একটু দেরি করেন এখানে... অথচ কী ঘটেছে, জানেন? কাজের হাত থেকে বাঁচার জন্য চাবিটা আমার দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন উনি, দেখা না করেই কেটে পড়েছেন! এ-ধরনের আচরণ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না! অফিশিয়ালি কমপ্লেইন পাঠাব আমি... আর হ্যাঁ, দয়া করে চাবিটা নিয়ে যাবার জন্য পাঠান কাউকে!'

ওপাশের লোকটাকে কথা বলবার সুযোগ দিলেন না তিনি, রাগী ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। তারপর কুয়াশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হলো অভিনয়?'

'চমৎকার... পুরস্কার পাবার মত,' হাসল কুয়াশা। 'এখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না আপনাকে। পিঠ বাঁচল আপনার।'

'লাশটা?'

'ফার্নেসের পিছনে ফেলে দিয়ে আসব। আপনি ওটার ব্যাপারে কিচ্ছু জানেন না... লোকটাকে দেখেনই-নি কখনও। টিভিটাও লুকিয়ে ফেলুন আশপাশের কোনও স্টোররুমে। ক্লিয়ার? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে আকাশ থেকে পড়বেন।'

'কিন্তু কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের লোকেরা তো লাশটাকে চিনবে!'

'উঁহু। কী বললাম আপনাকে? এ-লোক চাবি নিয়ে আসেনি ওখান থেকে। অন্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে ওরা—চাবি ফেরত

পেয়েছে, কিন্তু মানুষটা কোথায়? ফার্নেসের পিছনে পাওয়া লাশের সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগবে ওদের।'

'আর ফেনিস? ওদের লোকও তো ফিরছে না। ওরা চিন্তায় পড়বে না?'

'পড়বে, তবে এখুনি না। ওদের খুনি ব্যর্থ না সফল হয়েছে, সে-রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় থাকবে। যা-ই ঘটুক। বেশ কিছুটা সময় পাচ্ছি আমরা... সেটাই চাই।'

'কেন?'

'জার্মানিতে যেতে হবে আমাকে। এসেন-এ।'

'স্রেফ অনুমানের উপর ভিত্তি করে এগোতে চাইছ তুমি।'

'অনুমান না, স্যর। ক্যালকুলেটেড স্টেপ বলতে পারেন। আর্কাইভের রেকর্ডে যাদের নাম আমরা দেখেছি, তার মধ্যে দুটো নাম আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। শট আর বোলেনহলবাখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দেশ থেকে মুদ্রা পাচারের অভিযোগ ওঠে ফ্রেডরিখ শটের নামে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে খুন হয় সে, খুনিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনাটার মধ্যে ফেনিসের গন্ধ পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে শটের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল ওরা, যাতে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কোনও গোমর ফাঁস না হয়। আর বোলেনহলবাখ... ক্রুপ পরিবারের শেষ বংশধরকে বিয়ে করেছিল সে, ওদের অস্ত্র-ব্যবসার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। এদের পক্ষে ভারাকিনকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।'

'ষাট-সত্তর বছরের পুরনো ভূতকে তাড়া করছ তুমি।'

'দেখা যাক ভূতটার ছায়া এখনও আছে কি না। এনিওয়ে, আর কোনও প্রমাণ চান আপনি?'

'না, আমি কনভিন্সড। কিন্তু তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছে,

কুয়াশা। যাদের পিছনে লেগেছ, তারা সহজ পাত্র না। রীতিমত সুইসাইড-স্কোয়াড পাঠিয়েছে ওরা তোমার পিছনে... সংগঠনের পরিচয় লুকানোর জন্য খুনিরা আত্মহত্যা করছে! এ তো ফ্যানাটিসিজম!'

'ফ্যানাটিক-ই এরা... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ফ্যানাটিক। তার দর্শন আর আদর্শ এদের ধর্ম। এই ফ্যানাটিকদেরকে ঠেকাতে না পারলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।'

'সেটার জন্যই কাজ করছ তুমি, তাই না?' অন্যচোখে কুয়াশার দিকে তাকালেন শেভচেঙ্কো। 'এতদিনে আমি তোমার সত্যিকার রূপ দেখছি, কুয়াশা। সমাজ তোমাকে অপরাধীর খেতাব দিয়ে কতবড় ভুল করছে, তা-ও বুঝতে পারছি। দুঃখিত... আমিও ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। এগিয়ে যাও তুমি, আমার আশীর্বাদ থাকবে তোমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'এসেনে যাবে কীভাবে?'

'হেলসিঙ্কি হয়ে।'

'বর্ডারে সমস্যা হবে না?'

'উঁহুঁ। আমাকে সাহায্য করবার লোক আছে।'

'রওনা হবে কখন?'

'কাল সকালে?'

'রাতটা চাইলে আমার বাড়িতে কাটাতে পারো।'

'না, তাতে আপনার বিপদ হতে পারে।'

ভুরু কোঁচকালেন শেভচেঙ্কো। 'কিন্তু টেলিফোনে আমার অভিনয় দেখে তুমিই তো বললে, লোকের সন্দেহ দূর করে দিতে পেরেছি।'

'আমার তা-ই বিশ্বাস,' বলল কুয়াশা। 'অন্তত আগামী কিছুদিন

আপনাকে বিরক্ত করবে না কেউ। এরপরে হয়তো নিখোঁজ চাবিঅলাকে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে, কিন্তু ততদিনে সমস্ত ক্লু ঝাপসা হয়ে আসবে।'

'তা হলে?'

'আমার হিসেবে ভুলও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরণ ডেকে এনেছি আপনার। দুঃখিত, আর কারও কাছে তথ্য পাবার উপায় ছিল না আমার।'

'থাক, ওভাবে বলতে হবে না,' হাসলেন শেভচেঙ্কো। 'বয়স কম হয়নি আমার, ক'দিন-ই বা আর বাঁচব? মরার আগে দু'একটা ভাল কাজ করে যেতে চাই। তাতে যদি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়, আপত্তি নেই। যাও এখন, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল কুয়াশা। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল লাইব্রেরি থেকে।

ফোনবুথ থেকে সিমকিনের মোবাইলে ফোন করল কুয়াশা। জানতে চাইল, 'কোথায় তুমি?'

'তোমার কথামত একটা হোটেলে উঠেছি,' বলল রাশান পুলিশ অফিসার। 'এখুনি আবার বেরুতে হবে নাকি? আমার কিন্তু শরীর আর চলছে না। সারাদিনে এক ফোঁটা বিশ্রাম পাইনি, একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

'ঘুমাও, কোনও অসুবিধে নেই। আমার মেসেজের কী হলো?'

'অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। চাইলে হেলসিঙ্কিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

'প্রয়োজন হলে নেব। আর হ্যাঁ, লেনিনগ্রাদে আমার কাজ শেষ, কাল ভোরে হেলসিঙ্কিতে ফিরব। তুমি আমাকে বর্ডারে পৌঁছে দেবে। ভোর চারটের সময় আনিচভ ব্রিজের কাছে থেকো, ওখানে

পাবে আমাকে।'

'আবার!' প্রায় হাহাকার করে উঠল সিমকিন। 'কম তো করিনি তোমার জন্য, এখন একটু রেহাই দাও আমাকে!'

'রেহাই তো দিচ্ছিই! বর্ডারে পৌঁছুনোর পর... বাকি জীবনের জন্য! সুসংবাদ, কাজটা ঠিকমত করে দিলে তোমার গোমর ফাঁস হবে না আমার কাছ থেকে।'

'তোমার মুখ বন্ধ করানোর আরও তরিকা জানা আছে আমার,' ফুঁসে উঠল সিমকিন। কুয়াশার ব্ল্যাকমেইলিং তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'ভাবছ গুলি করবে আমাকে?' হাসল কুয়াশা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারবে—মুখ তো বন্ধ করবেই, তারপর আবার আমার লাশ দেখিয়ে বাহবা কুড়াবে সবার? আমাকে শিকার করা অত সহজ নয়, বন্ধু।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল সিমকিন। 'অমন কিছুই ভাবছি না আমি।'

'গুড। তা হলে চারটেয় জায়গামত থেকো।'

'অত ভোরে গাড়ি নিয়ে বের হলে যদি টহল-পুলিশ আটকায় আমাকে? কী জবাব দেব?'

'আই.ডি. দেখালেই ছেড়ে দেবে ওরা। টেনশনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, সিমকিন। নিজেই যে পুলিশ অফিসার, সে-কথা ভুলে গেছ। ঘুম দাও একটা, জেগে ওঠার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। বিদায়।'

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর ট্যাক্সি নিয়ে পুরনো হাউজিং ডিস্ট্রিক্টে গেল কুয়াশা। সরাসরি নাতালিয়ার বিল্ডিঙে ঢুকল না, চার বিল্ডিং পরের স্টেয়ারকেসের দিকে এগোল। দুপুরেও এটা দিয়েই

বেরিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকাল নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের দিকে। জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে, তারমানে ডিউটি থেকে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

ধীরে-সুস্থে সিঁড়ি ভাঙল কুয়াশা, যেন সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় ক্লান্ত একজন মানুষ বাড়ি ফিরছে। বিল্ডিঙের সদর দরজা খুলে ফয়েই-এ ঢোকার পর ক্ষান্ত দিল অভিনয়। চকিতে দেখে নিল আশপাশ, তারপর সেলারের দিকে পা বাড়াল। নীচে নেমে একটা দেশলাই জ্বালল, চোখ বোলাল সেলারের পিছনের কোনায়... চমকে উঠল পরমুহূর্তে।

লাশটা নেই! এখানেই ইংরেজ লোকটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল ও—সারা গায়ে ঢেলে দিয়েছিল ভদকা, ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছিল দু'হাতের শিরা। অথচ এখন সে-সবের কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে পরখ করল জায়গাটা—এক ফোঁটা রক্তও নেই মেঝেতে। নিখুঁতভাবে সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে।

শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল কুয়াশার। কিছু একটা ঘটে গেছে ওর অনুপস্থিতিতে... ভয়ানক কিছু! ভুল করেছে ও... মহা-ভুল! ভেবেছিল একবার ব্যর্থ হবার পর আর কাউকে পাঠানো হবে না এখানে... তাতে দ্বিতীয়জনের ফাঁদে পড়ার ভয় থাকে। কিন্তু ওর ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আবার লোক পাঠিয়েছে ফেনিস। আর তার অর্থ...

নাতালিয়া!

চরম অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল কুয়াশার বুক। সেলারের কানেক্টিং প্যাসেজ ধরে ছুটতে শুরু করল ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল নাতালিয়ার বিল্ডিঙে। বেজমেন্টের সিঁড়ি ধরে দ্রুত উঠে এল নীচতলার ফয়েই-এ।

হাসির শব্দ ভেসে আসছে সামনে থেকে—একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। ছায়ার মাঝে শরীর লুকিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল ও। অল্পবয়েসী একজোড়া তরুণ-তরুণী উঠছে সিঁড়ি ধরে, ঠাট্টা মশকরা করছে পরস্পরের সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত ওদেরকে নিরীখ করল কুয়াশা, তারপর উঠে এল পিছনে। পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলেছে কোটের পকেটে।

'কিছু মনে কোরো না,' চোস্ত রাশানে বলে উঠল ও। 'আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

থেমে গেল তরুণ-তরুণী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওকে। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, আঙ্কেল?'

'আমার গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে একটু সমস্যায় পড়েছি,' বিব্রত চেহারা বানিয়ে বলল কুয়াশা। 'কিরভ থিয়েটারে আজ সন্ধ্যায় অপেরা দেখতে যাবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। ভীষণ খেপে গেছে ও। ফোন-টোন ধরছে না। মাফ চাইতে এসেছি, কিন্তু আমার গলা শুনলে হয়তো দরজাই খুলবে না। তোমরা আমার হয়ে একটু নক করে দেবে দরজায়?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকি হাসল তরুণ-তরুণী। তারপর ছেলেটা বলল, 'ক'তলায় থাকে আপনার বান্ধবী?'

'তিনতলায়। চলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তরুণ-তরুণীকে নাতালিয়ার ফ্ল্যাটের সামনে নিয়ে গেল কুয়াশা। দরজা দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল দেয়ালের আড়ালে। ঠোঁটের সামনে আঙুল তুলে ইশারা দিল ওদেরকে। মাথা ঝাঁকিয়ে পাল্লায় করাঘাত করল ছেলেটা। পকেটে হাত ঢোকাল কুয়াশা।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে। কুয়াশার দিকে তাকাল তরুণ। ইশারা পেয়ে আবার করাঘাত করল—এবার

আগের চেয়ে জোরে। ফলাফল একই।

'মনে হচ্ছে বাসায় কেউ নেই,' বলল ছেলেটা।

'আপনাকে ছাড়াই অপেরা দেখতে চলে গেছে হয়তো,' ঠাট্টা করল মেয়েটা, 'নতুন কোনও বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে!'

রসিকতায় হাসার চেষ্টা করল কুয়াশা, কিন্তু পারল না। খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, দরজার ওপাশে কী অপেক্ষা করছে।

'আমি অপেক্ষা করব,' বলল ও। 'কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত। তোমাদেরকে ধন্যবাদ।'

ওর কণ্ঠে বোধহয় কিছু একটা মিশে ছিল, তা থেকে তরুণী বুঝতে পারল, ঠাট্টা করা উচিত হয়নি। তাই লজ্জিত গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'আমি কিছু মনে করিনি।'

'শুভকামনা রইল আপনার জন্য,' বলল তরুণ। সঙ্গিনীকে নিয়ে উপরতলায় চলে গেল।

উপরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা পর্যন্ত স্থির রইল কুয়াশা, তারপর নড়ল। পকেট থেকে বের করে আনল পিস্তল, সাবধানে হাত রাখল নাতালিয়ার দরজার নবে, আস্তে মোচড় দিল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল, দরজা যেন তালাবদ্ধ থাকে; কিন্তু সে-প্রার্থনা কবুল হলো না। নব মোচড়াতেই মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল পাল্লা।

ভিতরে পা রাখতেই চোখে পড়ল তাণ্ডবের দৃশ্য। সামনের কামরা পুরো তছনছ করে ফেলা হয়েছে। ভেঙেচুরে ফেলা হয়েছে আসবাবপত্র—সোফার কুশন ছিঁড়ে তুলো বের করা হয়েছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে কার্পেট, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সবক'টা পেইন্টিং আর ছবির ফ্রেম। কাবার্ডের দরজা কব্জাসহ খুলে ফেলা হয়েছে। দেরাজগুলো খোলা, ভিতরের সব জিনিস মেঝেতে

গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যাপারটাকে ডাকাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা আর কী। কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে প্রতিপক্ষ, এতটা না করলেও চলত। অভিজ্ঞ চোখে কুয়াশা বুঝল, ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

সামনের কামরার ধ্বংসস্তূপ মাড়িয়ে বেডরুমের দিকে এগোল ও। দরজা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল... অপ্রত্যাশিত কিছু দেখছে না, তারপরেও বুক কেঁপে উঠল।

বিছানার উপর পড়ে আছে নাতালিয়া সিমোনোভার নিষ্প্রাণ দেহ। উদোম... গা থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে সমস্ত কাপড়। পড়ে থাকার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে—মারা যাবার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে ওকে। দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়, কুকীর্তিটা স্যাডিস্ট কোনও ডাকাতের বলে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য। পুরো মুখে কালসিটে পড়েছে নাতালিয়ার, ফুলে আছে রক্তাক্ত ঠোঁট, চোখদুটো বুজে গেছে। বিছানা আর মেঝেতে পড়ে আছে কয়েকটা ভাঙা দাঁত। নাকের ফুটো আর ঠোঁটের কোনা দিয়ে নেমে আসা রক্তে ভিজে গেছে বিছানার একটা অংশ।

মুখ ফিরিয়ে নিল কুয়াশা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁট। তীব্র ক্রোধে ভরে উঠেছে অন্তরাত্মা। প্রতিশোধ নিতে হবে ওকে... ভয়ানক প্রতিশোধ। মনে মনে শপথ নিল ও, তারপর আবার তাকাল নাতালিয়ার দিকে। অব্যক্ত এক বেদনায় বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে ওর। নির্যাতনের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে, চরম ইন্টারোগেশনের মাঝেও মুখ খোলেনি মেয়েটা। বলে দেয়নি, কোথায় পাওয়া যাবে কুয়াশাকে। যদি বলেই দিত, তা হলে সল্টিকভ-শেদ্রিন লাইব্রেরিতে মাত্র একজন খুনি হাজির হতো না; দলবল নিয়ে আসত ওকে হত্যা করবার জন্য।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই আঁতকে উঠল কুয়াশা। নাতালিয়ার

ফ্ল্যাটে দ্বিতীয়বার লোক পাঠানো হয়েছে, তা হলে আইভান শেভচেঙ্কোর কাছেও কি পাঠানো হবে না? বিছানার পাশে, সাইড-টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছে নাতালিয়ার টেলিফোন; ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল ও, কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করল শেভচেঙ্কোর নাম্বারে। এই লাইনে আড়ি পাতা হয়েছে কি না কে জানে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানকে এখুনি সতর্ক করে দিতে হবে।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরই রিসিভ করা হলো কল। ওপাশ থেকে খসখসে একটা কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো?'

লাইব্রেরিয়ানের কণ্ঠ নয় ওটা। কুয়াশা বলল, 'মি. শেভচেঙ্কোকে দিন, প্লিজ।'

'কে বলছেন?'

'আমি ওঁর কলিগ—আন্তন রুদিনেস্কি। সন্ধ্যায় শুনেছিলাম শরীর ভাল না ওঁর। ডাক্তার পাঠাব কি না জানা দরকার।'

'ভাল আছেন উনি,' কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জানানো হলো।

'তা হলে কথা বলতে দিন ওঁর সঙ্গে। একটা বই চেয়েছিলেন আমার কাছে... ওটা পাওয়া গেছে। খবরটা জানাতে চাই ওঁকে।'

নীরবতা।

'হ্যালো?' একটু পর শেভচেঙ্কোর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল ইয়ারপিসে। তাঁকে ফোন ধরতে দিয়েছে লোকটা, সম্ভবত পরিস্থিতি স্বাভাবিক বোঝানোর জন্যই।

'আপনি ঠিক আছেন, স্যর? কে ধরেছে ফোন—শত্রু, নাকি মিত্র? ইশারায় বলুন আমাকে।'

ইশারা করতে গেলেন না শেভচেঙ্কো। তার বদলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পালাও, কুয়াশা! এখুনি পালাও!! ওরা...'

কথা শেষ হলো না বৃদ্ধের, তার আগেই কানে তালা লাগানো

একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল ইয়ারপিসে। গুলির আওয়াজ! পরমুহূর্তে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে মূর্তির মত বসে রইল কুয়াশা। খুন করেছে... ওর প্রিয় দু'জন মানুষকে খুন করেছে ফেনিস। বিনা অপরাধে! শুধুমাত্র ওকে সাহায্য করবার জন্যে! উপলব্ধিটা আসতেই রাগে অন্ধ হয়ে গেল ও, পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল টেলিফোনটা। একটা শব্দই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ!!

প্রতিশোধ!!!

নাতালিয়ার শরীর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল কুয়াশা, তারপর বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। রাস্তায় নেমে একটা ফোনবুদ খুঁজে নিল, রিং করল সিমকিনকে। সময় নষ্ট করা চলবে না, যত দ্রুত সম্ভব ভাইনিকালা পৌঁছুতে হবে ওকে। সেখান থেকে হেলসিঙ্কি, তারপর এসেন। ভারাকিনের সূত্র ধরে ফেনিসের মাথাগুলোকে খুঁজে বের করবে ও, নিজ হাতে খুন করবে মানুষরূপী ওই পিশাচদের।

'ইয়েস?' ঘুমজড়িত গলায় ফোন রিসিভ করল সিমকিন।

'এখুনি বেরিয়ে পড়ো,' নির্দেশ দিল কুয়াশা। 'রেল স্টেশনে আসতে হবে তোমাকে। প্রথম এণ্ট্রান্সের সামনে অপেক্ষা করব আমি।'

'এখন?' বিরক্ত গলায় বলল সিমকিন। ঘড়ি দেখল বোধহয়। 'একটাও তো বাজেনি। তুমি না বলেছিলে...'

'কী বলেছি ভুলে যাও। যা বলছি, সেটা শোনো। বর্ডারের ওপাশে একটা গাড়ি ম্যানেজ করতে পারবে? যা টাকা লাগে দেব।'

'দেখি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে।'

'কথা পেঁচিয়ো না। পারবে কি না বলো।'

ধমক খেয়ে সিধে হয়ে গেল সিমকিন। 'পারব। তবে কয়েকটা ফোন করতে হবে আমাকে। পনেরো মিনিট সময় দাও।'

'যত খুশি সময় নাও, কিন্তু আধঘণ্টা পর রেল স্টেশনে তোমাকে দেখতে চাই আমি।'

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর সিমকিনের পোবেদা ছুটল রাশা-ফিনল্যাণ্ড সীমান্তের পথে।

নয়

ব্যগ্র ভক্তদের ভিড় ঠেলে একজন চিত্রতারকা যেভাবে এগিয়ে যায়, সাদা থোকা থোকা মেঘগুলোকে ঠিক সেভাবেই সরিয়ে উঁচু আসমান দিয়ে উড়ছে *ফিন-এয়ারের সেভেন ফোর সেভেন* বোয়িং। স্টারবোর্ড সাইডে, বিমানের সামনের দিকে, প্যাসেজের ধারে একটা সিট, বিজনেস ক্লাস। খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে, একদিকে একটু কাত হয়ে তাতে বসে আছে একজন মানুষ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। কিন্তু আধবোজা চোখ আর শিথিল পেশির আড়ালে সদা-সতর্ক রয়েছে মগজ, শরীরটা রয়েছে একটা বিপজ্জনক ভঙ্গি নিয়ে, পেঁচানো স্প্রিঙের মত, মুহূর্তের নোটিসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

ছদ্মবেশী এই মানুষটি আসলে কুয়াশা, আকাশপথে জার্মানিতে

চলেছে। লেনিনগ্রাদের ফ্ল্যাটে নাতালিয়ার মৃতদেহ আবিষ্কার করবার পর কেটে গেছে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ছক কেটেছে ও, জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছে নাতালিয়া আর শেভচেঙ্কোর পরিণতির কথা। বিচারবুদ্ধিহীন আবেগ কোনও কাজে আসবে না ওর। শত্রুপক্ষের মত নির্দয়, শীতল আর হিসেবি হতে হবে ওকে। তা হলেই প্রতিশোধ নিতে পারবে প্রিয় ওই মানুষদুটির হত্যাকাণ্ডের।

এসেন নিয়ে ভাবছে কুয়াশা। কোত্থেকে তদন্ত শুরু করবে ওখানে? বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান ঠিক বলেছিলেন... ষাট-সত্তর বছরের পুরনো ভূত খুঁজে বেড়াচ্ছে ও—চরম বিশৃঙ্খলাময় একটা সময়ে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ এবং তার পরিবারকে। ওই আমলের আদৌ কোনও নথিপত্র আছে কি না সন্দেহ; থাকলেও সেগুলো হাতে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ধরে নেয়া যাক পাওয়াও গেল, তারপর? অত পুরনো সূত্র ট্র্যাক করতে যে-পরিমাণ সময় এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সাহায্য প্রয়োজন ওর। কিন্তু জার্মানির এসেন শহরে ঘনিষ্ঠ কেউ-ই নেই কুয়াশার। একদিক থেকে ভাল সেটা—নাতালিয়া বা শেভচেঙ্কোর মত প্রিয় কারও মৃত্যু দেখতে হবে না ওকে। শত্রুপক্ষও পুরনো কোনও বন্ধুর সূত্র ধরে ওকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু কথা হলো, অমন কোনও বন্ধু না থাকলে কে সাহায্য করবে ওকে?

ভালমত ভাবল কুয়াশা, এসেনে ইতিপূর্বেও এসেছে ও, সে-সময়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে কার কাছে যাওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাইনরিখ বোহ্ল-এর কথা। পেশায় পেটেন্ট অ্যাটর্নি... মানে উকিল, একবার তার মাধ্যমে

নিজের কয়েকটা আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার চেষ্টা করেছিল ও জার্মানিতে। সফল হয়নি, সরকারি ভেরিফিকেশনের সময় নিজের পরিচয় ফাঁস হতে বসেছিল। তবে স্বল্প সময়ের ওই পরিচয়ে বোহ্‌ল-কে ভাল লেগেছিল ওর। সৎ এবং বুদ্ধিমান মানুষ, ওকালতি প্যাঁচ নেই তার মধ্যে। লোকটাকে নিয়ে ভালমত চিন্তা করে দেখল কুয়াশা—হ্যাঁ, কাজে লাগানো যেতে পারে তাকে। প্রিন্স ভারাকিন যদি আইনসঙ্গতভাবে নামধাম পাল্টে থাকে... যদিও তার সম্ভাবনা কম... তা হলে আদালতে যেতে হয়েছে তাকে। সে-সবের রেকর্ড খোঁজার জন্য উকিল-ই দরকার।

অবশ্য এ-পন্থা অনিশ্চয়তায় ভরা। মনে মনে সেটা স্বীকার করল কুয়াশা। অনেককিছুই নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর—আদৌ আদালতে গিয়েছিল কি না ভারাকিন, এখনও সে-আমলের রেকর্ড আছে কি না, থাকলে তা উদ্ধার করা যাবে কি না... ইত্যাদি। তবে আর কোনও পথও দেখতে পাচ্ছে না ও। অন্তত একটা কিছু ধরে তো শুরু করতে হবে ওকে!

এসেন, জার্মানি।

মানুষটি চল্লিশোর্ধ, সুঠামদেহী। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় একটা উলের ট্রাউজার পরেছে, উপরে রয়েছে নীল রঙের সোয়েট-শার্ট জগিং করতে করতে একটা বাঁক ঘুরল সে, ঢুকে পড়ল মিউনিসিপ্যাল পার্কের ভিতরে। ঘাসে ঢাকা জমিন পেরিয়ে নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়েতে উঠল, গতি বাড়িয়ে ছুটতে থাকল পার্কের ভিতরদিকে। দৌড়ের মাঝে আশপাশে নজর বোলাচ্ছে সে, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল লেকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছায়ামূর্তিকে দেখে। সময়টা সাতসকাল হলেও পার্কে স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষের অভাব নেই, সবাই কোনও না কোনও শারীরিক ব্যায়াম করছে;

তাদের মাঝে ছড়িতে ভর দেয়া একজন পঙ্গু মানুষ খুবই বেমানান। দূর থেকে চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা কেন যেন খুব চেনা চেনা ঠেকছে।

কৌতূহল এড়াতে পারল না মানুষটা, দিক পাল্টে লেকের পাড়ে ছুটল। কাছাকাছি যেতেই বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়, থেমে দাঁড়াল ছড়িঅলার কয়েক হাত তফাতে।

'ভুল দেখছি না তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'কুয়াশা... সত্যি তুমিই তো?'

'হ্যালো, হাইনরিখ,' হাসল কুয়াশা। 'এখনও দেখছি তুমি আগের মতই স্বাস্থ্য-সচেতন।'

'তুমিও বদলাওনি,' বলল হাইনরিখ বোহ্‌ল। 'যখন-তখন মানুষকে চমকে দেবার অভ্যাস রয়ে গেছে। এখানে নিশ্চয়ই আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলে?'

'দেখতে চাইছিলাম, তুমি এখনও আগের রুটেই জগিং করো কি না।'

'কথা ঘোরানোর দরকার নেই। কী কাজে এসেছ বলে ফেলো। আবারও পেটেন্টের আবেদন করতে চাও?'

'উঁহুঁ। অন্য একটা ব্যাপার।'

'শুনে দুঃখ পেলাম। চমৎকার কিছু আবিষ্কার আছে তোমার। ওগুলো প্রকাশ করা গেলে বহু লোকের উপকার হতো। এনিওয়ে, কাজটা কী?'

'খুলে বলতে সময় লাগবে। চাইলে জগিং শেষ করে আসতে পারো। আমার হিসেবে আরও দু'মাইল দৌড়ানোর কথা তোমার।'

'ধ্যাত্তেরি... রাখো তোমার জগিং! এতদিন পরে হাজির হয়েছ, নিশ্চয়ই ইম্পরট্যান্ট কোনও ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, তোমার সাহায্য দরকার আমার। চলো কোথাও বসি।'

লেকের ধারে একটা নির্জন বেঞ্চে বসল দু'জন।

কুয়াশা বলল, 'একজন মানুষকে খুঁজছি আমি। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে, পরিবার-সহ রাশা থেকে জার্মানিতে এসেছিল সে। এই এসেনে। আমার বিশ্বাস, এখানকার আর্মামেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়েছে সে।'

মুখ বাঁকাল বোহ্ল। 'খামোকা সময় নষ্ট করছ। ষাট-সত্তর বছর আগে... তখন এ-দেশের অবস্থা কী ছিল, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে তোমার?'

'হুম। পুরো ইয়োরোপ তখন জ্বলছিল আগুনে। অস্থির এক সময় ছিল সেটা।'

'ঠিক। রাশায় চলছিল আন্দোলন, ইয়োরোপ-জুড়ে যুদ্ধের দামামা। তার মাঝে এসেনে ঘটছিল অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক বিপ্লব। রোজই সম্পদের পাহাড় গড়ছিল লোকে, কিংবা হারাচ্ছিল সর্বস্ব। সে-সব কাহিনি গোপন রাখা হয়েছে। আর তার মাঝখানে বিশেষ একজনকে খুঁজে পেতে চাইছ তুমি? সুযোগসন্ধানী এক রাশান... যে কিনা অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফায়দা লোটার জন্য এসেছিল?'

'তুমি এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলেই ভেবেছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

'আর কী-ই বা আশা করতে পারো?' হাসল বোহ্ল। 'কে ওই লোক? নাম কী?'

'ওটা এখুনি বলতে চাইছি না।'

'তা হলে সাহায্য করব কীভাবে?'

'পরামর্শ দিয়ে। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কোথায় খোঁজ নিতে?'

'রাশায়।'

'ওখান থেকে ঘুরে এসেছি আমি। সরকারি আর্কাইভ ঘেঁটে

দেখেছি।'

'কিছুই পাওনি?'

'ঠিক তার উল্টো। ওখানে পুরো পরিবারের মারা যাবার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা—ওটা মিথ্যে।'

'এ-কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'ঘটনার বিবরণ পড়ে। ওদের এস্টেটে হামলা করেছিল বলশেভিক-রা। দিনভর লড়াই করে পুরো পরিবার, তারপর বাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ায় পুড়ে মরে।'

'খেপা বলশেভিক মব-কে পুরো একটা দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল অল্প ক'জন মানুষ? ঠিকই বলেছ, বিশ্বাসযোগ্য নয় ঘটনাটা।'

'বর্ণনার মধ্যেও গোলমাল দেখেছি। আবহাওয়ার কথা লেখা আছে, বিশাল এস্টেটের প্রতিটা ইঞ্চির বিবরণ পর্যন্ত দেয়া আছে... অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটাও পাইনি ওখানে। একজন সাক্ষীরও নাম নেই, যারা কনফার্ম করতে পারত ঘটনাটা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল বোহ্লের। 'কী বললে? এস্টেটের প্রতিটা ইঞ্চির বিবরণ?'

'হুঁ। কেন... খটকা লাগছে তোমার?'

'তা তো লাগছেই। আচ্ছা, পরিবারের সদস্যদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কীভাবে লেখা হয়েছে? ওর ভিতর কি লেখকের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে?'

ভেবে দেখল কুয়াশা। 'না, বরং ওদের মহত্ত্ব আর সাহসিকতার গল্প লেখা হয়েছে ওখানে। লড়াই শুরু হবার আগে চাকর-বাকরদের বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে, ওরা যাতে মারা না পড়ে। লড়াইও করেছে বীরের মত,.. আমৃত্যু লড়াই!'

'বিপ্লব-পরবর্তী রেকর্ডে একটা অভিজাত পরিবারের ব্যাপারে এ-ধরনের বর্ণনা একটু অস্বাভাবিক না?'

'তা-ই মনে হয় তোমার?'

'আমার ধারণা, বিবরণটা ওই পরিবারেরই কেউ লিখেছে; তারপর কাউকে ঘুষ খাইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর্কাইভে। ব্যাপারটা সিম্পল হিউম্যান নেচার বলতে পারো—নিজেকে কেউ কখনও ছোট করে দেখাতে চায় না। হোক মিথ্যে বিবরণ, তবু সেখানে নিজেকে বীর হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে তোমার ওই লোক... এটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'মানলাম, কিন্তু এতে আমার তো কোনও উপকার হচ্ছে না। রেকর্ড-টা ভুয়া, তা আমি এমনিতেই বুঝতে পেরেছি।'

'হচ্ছে, কুয়াশা, হচ্ছে,' হাসল বোহ্‌ল। 'উকিল হিসেবে বহু মানুষের সাক্ষ্য আর জবানবন্দি হ্যাণ্ডেল করেছি আমি। কী লক্ষ করেছি, জানো? লিখতে বসলেই লোকে সচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যক্তিগত কোনও না কোনও তথ্য দিয়ে ফেলে ওতে। তোমার এই বিশেষ বিবরণটার কথাই ধরা যাক... ওটাতে পুরো এস্টেটের খুঁটিনাটি তুলে দেয়া হয়েছে, তাই না? আমার ধারণা, সম্পত্তি বা জমিজমার বিষয়ে এক ধরনের প্যাশন ছিল লেখকের।'

'বোধহয় ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। শেভচেঙ্কোর কথা মনে পড়ল—অত্যন্ত লোভী স্বভাবের লোক ছিল প্রিন্স ভারাকিন।

'এখানে এসেও ওই প্যাশন মেইনটেন করবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'ভাল সম্ভাবনা আছে। টাকার অভাব ছিল না ওই লোকের। বড়-সড় যে-কোনও সম্পত্তি কিনে নেবার ক্ষমতা ছিল।'

'সেক্ষেত্রে নামটা বলো আমাকে। হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'কীভাবে?'

বেঞ্চে হেলান দিল বোহ্‌ল। 'জমি-জমার সমস্ত রেকর্ড থাকে স্টেট হাউসে। গুজব আছে, লেক বন্ডেনি-র উত্তর পারে রেলিংহাউসেন আর স্ট্যাডওয়াল্ডের বেশ কিছু বড় বড় এস্টেট রাশানরা বহু বছর আগে কিনে নিয়েছিল।'

'নিজ নামে কেনেনি আমার লোক। আমি শিয়োর।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তা ছাড়া... জমি বেচাকেনা যত গোপনেই করা হোক, তা পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়া যায় না। কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যায়।'

'তা হলে সেটা আমিই খুঁজে নেব। ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে ওসব নথি, আমাকে বলে দাও।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না তোমার। সার্টিফায়েড উকিল ছাড়া আর কেউ হাত দিতে পারে না ওখানে। নামটা বলো আমাকে।'

'খোঁজখবর নিতে গেলে বিপদ হতে পারে তোমার!' সতর্ক করল কুয়াশা।

'কী যে বলো না!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বোহ্‌ল। 'সত্তর বছরের পুরনো একটা পারচেজ-রেকর্ড...'

'জমিটা পুরনো, কিন্তু তার সঙ্গে এখনকার লোকজনের সম্পর্ক আছে,' অ্যাটর্নির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কুয়াশা। 'ভয়ানক লোকজন!'

'কতটা ভয়ঙ্কর?'

'চরমপন্থী বললেও কম বলা হয়।'

'টেরোরিস্টদের চেয়েও খারাপ?'

'হাজার গুণ। এর ভিতর নিজেকে জড়ালে ভুল করবে তুমি, হাইনরিখ। তারচেয়ে আমাকে একটা অথোরাইজেশন লেটার লিখে দাও, আমি নিজেই খুঁজে নেব ল্যাণ্ড রেকর্ড।'

মাথা নাড়ল বোহ্‌ল। 'না, তা করছি না। লিগ্যাল কাগজপত্রের

কতটুকু বোঝো তুমি? ওখানে গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। আমাকেই যেতে হবে। তবে চাইলে তুমি আমার সঙ্গী হতে পারো।'

'জেনে-শুনে ঝুঁকি নেবে তুমি?' কুয়াশার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটল। 'কেন?'

'তোমার ঋণ শোধ করবার জন্য,' বলল বোহ্‌ল। 'কীভাবে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, ভুলে গেছ? নিওনাজিদের হাতে পড়েছিলাম আমি, খুন হয়ে যেতে বসেছিলাম... তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে। তার কোনও প্রতিদান দিতে পারিনি। তোমার আবিষ্কারগুলোর পেটেন্ট করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তা-ও পারিনি। কিছু একটা করতেই হবে আমাকে, নইলে শান্তি পাব না।'

'আমি প্রতিদান চাই না, হাইনরিখ,' নরম গলায় বলল কুয়াশা।

'এসব বলে পার পাচ্ছ না। আমি যাব-ই ওখানে, দ্যাটস্ ফাইনাল। নামটা বলো।'

জার্মান অ্যাটর্নির আচরণ দেখে হেসে ফেলল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ভারাকিন।'

সময় ঠিক করে নিয়েছিল ওরা, অফিসের কাজকর্ম সেরে লাঞ্চের পর কুয়াশার সঙ্গে দেখা করল জার্মান অ্যাটর্নি। দুজনে চলে গেল হল্‌ অভ রেকর্ডস্-এ। রিসেপশনে ইউনিফর্ম-পরা এক মেয়ে বসে আছে, সে-ই ওখানকার কেরানি। তার সামনে হাজির হতেই আলাদা সমাদর পেল হাইনরিখ বোহ্‌ল। শহরের সবচেয়ে বড় ফার্মগুলোর একটা তার, সবাই তাকে চেনে। মেয়েটা নিজেই তাকে সাহায্য করবার জন্য আসতে চাইল, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল বোহ্‌ল। কুয়াশাকে দেখিয়ে জানাল, অ্যাসিসটেন্ট নিয়ে এসেছে।

প্রপার্টি রেকর্ডসের বিশাল কামরাটার চারপাশে মূর্তিমান

দানবের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু স্টিলের কেবিনেট। মাঝখানে রয়েছে বেশ কিছু কিউবিকল, সেখানে বসে সার্টিফায়েড লইয়ার-রা রিসার্চের কাজ করে।

'সময়কাল অনুসারে সমস্ত নথি সংরক্ষণ করা হয় এখানে,' জানাল বোহ্ল। 'কবে নাগাদ ভারাকিন এসেনে জমি কিনেছিল বলে মনে হয় তোমার?'

উনিশশো ছত্রিশে গঠিত হয়েছিল ফেনিস কাউন্সিল, মনে পড়ল কুয়াশার। তার পরেই নিশ্চয়ই জার্মানিতে এসেছিল ভারাকিন। অ্যাটর্নিকে বলল সেটা। তারপর যোগ করল, 'তবে নিজ নামে কেনেনি সম্পত্তি... আমি শিয়োর।'

'আসল নাম, বা সম্ভাব্য ছদ্মনাম... কোনোটাই খুঁজব না আমরা। অন্তত শুরুতেই না।'

'ছদ্মনাম নয় কেন? টাকা ছিল তার, ভুয়া নামে কেনাকাটায় কোনও অসুবিধে ছিল না।'

'পরিস্থিতির কারণে। এখনও সে-পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। যত টাকাই থাকুক, পরিবার-সহ একজন মানুষ নতুন কোনও কমিউনিটিতে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সম্পত্তি কিনতে পারে না। তাতে লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভারাকিনের ব্যাপারে যতটুকু শুনেছি তোমার কাছে, তাতে তো মনে হয় না কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল সে। খুব ধীরে... সময় নিয়ে মিথ্যে পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে তাকে।'

'তা হলে কী খুঁজব?'

'মালিকের অনুপস্থিতিতে উকিলের মাধ্যমে কেনাকাটার রেকর্ড। অথবা কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জনস্বার্থে কেনা জমি। কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ছোট কোনও কোম্পানিও কিনে নিতে পারে স্থাবর সম্পত্তিসহ। মালিকানা লুকানোর এমন হাজারটা

কায়দা আছে। তবে একটা সময়ে লুকোচুরি শেষ করতে হয়... যখন মালিক ওই জমির দখল নিতে চায়। এসবের একটা প্যাটার্ন থাকে, দেখলেই চিনতে পারব আমি। এসো, ছত্রিশের মে মাস থেকে শুরু করি। এখানে কোনও সূত্র থাকলে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। এসেনের আশপাশে ত্রিশ-চল্লিশটার বেশি এস্টেট নেই। তার মধ্যে রেলিংহাউসেন আর স্ট্যাডওয়াল্ডে বড়জোর আছে পনেরোটা।'

কেবিনেট থেকে মোটাসোটা কয়েক বাণ্ডিল ফাইল এনে কাজ শুরু করে দিল ওরা। পুরনো, হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে লেনিনগ্রাদে চলে গেল কুয়াশা... মনে পড়ল, ক'দিন আগে ঠিক এভাবে বৃদ্ধ শেভচেঙ্কোর সঙ্গে রাশান আর্কাইভের কাগজ ঘেঁটেছিল ও। বুক টন টন করে উঠল তাঁর কথা ভেবে। আড়চোখে তাকাল হাইনরিখ বোহ্‌লের দিকে। পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেছে জার্মান অ্যাটর্নি, চরম উত্তেজনা নিয়ে পরখ করছে একটার পর একটা এন্ট্রি... যেন খেলনার দোকানে ছাড়া পাওয়া কোনও শিশু। ভয় হলো কুয়াশার, ওর পরিণতিও শেভচেঙ্কোর মত হবে না তো? অবশ্য... বোহ্‌লের সঙ্গে ওর কানেকশনের ব্যাপারে জানা নেই কারও। ফেনিসের ওয়াচলিস্টে তার নাম থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

'এই যে... এটা দেখো,' হঠাৎ বলে উঠল বোহ্‌ল। 'বল্ডেনি ভ্যালির সাঁইত্রিশ একর জায়গা—ভারাকিনের মত লোকের জন্য আদর্শ। রেমস্‌ওয়াল্ড পরিবারের অনাথ, নাবালক বাচ্চাদের জন্য কিনে নিয়েছিল স্টাটস্‌ব্যাঙ্ক অভ ডুইসবার্গ। ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

'রেমস্‌ওয়াল্ড নামটার ব্যাপারে খোঁজ নেব আমরা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'উঁহুঁ, ওটা শুধুমাত্র জমি কেনার সময় ব্যবহার করা হয়েছে। পরে দখল নিয়েছে অন্য কেউ। দু-চার বছর পরের ফাইলে ওই

নাম পাওয়া যাবে। ওটাই দরকার আমাদের।'

'ওটাই তা হলে ভারাকিনের নতুন পরিচয়?'

'এত খুশি হয়ো না,' মাথা নাড়ল বোহ্ল। 'এখানে এ-জাতীয় কেসের বহর দেখতে পাচ্ছি।' আরেকটা দলিল বের করল। 'এই তো... ক্রুপ-দের এক কাজিন রেলিংহাউসেনের বিশাল এক সম্পত্তি দান করে দিয়েছে ডুসেলডর্ফের এক মহিলার নামে—দীর্ঘ ত্রিশ বছর তার পরিবারের সেবা করবার পুরস্কার! বিশ্বাস করতে পারো?'

'একেবারেই কি অসম্ভব?'

'অবশ্যই। পরিবারের বাকি সদস্যরা কিছুতেই এত বড় সম্পত্তি দান করতে দিত না। আমার ধারণা, অজ্ঞাত কোনও ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয়েছে ওটা। দলিলের এই মহিলার হয়তো কোনও অস্তিত্ব নেই, কিংবা থাকলেও ওই ক্রেতার হয়ে কাজ করছে।'

'হুম। তা হলে দুটো কেস পেলাম।'

'আরও পাওয়া যাবে। এসো দেখতে থাকি।'

এগিয়ে চলল কাজ। ১৯৩৬... ৩৭... ৩৮... ৩৯।

আগস্টের বিশ তারিখের একটা রেকর্ডে চোখ পড়তেই থমকে গেল কুয়াশা। একটা নাম। হাইনরিখ বোহ্লের চোখে ওটা গুরুত্বহীন, কিন্তু ওর চোখে নয়। দু'হাজার মাইল দূরে, লেনিনগ্রাদে দেখা আরেকটা নথির কথা মনে পড়ে গেল কুয়াশার—ভারাকিন পরিবারের ইতিহাস... আর তাতে উল্লেখ করা প্রিন্স আন্দ্রেই-এর বন্ধুদের তালিকা। এখানে সে-তালিকারই একটা নাম দেখতে পাচ্ছে।

ফ্রেডরিখ শট্।

'এক মিনিট,' বলল ও। 'কোথায় এটা?'

'স্ট্যাডওয়ান্ড। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নেই এর মধ্যে।

একেবারে আইনসম্মত, পুরোপুরি ক্লিন।'

'সেটাই হয়তো অস্বাভাবিক। এই ফ্রেডরিখ শট্ সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

ভুরু কোঁচকাল বোহ্‌ল। 'যদ্দূর মনে পড়ে, ক্রুপদের হয়ে কাজ করত শট্... বড়-সড় একটা পজিশনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, মুদ্রা পাচারের অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভবত বিচার হয়নি। এসব কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কারণ খুন হয়েছিল শট্... অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে। সেজন্যেই বিচার হয়নি ওর। ভারাকিনের বন্ধু ছিল সে। এস্টেটের কী হয়েছিল? ওটা কি বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল?'

'হবারই কথা। শটের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছিল সরকার। টাকার জন্য সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়া উপায় ছিল না তার বিধবা স্ত্রী-র।'

'শিয়োর হওয়া যায় না?'

'নিশ্চয়ই। কবে খুন হয়েছিল শট, জানা আছে তোমার?'

'বিয়াল্লিশে। চলো ওই ফাইল দেখি।'

'মাঝেরগুলো বাদ দিয়ে যাব?' দ্বিধা ফুটল বোহ্‌লের কণ্ঠে।

'খটকা-টা দূর করে নিই। তারপর না হয় আবার ফিরে আসব।'

আধঘণ্টা লাগল দরকারি ফাইলটা খুঁজে পেতে। ওটায় চোখ বুলিয়ে বোহ্‌ল বলল, 'খামোকাই খেটেছি আমরা। এস্টেট-টা ভরগেন পরিবার কিনে নিয়েছে তেতাল্লিশের মার্চে।'

'ভরগেন? মানে... ক্রুপ-দের প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'সে-আমলে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তবে ওদেরকে সন্দেহ করার কিছু নেই। গত শতাব্দীর শুরুতে মিউনিখ থেকে এসেনে আসে

ভরগেন পরিবার... উনিশশো পনেরো কি ষোলো সালে। সবাই জানে সেটা। ওরা বংশগতভাবে জার্মান, অত্যন্ত সম্মানিত গোটা দেশজুড়ে। নামের শুরুতে *ভি* পাচ্ছ, কিন্তু সেটা ভারাকিনের *ভি* নয়।'

কী কী জানে, তা খতিয়ে দেখল কুয়াশা। এমন সব মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কাউন্ট বারেমি, যারা এককালে প্রভাব-প্রতিপত্তির শীর্ষে ছিল, কিন্তু সব হারাতে বসেছিল নীতিহীন সরকার আর ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে। ভারাকিন পরিবার ওই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল—রাশার রাজ-পরিবারের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের, ফলাফল হিসেবে ওদের সম্পত্তি গ্রাস করে নিচ্ছিল রোমানভ-রা। কাউন্টের ডাক পাবার আগে এ-অবস্থা থেকে বাঁচার কোনও চেষ্টা কি করেনি তারা? গোপনে এমনিতেই হয়তো **দেশত্যাগ করছিল... সরিয়ে নিচ্ছিল** নিজেদের সব সম্পদ...

একটা জিনিস মনে পড়তে চমকে উঠল ও। ভারাকিনদের পারিবারিক প্রতীক! লতা-পাতায় ঘেরা একটা বর্ণ—*ভি!* ওটার আলাদা গুরুত্ব ছিল ওদের কাছে! ওটার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি ওরা, সঙ্গে নিয়ে এসেছে!

ঝট্ করে অ্যাটর্নি বন্ধুর দিকে তাকাল কুয়াশা। উত্তেজিত গলায় বলল, 'মাই গড! হিসেবে ভুল করেছি আমরা! উনিশশো ছত্রিশে নয়, তার বহু আগেই দেশ ছাড়তে শুরু করেছিল ভারাকিন-রা! অন্তত বিশ বছর আগে থেকে! ভেবে দেখো—তুমি নিজেই বলেছ, নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে এগোতে হয়েছে ওদেরকে। দুই দশক সময় নিয়েছে, এরচেয়ে নিখুঁত আর কী হতে পারে? মিউনিখ বা জার্মান শিকড়ের মিথ্যা তথ্যকে লোকের মনে গেঁথে দেবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে ওরা। তা ছাড়া সে-আমলে ইয়োরোপ জুড়ে যে-অস্থিরতা চলছিল, তাতে

ওদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে... খোঁজ নেবার মত কৌতূহলও কখনও জাগায়নি। রাশা থেকে একজন-একজন করে এসেছে এসেনে, আস্তে আস্তে বড় হয়েছে পরিবার—খুব স্বাভাবিক দেখিয়েছে সবকিছু।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোহ্‌লের। 'ভরগেনের বউ!'

'কী হয়েছে বউয়ের?'

'বলা হতো, সে হাঙ্গেরিয়ান... ডেব্রেসেন-এর ধনী এক পরিবারের মেয়ে। জার্মান ভাল বলতে পারত না।'

'তার মানে লেনিনগ্রাদের এক অশিক্ষিত মহিলা ছিল সে, নতুন ভাষা শেখার ক্ষমতা ছিল না। ওর স্বামীর পুরো নাম কী?'

'অ্যানসেল ভরগেন,' স্তম্ভিত গলায় বলল বোহ্‌ল।

'অ্যানসেল?' হাসল কুয়াশা। 'আন্দ্রেই-এর জার্মান প্রতিশব্দ। মানব-চরিত্র নিয়ে জ্ঞান আরও বাড়ল তোমার। শুধু আচার-আচরণ না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাম-ধাম পাল্টানোর সময়ও পুরনো পরিচয়ের মায়া কাটাতে পারে না লোকে।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ। অ্যানসেল ভরগেনই আমাদের আন্দ্রেই ভারাকিন।'

দশ

গিন্ডেনপ্লাৎজ-এর রাস্তা ধরে হাঁটছে কুয়াশা আর বোহ্‌ল। আশপাশের দোকানপাট ঝলমল করছে কৃত্রিম আলোয়, বিল্ডিঙের

মাথায় লাগানো বিলবোর্ডগুলোতে নিয়নবাতি জ্বলছে-নিভছে নির্দিষ্ট ছন্দে। রাত আটটা বাজে, আকাশ অন্ধকার, বইছে হিমেল হাওয়া। হাঁটাহাঁটির আদর্শ পরিবেশ নয়, কিন্তু প্রপার্টি রেকর্ডসের গুদামতুল্য অফিসে ছ'ঘণ্টা কাটাবার পর মুক্ত বাতাস বড়ই ভাল লাগছে ওদের।

নীরবে হাঁটছিল দু'জনে। হঠাৎ বোহ্‌ল বলল, 'ভেবেছিলাম অবাক হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি আমি। ওকালতি করতে গিয়ে অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে যা পেলাম, তা অবিশ্বাস্য। ভারাকিনের পিছনে কেন লেগেছ তুমি, কুয়াশা?'

'কোনও একদিন হয়তো বলব তোমাকে,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা।

'ওটা কোনও জবাব হলো না।'

'আপাতত এ-নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। এখন ভরগেন পরিবার সম্পর্কে কী জানো, তা বলো আমাকে।'

'বলবার মত আসলে কিছু নেই। অ্যানসেলের বউ মারা গেছে পঞ্চাশের দশকে। কয়েক পছর পর তার বড় ছেলে আর ছেলে-বউও মারা পড়ে একটা সড়ক-দুর্ঘটনায়। পাহাড়ি খাদে গাড়ি-সহ পড়ে গিয়েছিল, লাশদুটো শেষ পর্যন্ত পাওয়াই যায়নি। এক মেয়ে ছিল, সে-ও উনিশশো একাত্তরে ক্যান্সারে মারা গেছে। অ্যানসেল অবশ্য বহুদিন বেঁচেছে, ক্রুপ-দের মত যুদ্ধাপরাধের কারণে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি তাকে। মারা গেছে আশি সালে, হর্স-রাইডিঙের সময় হার্ট অ্যাটাক করে।'

'কে বেঁচে আছে?'

'ছোট ছেলে—ওয়ালথার ভরগেন। তার বউ, আর এক মেয়ে—ক্রনা। মেয়েটা চিরকুমারী, বিয়ে-শাদী করেনি; তার মানে

এই নয় যে, পুরুষদেরকে পছন্দ করে না সে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

হাসল বোহ্‌ল। 'এ-ধরনের মেয়েদেরকে পুরুষখেকো বলে। যৌবনে বেশ বদনাম ছিল তার—রোজ রাতে নাকি শয্যাসঙ্গী পাল্টাত। বয়স বাড়ার সঙ্গে পরিণত হয়ে উঠেছে, ক্রুনা-ই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভরগেনদের পুরো ব্যবসা। ওয়ালথার আর তার বউয়ের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে... সাধারণত জনসমক্ষে বেরোয় না ওরা।'

'থাকে কোথায়?'

'স্ট্যাডওয়াল্ডেই। না... শটের ওই এস্টেটে না। দলিল তো দেখেছ তুমি, ওটা পঞ্চান্ন সালে ডেভেলপারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এ-জন্যেই ওটার কথা জানা ছিল না আমার। দুই বুড়ো-বুড়ি এখন স্ট্যাডওয়াল্ডের ভিতরদিকের একটা বাড়িতে বাস করে।'

'আর ক্রুনা?'

কাঁধ ঝাঁকাল বোহ্‌ল। 'সেটা নির্ভর করে ওর মর্জির উপর। ওয়ার্ডেনস্ট্রাসে একটা পেন্টহাউস আছে ক্রুনার—নানা ধরনের, নানা বয়সের, নানা পেশার পুরুষেরা আনাগোনা করে ওখানে। শুনেছি, প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে সেক্সুয়ালি ব্ল্যাকমেইল করা হয় ওখানে। আর হ্যাঁ... বাপ-মায়ের জমিতে একটা কটেজও বানিয়েছে, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে ওঠে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং চরিত্র।'

'তা তো বটেই। পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন পালন করেছে গত বছর, কিন্তু আজকালকার মেয়েরা পেরে উঠবে না ওর সঙ্গে—রূপ, বা মেধা... কোনও দিক দিয়েই না।' একটু থামল বোহ্‌ল। 'একটা খুঁত আছে ক্রুনার। শক্ত হাতে ব্যবসা সামলাচ্ছে, তারপরেও শুনেছি

মাঝে মাঝে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তখন বাবার পরামর্শ নিতে যায়। হাবভাবে তো মনে হয়, মেয়ে যতই কর্তৃত্ব দেখাক, আসল নিয়ন্ত্রণ এখনও রয়ে গেছে বুড়ো ওয়ালথারের হাতে।'

'তোমার পরিচয় আছে লোকটার সঙ্গে?'

'স্রেফ মুখচেনা, গভীর কিছু নয়।'

'কী মনে হয় তাকে?'

'খুব বড় কিছু নয়। প্রতিভা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কর্মজীবনে লোকটা তার প্রতিফলন দেখাতে পারেনি। তা হলে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রি পুরো ইয়োরোপের বাজার দখল করে নিতে পারত।'

হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে দুর্বল দেখিয়েছে ওয়ালথার ভরগেন, ভাবল কুয়াশা। কেমিসের শীর্ষপদগুলোর একটায় থাকা অবস্থায় দুনিয়ার সামনে জাহির করতে চায়নি নিজেকে।

'ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' বলল ও। 'একা। বাড়িটাতে গেছ কখনও?'

'একবার... বেশ ক'বছর আগে,' জানাল বোহ্ল। 'পেটেন্ট সংক্রান্ত একটা সমস্যা সমাধান করতে পারছিল না ওদের নিজস্ব লইয়ার-রা, তাই আমাকে ভাড়া করেছিল। তখনই গিয়েছিলাম ওখানে, লিগ্যাল ডকুমেন্টে বুড়ো ভরগেনের একটা সই নেবার জন্য। সই-টা ক্রুনা করলেও চলত, কিন্তু ও তখন দেশের বাইরে। আমি ওখানে হাজির হয়েছি শুনেই ফোন করে বসল। চেঁচামেচি করে জানাল, ওর বাবাকে বিরক্ত করে নাকি মহা-অন্যায় করেছি আমি। ভদ্রভাবে কারণটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হলো না। গালাগালি করে আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলল। সেইসঙ্গে টেলিফোনেই বরখাস্ত করল আমাকে।'

'মনে হচ্ছে খুব রেগে আছ ঘটনাটায়,' মুচকি হাসল কুয়াশা।

'রাগব না? নিজের উকিলকে ওভাবে অপমান করে কেউ?' তিক্ত গলায় বলল বোহ্‌ল। 'সেদিনই শিয়োর হয়েছি, ব্রুনা একজন ইতর মহিলা।'

সহানুভূতি অনুভব করল কুয়াশা বন্ধুর জন্য। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আশা করি এর প্রতিদান কোনও একদিন পাবে ওরা। এনিওয়ে, শেষ দুটো অনুরোধ আছে আমার। প্রথমটা হলো, আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কাউকে বোলো না তুমি, নিজের বউকেও না।'

'ঠিক আছে,' বলল বোহ্‌ল। 'আর দ্বিতীয় অনুরোধ?'

'ভরগেনের বাড়িটা সম্পর্কে জানতে চাই আমি। লোকেশন, সীমানা, গেট, সিকিউরিটি... সোজা কথায় যতকিছু মনে পড়ে, সব খুলে বলো আমাকে।'

হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে উঁচু এক প্রাচীরের কোনা, ভাড়া করা মার্সিডিজের অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ কমাল কুয়াশা। চকিতের জন্য দেখে নিল অডোমিটার, প্রাচীরের শুরু থেকে মূল ফটকের দূরত্ব হিসাব করল—প্রায় আঠারোশ' ফুট। লোহার তৈরি প্রকাণ্ড ফটকটা এ-মুহূর্তে বন্ধ। যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ওটা।

দেয়ালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু থামল ও। এ-পাশটা গেটের ও-পাশ থেকে সামান্য ছোট। দেয়ালের পরেই গাছপালার সারি, ঘন অরণ্যের ভিতর তৈরি করা হয়েছে ভরগেন কম্পাউণ্ড। আবার সামনে এগোল গাড়ি নিয়ে, চঞ্চল চোখে গাছগাছালির মাঝে এক টুকরো জায়গা খুঁজছে, যেখানে লুকানো যায় মার্সিডিজটাকে।

বড় দু'টো গাছের মাঝখানে পাওয়া গেল অমন জায়গা, মাথার উপরে ঘন ডালাপালার কারণে প্রাকৃতিক একটা গুহার মত আকৃতি

পেয়েছে ওটা। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ওখানে ঢুকে পড়ল কুয়াশা, এগিয়ে গেল যতদূর সম্ভব, বাইরে থেকে যেন দেখা না যায় ওটাকে। একটু পর ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল রাস্তায়, পিছন ফিরে দেখে নিল জায়গাটা। অন্ধকারে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে মার্সিডিজ।

ছড়িতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ভরগেন কম্পাউণ্ডের দেয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করল কুয়াশা। ভবঘুরের মত বেশভূষা নিয়ে এসেছে, হঠাৎ দেখলে হতভাগ্য একজন পঙ্গু মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না ওকে। হাঁটতে হাঁটতে দেয়ালের উপর নজর বোলাল, ওটা টপকাতে পারলে সহজেই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করছে। ইলেকট্রনিক্যালি পুরো জঙ্গলকে স্ক্যান করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। বনে পশু-পাখির অত্যাচারে সারাক্ষণই নানা ধরনের **সঙ্কেত দিতে থাকবে সেন্সরগুলো।** কাজেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা যা থাকার, থাকবে কেবল সীমানার প্রাচীরে।

দেয়ালের পাশে পৌঁছে লাইটার জ্বালল কুয়াশা, কাঁপা কাঁপা আলোয় পরীক্ষা করল দেয়ালের গা। বিশেষত্বহীন। কারসাজি তা হলে দেয়ালের মাথায় করা হয়েছে। মাথা ঘোরাল ও। কয়েক গজ দূরে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ওক গাছ, দেয়ালের দিকটাতে ডালপালা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যেন ওটা ধরে সীমানার ভিতরে যেতে না পারে কেউ। তাতে অসুবিধে নেই কুয়াশার। ছড়িটা ভাঁজ করে ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে, তারপর তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে গেল মগডালে।

উপরে পৌঁছে দেয়ালের দিকে তাকাল ও। যা ভেবেছে তা-ই। দেয়ালের মাথায় ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার আর মোশন সেন্সর ফিট করে রাখা হয়েছে কম্পাউণ্ডের পুরো সীমানা জুড়ে। ভিতরে কোথাও নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র আছে, সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টা মনিটর

করা হচ্ছে ওগুলো। ভেবে দেখল কুয়াশা, চেষ্টা করলে হয়তো অচল করা যাবে দু-একটা সেন্সর, কিন্তু সেটা করতে গেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে প্রহরীদের। ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। কম্পাউণ্ডের ভিতরদিকে নজর বোলাল এরপর। চকিতের জন্য একজন গার্ডকে দেখতে পেল—টহল দিচ্ছে। তারমানে সিস্টেমটা শুধুমাত্র সীমানার জন্য, ভিতরটা কাভার করা হচ্ছে টহলের মাধ্যমে। নিশ্চিন্তে এগোনো যেতে পারে।

বড় করে শ্বাস টানল ও, কোমর থেকে খুলে নিল বেল্ট। জিনিসটা ওর নিজের আবিষ্কার—নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা বাকলের ভিতর খুদে একটা পিটন-সহ পঁচাত্তর ফুট হাই-টেনসিল কর্ড রয়েছে। ওই কর্ড ওর ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। আঙুল দিয়ে বাকলের সেফটি ক্যাচ খুঁজে নিল কুয়াশা, ঠেলে সরিয়ে দিল অফ সেটিং-এ, তারপর বেল্টটা ডান কবজিতে পেঁচাল।

হাত তুলল ও, লক্ষ্যস্থির করল কম্পাউণ্ডের ভিতরের একটা গাছের দিকে। আবার বড় করে শ্বাস টেনে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর চাপ দিল বাকলে লাগানো ফায়ারিং মেকানিজমে। কবজিতে ঝাঁকি খেলো বেল্ট, ছুটে যাচ্ছে পিটন, পিছনে সাপের মত হাই-টেনসিল কর্ড। এক নিমেষে পৌঁছে গেলেও, কুয়াশার মনে হলো ঘটনাটা ঘটছে স্লো-মোশনে। দম বন্ধ করে আছে, প্রার্থনা করছে খুদে পিটন যেন আটকায় গাছের কাণ্ডে। তারটা দেয়ালের উপর আছড়ে পড়লেই সর্বনাশ, হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি ছুটে আসবে ইস্পাতের কর্ড বেয়ে... শক খেয়ে ঘায়েল হতে হবে ওকে।

আশঙ্কাটাকে অমূলক প্রমাণ করে ঠক করে আওয়াজ তুলল পিটন, গেঁথে গেছে গাছের গায়ে। বেল্ট ধরে টান দিয়ে পরীক্ষা

করল কুয়াশা—না, খুলে আসার ভয় নেই... ভালভাবেই আটকেছে ওটা। কর্ডের এ-প্রান্তটা ওক গাছের কাণ্ডের সঙ্গে টানটান করে বাঁধল ও, তারপর ঝুলে পড়ল—হাত-পা ব্যবহার করে র‍্যাপেলিঙের মাধ্যমে এগোচ্ছে কম্পাউণ্ডের দিকে।

প্রায় ষাট ফুট প্যারালাল র‍্যাপেলিং—সহজ কাজ নয়। পিঠ আর হাতের পেশি ব্যথা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। শীতবোধ উধাও হয়ে গেছে, পরিশ্রমে সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। থামল না ও, এগিয়ে চলল। শেষে যখন ওপাশের গাছটার ডালে পা রাখল, তখন সারা শরীর কাঁপছে।

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল কুয়াশা, তারপর সাবধানে উঁকি দিল নীচে, না, দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ওর অনুপ্রবেশ টের পায়নি প্রহরীরা। চিকন কর্ডটাও রাতের অন্ধকারে মিশে আছে, খালি চোখে দেখা যায় না। নিশ্চিন্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এল ও। গাছগাছালির ছায়া আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভরগেনদের বাড়ির দিকে। কম্পাউণ্ডের ঠিক মাঝখানে ওটা। দূর থেকে জানালার আলো চোখে পড়ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুয়াশা, ঝট্ করে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। ওর ঠিক দশ হাত সামনে উদয় হয়েছে একটি ছায়ামূর্তি। ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল, সিগারেট ধরাল লোকটা। আগুনের আভায় ইউনিফর্মধারী একজন পুরুষকে দেখা গেল—গায়ে উইন্টার জ্যাকেট, পায়ে ভারী বুট; কোমরের বেল্টে রয়েছে হোলস্টারে ভরা পিস্তল। একজন গার্ড।

আয়েশ করে মিনিট পাঁচেক ধরে সিগারেট টানল লোকটা, তারপর ছোট হয়ে আসা গোড়াটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষল। হাই তুলল সে, ধীর গতিতে হেঁটে চলে গেল বিশ গজ, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল। মনে হলো এই ছোট্ট অংশটাই

তার টহলের সীমানা। সন্দেহ নেই, ঠিক একই কায়দায় বাড়ির চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে আরও প্রহরী। পুরনো আমলের রাজা-বাদশাদের যে-ভাবে রক্ষা করা হতো, ঠিক সে-ভাবে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রেখেছে। তবে এখন আর রাজা-বাদশাদের যুগ নেই... নেই সে-আমলের মত বিপদের ঝুঁকিও! তাই ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে প্রহরায়। ডিউটির সময়ে সিগারেট ফোঁকা, হাই তোলা, আর অলসভাবে হাঁটাহাঁটি তারই লক্ষণ।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অসুবিধে দেখা দেবে তার পরে। সামনের লন পেরিয়ে ড্রাইভওয়ের ছায়ায় পৌঁছুতে হবে ওকে, জায়গাটা বাড়ির ছাতে লাগানো ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত। কী করা যায় ভাবল কুয়াশা, একটু পরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে। বেশভূষা বদলাতে হবে ওকে। গার্ডের পোশাক পরা একজন মানুষ যদি লন পেরিয়ে বাড়ির দিকে যায়, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

ঝোপের পিছনে ধৈর্যপরীক্ষায় নামল কুয়াশা, অপেক্ষা করছে সামনের গার্ডের পরবর্তী সিগারেট-ব্রেকের জন্য। মিনিট বিশেক পর সমাপ্তি ঘটল প্রতীক্ষার। হাঁটা বন্ধ করে ওর কয়েক গজ দূরে দাঁড়াল, পকেট থেকে বের করে আনল সিগারেটের প্যাকেট। নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। পিছন থেকে শিকারি-বাঘের মত হামলা করল ও। মুখের কাছে লাইটার তুলছিল গার্ড, ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। মুখটা জাপটে ধরে ফেলল কুয়াশা, যাতে চিৎকার করতে না পারে। অজ্ঞান দেহটা সাবধানে নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ঝোপের পিছনে।

কাপড় বদলাতে সময় লাগল মাত্র দু'মিনিট। তারপরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

আগেই দেখে নিয়েছে গার্ডের হাঁটার ধরন। অলস পায়ে লন পেরুতে থাকল, আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে। মনে আশঙ্কা, এই বুঝি কেউ চেঁচিয়ে ওঠে।

তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই ড্রাইভওয়ের ছায়ায় পৌঁছে গেল কুয়াশা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওখানে পৌঁছে। ড্রাইভওয়েটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। শেষ মাথায় একটা খোলা দরজা দিয়ে এক চিলতে আলো আছড়ে পড়ছে পেভমেন্টের উপর। স্থূলদেহী এক মহিলার অবয়ব দেখা গেল ওখানে, দু'হাতে গার্বেজ ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির ভিতর থেকে। চাকরানী নিঃসন্দেহে।

নির্দ্বিধায় তার দিকে এগিয়ে গেল কুয়াশা। খাঁটি জার্মান ভাষায় বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমার ক্যাপ্টেন একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন হের ভরগেনের জন্য।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মেইড। 'কে তুমি?'

'নতুন এসেছি, তাই চিনতে পারছেন না।' মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল কুয়াশা। 'ব্যাগগুলো দিন, আমি সাহায্য করছি আপনাকে।'

নড়ল না মহিলা। 'হুঁ, নতুন-ই বটে তুমি। নইলে আমাকে সাহায্য করতে চাইতে না। তোমার সঙ্গী-সাথীরা তো সারাদিন এটা-ওটা ফরমায়েশ দিতে দিতে জান খারাপ করে দেয় আমার। ভাব দেখায় আমি যেন ওদের কেনা বাঁদী!'

'কথা না শুনলেই পারেন। ওরা নিশ্চয়ই বেতন দেয় না আপনাকে?'

'তা দেয় না, কিন্তু চাইলেই আমার চাকরি খেতে পারে। বলবে যে, বাড়ির নিরাপত্তার জন্য আমি একটা হুমকি। ব্যস, তাতেই...'

'এত ভয় পাবেন না। আপনার পক্ষে কথা বলবার লোকও দেখবেন ঠিকই পাওয়া যাবে। দিন ব্যাগগুলো।'

'থাক, কষ্ট করতে হবে না, আমিই পারব।' হাসল মেইড,

কুয়াশার কথায় খুশি হয়েছে। 'কী নাম তোমার?'

'গটফ্রিড।'

'আমি হেলগা। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কী কাজে যেন এসেছ?'

'একটা মেসেজ... হের ভরগেনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আমাকে দিলে চলে? আমি পৌঁছে দেব নাহয়।'

'সরি, সরাসরি ওঁর কাছেই দিতে হবে ওটা। কোথায় পাওয়া যাবে ভদ্রলোককে?'

হাতঘড়ি দেখল হেলগা। 'দশটা বেজে গেছে। তারমানে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে, আর বুড়ো গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তার চ্যাপেলে।'

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'দুঃখিত, এখানকার কিছুই চিনি না আমি।'

'কোনও অসুবিধে নেই, আমি নিয়ে যাব তোমাকে,' বলল হেলগা। 'এক মিনিট সময় দাও আমাকে। ময়লাগুলো ফেলে আসি।'

বাড়ির পিছনের গার্বেজ-ক্যানে ব্যাগদুটো রেখে এল সে। তারপর কুয়াশাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা, একটু পর পৌঁছে গেল বাড়ির এন্ট্রান্স হলে। বিশাল এক বৃত্তাকার কামরা—পায়ের নীচে দামি কার্পেট, দেয়ালগুলো মেহগনি কাঠের প্যানেলে মোড়া। ঘর জুড়ে শোভা পাচ্ছে বহুমূল্য পেইন্টিং আর অ্যান্টিকের সংগ্রহ। একপাশে রয়েছে ঘোরানো সিঁড়ি, ধাপগুলো ইটালিয়ান মার্বেলে গড়া, রেলিংটা খাঁটি রূপার—উঠে গেছে দোতলার ইনার-ব্যালকনিতে। অনেকগুলো দরজা রয়েছে ওখানে, প্রতিটার পিছনে একটা করে রুম। এন্ট্রান্স হলে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো না, বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলেছে মেইড। তাকে অনুসরণ করল কুয়াশা। সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে, কামরার

এক প্রান্তে একটা ভারী দরজার সামনে থামল ওরা, পাল্লার গায়ে বাইবেলের বিভিন্ন দৃশ্য খোদাই করে রাখা হয়েছে।

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল হেলগা, ওপাশের ছোট্ট সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ভূ-গর্ভে। ছোট একটা অ্যান্টিচেম্বারে পা রাখল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে। হলঘরের সিঁড়ির মত মার্বেলে তৈরি করা হয়েছে মেঝে, দেয়ালে নানা রকম ট্যাপেস্ট্রি—তাতে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের দৃশ্য আঁকা। পুরনো আমলের চার্চে যে-ধরনের পানির কল আর বেসিন থাকত, তেমনই একটা অ্যান্টিক সাজিয়ে রাখা হয়েছে অ্যান্টিচেম্বারের এক কোণে। আরেক প্রান্তে রয়েছে আর্চওয়ে-আকৃতির একটা বন্ধ দরজা, ওপাশে ওয়ালথার ভরগেনের চ্যাপেল।

'চাইলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারো,' হেলগা বলল, 'দোষ যা হবার তোমার ক্যাপ্টেনের হবে। তবে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়। প্রিস্টের ওয়াজ-নসিহত শেষ হয়ে যাবে ততক্ষণে।'

'প্রিস্ট!' চেষ্টা করেও বিস্ময়টা চাপা দিতে পারল না কুয়াশা। ফেনিসের ধারক-বাহক ধর্মচর্চা করছে?

'হুঁ,' বলে উল্টো ঘুরল হেলগা। 'কী করবে সেটা এখন তোমার সিদ্ধান্ত। আমি যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।' সিঁড়ি ধরে চলে গেল সে।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতল কুয়াশা। ভিতর থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রপাঠের আওয়াজ। একটু খেয়াল করতেই বুঝল, রুশ ভাষায় চলছে সে-আবৃত্তি। ওয়ালথার ভরগেন যে প্রিন্স ভারাকিনের সন্তান, ধারণাটা আরও দৃঢ় হলো ওর। বিস্ময় জাগছে কেবল নিভৃত-ধর্মচর্চা নিয়ে। যারা দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে চায় অন্যায় আর অপরাধের মাধ্যমে, তাদের একজন কেন ঈশ্বরের প্রার্থনা করবে?

সাবধানে দরজার হাতল ঘোরাল কুয়াশা, পাল্লা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে উঁকি দিল ভিতরে। নাকে ভেসে এল কৃত্রিম সুবাস, চোখে আঘাত করল সার বেঁধে জ্বলতে থাকা মোমবাতির আলো। দৃষ্টি স্বাভাবিক হলে চ্যাপেলের অভ্যন্তর দেখতে পেল ও। খুব বড় নয়, মাত্র পাঁচ সারি আসন ওখানে। ভিতরটা সাজানো হয়েছে রাশান অর্থোডক্স চার্চের আদলে. দেয়ালে ঝুলছে ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর নানা রকম ধর্মীয় প্রতীক। শেষ প্রান্তে উঁচু মঞ্চ আর প্রার্থনাবেদি, সেখানে সিল্কের আলখাল্লা পরা একজন মাঝবয়েসী প্রিস্ট প্রার্থনা পরিচালনা করছেন। তাতে অংশ নিচ্ছে একজন মাত্র মানুষ—অশীতিপর এক বৃদ্ধ, মাথার চুল পাতলা হয়ে গিয়ে টাক দেখা যাচ্ছে। চেহারা বোঝা গেল না, মানুষটা এদিকে পিঠ ফিরিয়ে মঞ্চের সিঁড়িতে সেজদার ভঙ্গিতে পড়ে আছে। ঈশ্বরের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের ভঙ্গি ওটা। সন্দেহ নেই, এ-ই ওয়ালথার ভরগেন।

বড় করে শ্বাস নিল কুয়াশা, তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল চ্যাপেলে। সারি বাঁধা আসনগুলোর মাঝের আইল ধরে দৃপ্তপায়ে এগিয়ে গেল ও মঞ্চের দিকে। পদশব্দ শুনে মাথা তুললেন প্রিস্ট, ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। সেজদা থেকে উঠে পড়ল বৃদ্ধও, ঘুরল কুয়াশার দিকে।

'অ্যাই!' কর্কশ গলায় বলে উঠলেন প্রিস্ট। 'এখানে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?'

লোকটাকে পাত্তা দিল না কুয়াশা, মঞ্চের কাছে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একজন সত্যসন্ধানী, ভারাকিন। লেনিনগ্রাদ থেকে এসেছি। আশা করি আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই?'

কেঁপে উঠল ওয়ালথার ভরগেন, পড়েই যাচ্ছিল... পিছন থেকে

তাকে ধরে ফেললেন প্রিস্ট। রাগী গলায় বললেন, 'কে তুমি? ঈশ্বরের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?'

'অধিকারের কথা বোলো না, শয়তানের দোসর!' পাল্টা তেজে বলল কুয়াশা। 'তোমাদেরকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়!'

উত্তেজিত হলেন না প্রিস্ট। বললেন, 'কারও দোসর নই আমি। ঈশ্বরের সেবা করি... এর বাইরে আর কোনও কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার।'

প্রিস্টের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ওয়ালথার ভরগেন। পুরো শরীর কাঁপছে তার। ভাঙা গলায় বলল, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত তুমি এলে? জানতাম, হাল ছাড়বে না তোমরা। প্রতিশোধ নেবার অধিকার শুধুই ঈশ্বরের, কিন্তু তা তোমরা মানো না। তোমার সঙ্গে কোনও সংঘাত নেই আমার, তবুও এসেছ প্রাণ কেড়ে নিতে! ঠিক আছে, যা খুশি করো, বলশেভিক। কিন্তু এই প্রিস্টকে যেতে দাও। ও ভারাকিন নয়।'

'আমি বলশেভিক নই,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা।

'নও?' বিস্ময় ফুটল ওয়ালথার ভরগেনের কণ্ঠে। 'তা হলে কেন...'

'কারণ আপনি একজন ভারাকিন।'

'হ্যাঁ... আমার দুর্ভাগ্য,' স্বীকার করল বৃদ্ধ, 'এবং আমার কলঙ্ক। দুটোই এত বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে সম্ভব হতো না এ-লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকা।'

'একজন বলছে অধিকার, আরেকজন ঈশ্বরের কথা!' ঘৃণা প্রকাশ পেল কুয়াশার গলায়। 'ধিক্ তোমাদেরকে! হিপোক্রিটের দল! পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

চোখ পিট পিট করল ওয়ালথার ভরগেন। চেহারা প্রতিক্রিয়াহীন। 'কী বললে?'

'শুনতে পাওনি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুয়াশা। 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

'শুনছি তোমার কথা... কিন্তু বুঝতে পারছি না।

'ফিনিক্স কাউন্সিলের কথা বলছি আমি। কর্সিকা... পোর্তো ভেচিয়ো... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি!'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রিস্টের দিকে তাকাল ওয়ালথার ভরগেন। 'ফাদার, শুনতে ভুল করছি না তো? কীসের কথা বলছে ও?'

'ব্যাখ্যা করো!' বললেন প্রিস্ট। 'কে তুমি? কী চাও? ওই কথাগুলোরই বা মানে কী?'

'তোমার মনিবের সেটা জানা আছে,' বিদ্রুপের স্বরে বলল কুয়াশা।

'কী জানা আছে?' ভরগেনের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। 'স্বীকার করছি, ভারাকিন হিসেবে আমাদের হাতে বহু নিরীহ রাশানের রক্ত লেগে আছে... কিন্তু যা জানি না, তা স্বীকার করব কীভাবে?'

'আরও ক্লু দিতে হবে?' বলল কুয়াশা। 'তোমার গুরু... রাখাল বালকের ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

'আমার কোনও গুরু নেই,' বলল ভরগেন। 'ঈশ্বরই আমার সব!'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রিস্ট। 'থামাও এসব!' চাবুকের মত গর্জে উঠল তার কণ্ঠ। 'নিরীহ, ধর্মভীরু একজন ভালমানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবার কোনও অধিকার নেই তোমার। কী করেছেন উনি? দিনের পর দিন... বছরের পর বছর ধরে পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছেন—এমন পাপ, যাতে তাঁর নিজের কোনও হাত ছিল না। তারপরেও ক্ষমা চাইছেন ঈশ্বরের কাছে! ছোটবেলা থেকে ধর্মের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছেন মানুষটা, অনুমতি

পাননি... কিন্তু এখন নিজেকে ঈশ্বরের অনুসারী করে গড়ে তুলেছেন। এ তো অন্যায় নয়!'

'ঈশ্বর না, ও ফেনিসের অনুসারী।' সরোষে বলল কুয়াশা।

'এর অর্থ কী, জানা নেই আমার। কিন্তু এই মানুষটা কেমন, তা জানি। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা দান করেন তিনি ক্ষুধার্ত, দুস্থ মানুষের সেবায়। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করেন মন্দির, মসজিদ আর গির্জা। বিনিময়ে আজ পর্যন্ত কিছুই চাননি।'

'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য করে ওসব... ফেনিসের টাকায়! আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

এই সময় ধড়াম করে খুলে গেল চ্যাপেলের দরজা। ঝট্ করে উল্টো ঘুরল কুয়াশা। কালো পোশাক পরা এক লোক উদয় হয়েছে ওখানে। পজিশন নিয়েছে দু'পা ফাঁক করে, হাতদুটো সামনে প্রসারিত, মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে একটা নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিক... তাক করেছে ওর দিকে।

'ডোন্ট মুভ!' হুকুম দিল লোকটা। 'অস্ত্র ফেলে দাও।'

কথামত কাজ করল কুয়াশা। ফাঁদে পড়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে চ্যাপেলে ঢুকল দু'জন নারী। প্রথমজন বেশ লম্বা, তীক্ষ্ণ চেহারা, ফ্যাশন মডেলদের মত একহারা দেহ, পরনে বিজনেস সুট। যুবতী বলা যাবে না, তবে বয়সের কোনও বিরূপ প্রভাব পড়েনি তার অবয়বে; বরং বয়স তার ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। চোখের তারায় আগুন, গায়ের রঙ পোর্সেলিনের মত ধবধবে সাদা। ঘন কেশরাজি বেঁধে রাখা হয়েছে খোঁপায়, ভাল করে তাকালে একটা-দুটো ধূসর চুল হয়তো বা দেখা যাবে। দ্বিতীয়জন খর্বকায়, সাদাসিধে গাউন আর ওভারকোট পরেছে। চেহারা অতি পরিচিত, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে

একে দেখেছে কুয়াশা—হল অভ রেকর্ডসের রিসেপশনে। মেয়েটা ওখানকার সেই কেরানি!

'এ-ই সেই লোক,' প্রথমজনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানাল সে।

'ধন্যবাদ,' মাথা ঝাঁকাল বিজনেস সুট পরিহিতা মহিলা। 'এবার তুমি যেতে পারো। আমার শোফার তোমাকে শহরে পৌঁছে দেবে। টাকাও জমা হয়ে যাবে তোমার অ্যাকাউন্টে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যা'ম... থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। হলঘরে অপেক্ষা করছে শোফার। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, ম্যা'ম।'

চলে গেল মেয়েটা।

'ক্রুনা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালথার ভরগেন। প্রিস্টের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। 'এই লোকটা...'

'দুঃখিত, বাবা,' বাধা দিয়ে বলল ক্রুনা ভরগেন, 'বংশের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনোদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারোনি তুমি। অনেক কিছুই তাই গোপন রাখা হয়েছে তোমার কাছ থেকে। সন্দেহ নেই, এ-লোক আজ তোমাকে এমন কিছু শুনিয়েছে, যা শোনার কথা ছিল না তোমার।'

ঘাড় কাত করে নিজের সঙ্গীকে ইশারা দিল সে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল অস্ত্রধারীর অটোমেটিক. একপাশে সরে এসে গুলি চালিয়েছে লোকটা। ওয়ালথার ভরগেনের শীর্ণ দেহ ঝাঁকি খেলো, বুক চেপে ধরে প্রার্থনামঞ্চের সিঁড়িতে আছড়ে পড়ল সে। খুনির পরের গুলির শিকার হলেন মাঝবয়েসী প্রিস্ট। কপালের একটা অংশ উড়ে গেল তাঁর, রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে লাশটা ধড়াম করে পড়ে গেল মঞ্চের উপর।

আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের রেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাসল চ্যাপেলের ভিতর। তারপর নেমে এল থমথমে নীরবতা।

অকস্মাৎ এ-হত্যাকাণ্ড দেখে স্থবির হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন দাউ দাউ করে মাথায় জ্বলছে আগুন। চিবিয়ে চিবিয়ে ও বলল, 'এ-রকম ঠাণ্ডা মাথার খুন আর কোনোদিন দেখিনি আমি।'

'দ্য গ্রেট কুয়াশাকে মুগ্ধ করতে পেরে ভাল লাগছে,' হেসে এক পা সামনে এগোল ক্রুনা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না, ওই অথর্ব বুড়ো আর সাদাসিধে এক প্রিস্টকে আমাদের অংশ ভেবেছিলে তুমি'

'মানুষ চিনতে ভুল হয়েছে আমার, নাম চিনতে হয়নি। ভারাকিন আর ফেনিস একই সুতোয় গাঁথা।'

'ভারাকিন নয়, ভরগেন,' সংশোধন করে দিল ক্রুনা। 'নামে কিছু আসে-যায় না। ফেনিসে জন্ম-পরিচয়ের স্থান নেই। আমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে।' মৃত পিতার দিকে ইশারা করল। 'দুর্বল ছিল ও... আদর্শবাদী। কোনোদিনই আমাদের পরিবারের অতীতকে মেনে নিতে পারেনি, বরং চেষ্টা করেছে তা থেকে সরে আসবার। তাই মারা যাবার আগে দাদু আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন ফেনিস কাউন্সিলের পদ।' আবার ফিরল কুয়াশার দিকে। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, লেনিনগ্রাদে ভালই খেল্ দেখিয়েছ তুমি। আমাদের তিন-তিনজন লোককে হারাতে হয়েছে তোমার কারণে।'

'ওটুকুই একমাত্র সাফল্য নয়,' বলল কুয়াশা। 'গন্ধ শুঁকে তোমাদেরকেও খুঁজে বের করে ফেলেছি। ভরগেন-রাই যে ভারাকিন, সেটা জেনে নিয়েছি।'

'স্রেফ একটা নাম ওটা, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কী

জেনেছ না জেনেছ, তাতে কিছু যায়-আসে না। দুনিয়ার সামনে যতই গলা ফাটিয়ে চেঁচাও, সব অস্বীকার করব আমরা।'

'আমার হাতে প্রমাণ নেই, এমনটা ভাবছ কেন?'

'নিশ্চিত হয়েছি আমরা,' ক্রুনা নয়, কথা বলে উঠল অস্ত্রধারী খুনি। 'লেনিনগ্রাদে আমাকে ফাঁকি দিয়েছ তুমি; কিন্তু ওই বুড়ো লাইব্রেরিয়ান আর সুন্দরী মেয়েটা ফাঁকি দিতে পারেনি। ঘুম পাড়াবার আগে ভালমত ইন্টারোগেট করেছি ওদেরকে। আমার ধারণা, অন্তত একটা ইন্টারোগেশনের পরিণতি দেখতে পেয়েছ তুমি।' হাসল লোকটা। 'কী যেন নাম মেয়েটার... নাতালিয়া, তাই না? খুব এনজয় করেছি ওকে।'

'তুমি?' চাপাস্বরে গর্জে উঠল কুয়াশা। অদম্য আক্রোশে সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। শেভচেঙ্কো আর নাতালিয়ার হত্যাকারী দাঁড়িয়ে আছে কয়েক গজ দূরে... অথচ ও অসহায়! কিচ্ছু করবার নেই!

'কুল ডাউন, কুয়াশা,' হাসল ক্রুনা। 'মাথা গরম করে কোনও উপকার হবে না তোমার। আমাদের ব্যাপারে আর কী জেনেছ, সেটা শুনি।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কুয়াশা। 'সব জেনে গেছি আমি!'

'সব? কী রকম?'

দাঁতে দাঁত পিষল কুয়াশা। এক এক করে উচ্চারণ করল শব্দতিনটে, 'পার... নস্ত্রো... সার্কোলো!'

হাসি মুছে গেল ক্রুনা ভরগেনের ঠোঁট থেকে। থমথমে গলায় বলল, 'অতীতের মন্ত্র... সেইসব মানুষের জন্য, যারা নিতান্তই অন্ধ আর বোকা। আদর্শের সত্যিকার স্বরূপ ওদের জানা নেই।'

'তা-ই? কিছু না জেনেই জীবন উৎসর্গ করছে ওরা তোমাদের

জন্য?'

'হ্যাঁ।'

হাতে সময় নেই, বুঝতে পারছে কুয়াশা। যা করবার এখুনি করতে হবে। নইলে মৃত্যু অনিবার্য। দু'পা এগিয়ে গেল ও ক্রুনার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যামার টানল খুনি, অস্ত্রটা বুক থেকে উঠে তাক হলো ওর মাথার দিকে।

'হুম,' বলল কুয়াশা। 'ধরে নিলাম ওরা নাদান... কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নও? কাউন্ট বারেমির সত্যিকার অনুসারী, রাখাল বালকের সহচরী—এ-ই নিশ্চয়ই তোমার পরিচয়?'

থমকে গেল ক্রুনা। বুঝতে পারছে, ওর ধারণার চেয়ে অনেক বেশি জানে কুয়াশা। মহিলার এই হতভম্ব অবস্থার সুযোগ নিল ও। এগোল আরও দু'পা। দু'জনের মধ্যে এখন মাত্র পাঁচ ফুট দূরত্ব।

'থামো!' গর্জে উঠল খুনি।

কথা শুনল না কুয়াশা। স্প্রিঙের মত টান টান হয়ে ছিল ওর শরীর, আচমকা ঝাঁপ দিল ক্রুনা ভরগেনকে লক্ষ্য করে। প্রায় একই সঙ্গে ট্রিগার চাপল খুনি। বদ্ধ চ্যাপেলের অভ্যন্তর প্রকম্পিত হলো বজ্রপাতের মত কানফাটা আওয়াজে।

এগারো

কুয়াশার কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। ক্রুনাকে জাপটে ধরে মেঝেতে পড়ে গেল ও। গড়ান দিয়ে মহিলাকে নিয়ে এল নিজের

দেহের উপর—মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে। দেখা যাক, মনিবের উপর গুলি চালানোর সাহস আছে কি না খুনির।

দেখা গেল নেই। দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এল সে, বোধহয় ভাবছে ক্রুনাকে ছাড়িয়ে নেয়া সম্ভব কি না। এটাই চাইছিল কুয়াশা। আলিঙ্গনের মধ্যে আটকে রাখা মহিলাকে ছুঁড়ে দিল খুনির দিকে। ওজন বেশি নয় ক্রুনার, খড়ের পুতুলের মত আছড়ে পড়ল লোকটার গায়ের উপর। তাল হারিয়ে দু'জনেই হুড়মুড় করে ভূপাতিত হলো।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। ক্রুনাকে শরীরের উপর থেকে সরিয়ে সিধে হবার চেষ্টা করছিল খুনি, ছুটে গিয়ে তার কবজিতে একটা পেনাল্টি কিক মারল। হাড় ভাঙার মড়মড় আওয়াজ হলো, ব্যথায় কাতরে উঠল লোকটা, নাইন মিলিমিটারের পিস্তল উড়ে চলে গেল একদিকে। ঘাড় ধরে ক্রুনাকে তুলে আনল কুয়াশা, টান দিয়ে ফেলে দিল পিছনে। তারপর চড়ে বসল খুনির বুকে। নির্দয়ের মত ঘুসি চালাতে থাকল নাক-মুখে। উন্মাদ হয়ে গেছে, থামছে না এক মুহূর্তের জন্যও।

মারের চোটে রক্তাক্ত হয়ে গেল খুনির মুখ। ঠোঁট ফেটে গেল, বসে গেল নাক, ভাঙলো দাঁত, থেঁতলে গেল পুরো মুখের মাংস। ভুরুর চামড়া ছিঁড়ে নেমে এল চোখের উপর। নিজেকে সামলে নিয়ে পিছন থেকে হামলা করল ক্রুনা, চেষ্টা করল কুয়াশাকে নিজের অনুচরের উপর থেকে সরিয়ে আনতে, কিন্তু সফল হলো না। পাঁজরের নীচে কুয়াশার কনুইয়ের বেমক্কা এক আঘাত পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে।

পরাস্ত খুনির চেহারার নকশা পাল্টে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। শান্ত ভঙ্গিতে কুড়িয়ে নিল নাইন মিলিমিটারের অটোমেটিকটা।

ফিরে এসে ওটা তাক করল লোকটার পায়ের দিকে।

'এগুলো আইভান শেভচেঙ্কোর জন্য,' বলে দুই হাঁটুতে গুলি করল ও। 'আর, এগুলো নাতালিয়ার জন্য।' বলে দুই কনুইও উড়িয়ে দিল।

হাড়ের জয়েন্ট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ায় অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছে খুনি, নির্বিকার রইল কুয়াশা। পিস্তলের নল ঘুরে গেল পেটের দিকে। শীতল গলায় বলল, 'আর এগুলো হলো বোনাস!'

লোকটার পেটে পিস্তলের ম্যাগাজিন খালি করল ও। গোঙানির বেশি আর কিছু করতে পারল না খুনি। সীমাহীন কষ্টে পুরো নার্ভ-সিস্টেম অচল হয়ে যেতে বসেছে। তিলে তিলে মরবে সে এভাবে। এরচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না।

নাইন মিলিমিটার ফেলে দিয়ে এবার নিজের পিস্তল তুলে নিল কুয়াশা। মন দিল ক্রুনা ভরগেনের দিকে। এখনও পাঁজরের ব্যথায় বাঁকা হয়ে আছে সে। চুল ধরে মহিলাকে দাঁড় করাল ও, পিস্তল ঠেকাল ঘাড়ে।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুনা।

'দুটো পথ আছে তার জন্যে,' কঠিন গলায় বলল কুয়াশা। 'হয় আমার কথা শোনো, নয়তো তোমার সৈনিকদের মত গিলে ফেলো সায়ানাইড পিল।'

'আমার কাছে সায়ানাইড পিল নেই। নেতারা আত্মহত্যা করে না।' শরীর মোচড়াল ক্রুনা। 'মরণ যদি কারও হয় এখানে, সেটা হবে তোমার!'

'হয়তো,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু একা যাব না আমি, তুমিও সঙ্গে যাবে। নড়াচড়া বন্ধ করো, এখুনি গুলি চালাবার ইচ্ছে নেই আমার।'

স্থির হয়ে গেল ক্রুনা। ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী চাও তুমি?'

'ইনফরমেশন।'

'গুড, আমিও চাই তা। যদি বাঁচতে চাও তো বলো, রাখাল বালক সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

মুঠোয় ধরা চুলে টান বাড়াল কুয়াশা। 'প্রশ্ন যা করবার, তা আমি করব।'

'বোকামি করছ তুমি, কুয়াশা। বাঁচার কোনও উপায় নেই তোমার। আমাকে সহযোগিতা করলে ভাল করবে।'

পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে মহিলার গালে খোঁচা মারল কুয়াশা। 'পরিস্থিতি কিন্তু উল্টো কথা বলছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রুনা। 'বেশ, তা-ই ভেবে যদি সন্তুষ্ট থাকো, তাতে আমার কী?' মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'কী জানতে চাও তুমি?'

'ফেনিসের উদ্দেশ্য কী?'

'শৃঙ্খলা।'

'অথচ দুনিয়াকে বিশৃঙ্খলার অতলে তলিয়ে দিচ্ছ তোমরা!'

'ওর মাঝ দিয়েই আবার ফিরে আসবে শৃঙ্খলা... আমরাই ফিরিয়ে আনব সেটা। যাদের নিয়ন্ত্রণে এই পৃথিবীর থাকা উচিত, তাদের মাধ্যমে!'

'লেকচার শুনতে চাই না। তোমাদের প্ল্যান জানতে চাই আমি।'

'সেটা একমাত্র রাখাল বালক জানেন। আমরা শুধু ছোট ছোট মিশন সম্পন্ন করি।'

'কে এই রাখাল বালক? কী তার পরিচয়?'

'সেটা কোনোদিনই তুমি জানতে পারবে না আমার কাছ থেকে।'

'বলতেই হবে তোমাকে! নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

'টরচার করবে?' হাসল ক্রনা। 'সময় কোথায় তোমার? চ্যাপেলটা মাটির তলায় বলে গুলির শব্দ হয়তো শোনা যায় না বাইরে, তার মানে এই নয় যে অনন্তকাল থাকতে পারবে এখানে। খুব শীঘ্রি কেউ না কেউ আমার খোঁজ নিতে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে এস্টেট থেকে বেরিয়ে যাব আমরা... তুমিই নিয়ে যাবে আমাকে। ভেবো না মুখ বন্ধ রাখলেই গোপন থাকবে সবকিছু।' মেঝেতে পড়ে থাকা খুনির দিকে তাকাল। 'ওর পেটে গুলি করেছি কেন, জানো? মরার আগে যেন জানিয়ে যেতে পারে কী ঘটেছে। ভরগেন সাম্রাজ্যের মাথাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কী করে ফেনিস, তা দেখব আমি আড়াল থেকে। মুখ খোলানোর জন্য কাকে এরপর ধরতে হবে, সেটা বুঝতে পারব তখন।'

'না-আ!' প্রতিবাদ করল ক্রনা। 'যাব না আমি তোমার সঙ্গে।'

'তা হলে তুমি মরবে,' কাটা কাটা স্বরে বলল কুয়াশা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, একাকী এখানে ঢুকতে যখন পেরেছি, বেরিয়েও যেতে পারব।'

'অসম্ভব! চ্যাপেলে আসার আগে অর্ডার দিয়ে এসেছি আমি—কাউকে যেন এস্টেট থেকে বের হতে দেয়া না হয়।'

'বেরুতে যাচ্ছে কে?' নিজের পোশাক দেখাল কুয়াশা। 'ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড... নিজের পোস্টে ফিরবে। সেখান থেকে গায়েব হয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে। কে সন্দেহ করবে আমাকে? আমি বুঝতে পেরেছি, গার্ড-রা ফেনিসের লোক নয়; সাধারণ প্রহরী—ধনী লোকজনকে পাহারা দেয়াই ওদের একমাত্র পেশা।' পিস্তলটা ক্রনার ঘাড়ে ভালমত চেপে ধরল কুয়াশা। 'এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নাও—আমার সঙ্গে যাবে, নাকি পড়ে থাকবে পোষা কুকুরটার পাশে।'

চোখের দৃষ্টি বদলে গেল মহিলার। হার মানল। নিচু গলায় বলল, 'বাবার গাড়িটা ব্যবহার করতে পারি আমরা। চলো।'

'কোনও চালাকি নয়, ক্রুনা!' হুমকি দিল কুয়াশা।

'তার প্রয়োজন পড়বে না। তুমি আমার কাছে ইনফরমেশন চাইছ... আমিও তোমাকে চমকে দেবার মত একটা তথ্য জানি। ওটা শোনার পর বুঝতে পারবে, লড়াই করা বৃথা। আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় তোমার নেই...'

'যথাসময়ে সেটা দেখা যাবে,' বলে ক্রুনার চুল ছেড়ে দিল কুয়াশা। 'হাঁটো। আমি তোমার পিছনে থাকছি।'

গ্যারাজ থেকে ওয়ালথার ভরগেনের লিমাজিনটা ধার করল ওরা। ড্রাইভিং সিটে থাকল ক্রুনা, কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার পাশে বসল কুয়াশা। ইতিমধ্যে খুলে ফেলেছে গার্ডের জ্যাকেট, ঊর্ধ্বাঙ্গে স্রেফ একটা সাদা শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই এ-মুহূর্তে। হাবভাব দেখে মনে হবে ক্রুনা ভরগেনের নতুন প্রেমিক। মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে রাখল ও; নীচে, পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে রাখল তার পাঁজরের একপাশে।

ধীরগতিতে এস্টেটের মূল ফটকে পৌঁছুল লিমাজিন। দু'জন গার্ড এগিয়ে এল আরোহীর পরিচয় জানার জন্য। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ট্রিগারের উপর প্রস্তুত থাকল কুয়াশার আঙুল। কিন্তু না, কোনও কৌশল খাটাবার চেষ্টা করল না ক্রুনা, হাতের ইশারায় গেট খুলতে বলল গার্ডকে। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল তারা, একটু পর মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে সরে গেল পাল্লা। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্রুনা।

বাঁয়ে মোড় নিতে যাচ্ছিল সে, খপ্ করে এক হাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরল কুয়াশা, ঘুরিয়ে দিল ডানে। মাতালের মত দুলে মুখ

ঘোরাল লিমাজিন, রাস্তায় সিধে হবার পর হাত সরিয়ে আনল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাড়িয়ে দিল বাম পা, ক্রনার পায়ের উপর দিয়ে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। হু হু করে ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রনা। 'কী করছ তুমি?'

'ফাঁদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছি,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। 'এসেনের রাস্তায় নিশ্চয়ই আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ক্রনার, কুয়াশার সন্দেহই ঠিক। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আ... আমি...'

'রিল্যাক্স। একেবারে শান্ত-সুবোধ মেয়ে হয়ে যাবে, তা আশা করিনি আমি। কিন্তু এটাই তোমার লাস্ট চান্স।' পা সরিয়ে আনল কুয়াশা। 'ঠিকমত ড্রাইভ করো। ষাটের নীচে যেন না নামে স্পিড।'

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে দশ মাইল গেল লিমাজিন। এরপর একটা ওয়াই-জাংশান। ডানের পথ ধরতে চাইছিল ক্রনা, কিন্তু স্টিয়ারিং ধরে আবার আগের পদ্ধতি অনুসরণ করল কুয়াশা, গাড়িকে ঘুরিয়ে নিল বাঁয়ের পথটাতে।

'অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে তুমি!' রাগী গলায় বলল ক্রনা। 'কোন্‌দিকে যেতে চাও, সেটা আমাকে বললেই হয়!'

'তোমাকে কিছুই বলতে বাধ্য নই আমি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কুয়াশা। জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে লিমাজিন। দু'পাশে এখন ফসলের খেত, কোথাও কোথাও ফাঁকা মাঠ। সামনের একটা খালি জায়গার দিকে আঙুল তাক করল। 'রাস্তা থেকে নামো। ওখানে নিয়ে দাঁড় করাও গাড়ি।'

'কী?'

পিস্তল উঁচু করে ক্রনার কপালের পাশে ঠেকাল কুয়াশা। 'এক

কথা দু'বার বলতে পছন্দ করি না আমি।'

স্টিয়ারিং ঘোরাল ক্রনা। খালি জায়গাটায় পৌঁছে ব্রেক কষল। হাত বাড়িয়ে ইগনিশন বন্ধ করল কুয়াশা, চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরল। পিস্তলের ইশারায় নামতে বলল বন্দিনীকে। নিজেও নামল। দু'জনে শুরু করল হাঁটতে। মাঠের মাঝখানে পৌঁছে থামল। মাথার উপরে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ, দূরে একটা ফার্মহাউস চোখে পড়ল। কোনও আলো জ্বলছে না, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে ওখানকার বাসিন্দারা।

মৃদু হাওয়ায় ঢেউ উঠেছে গমের খেতে। সেদিকে তাকিয়ে নার্ভাস গলায় ক্রনা জানতে চাইল, 'এখানে কী?'

'একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে,' শীতল গলায় বলল কুয়াশা। 'দেখব, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবার সাহস আছে কি না তোমার।'

ভয় দেখা দিল ক্রনার চোখের তারায়। নার্ভাস গলায় বলল, 'পাগলামি কোরো না, কুয়াশা। আমাকে খুন করে কোনও লাভ হবে না তোমার। অনেক এগিয়ে গেছি আমরা... পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই বেঁচে থাকা দরকার এখন আমাদের।'

'ভুল। খুনিদের হাতে কারও কোনদিন মঙ্গল হতে পারে না।'

'কেন হবে না? খুনের মাধ্যমে যদি মন্দ লোকদেরকে সরিয়ে দেয়া যায়, সেটা মঙ্গল নয়? সময় আছে, কুয়াশা, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। জীবন বদলে যাবে তোমার।'

'লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু দুঃখিত, রাজি হতে পারছি না আমি।'

'তা হলে নিজেরই ক্ষতি করছ। বলেছি তো, আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই তোমার হাতে...'

'ও হ্যাঁ... আমাকে চমকে দেবে বলেছিলে। কী সেটা?'

'মাসুদ রানা মারা গেছে, কুয়াশা। তুমি এখন একা!'

সত্যি সত্যি চমকে উঠল কুয়াশা। এ কী শুনছে! রানা মারা গেছে? কখন? কীভাবে? তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ক্রনার মুখের দিকে। না, ধাপ্পা দিচ্ছে বলে মনে হলো না।

'কোথায় মারা গেছে ও? কবে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

'ওয়াশিংটনে। কয়েক দিন আগে... রক ক্রিক পার্কে।'

ধন্দে পড়ে গেল কুয়াশা। যে-ঘটনার কথা বলছে মহিলা, সেখানে ওর নিজেরও ভূমিকা ছিল। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও আর রানা। হামলা একটা চালানো হয়েছিল বটে, অ্যাডমিরালও আহত হয়েছেন, কিন্তু বহাল তবিয়তেই ফিরে এসেছে ওরা দু'জন। তা হলে...

হঠাৎ বুঝতে পারল কুয়াশা, ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে ক্রনা ভরগেনকে। কে দিয়েছে? কেন? তবে কি ফেনিসের ভিতর থেকে কেউ সাহায্য করতে চাইছে ওদেরকে? সেজন্যেই প্রচার করেছে রানার মৃত্যুর মিথ্যে সংবাদ? ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

ওর নীরবতার ভুল অর্থ করল ক্রনা। নার্ভাসনেস দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। বলল, 'বুঝতেই পারছ, তুমি একা। কিছুই করতে পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে। শত্রুতা ভুলে গিয়ে হাত মেলালেই ভাল করবে। তুমি একটা প্রতিভা, কুয়াশা। তোমার মত লোকের প্রয়োজন আছে আমাদের সংগঠনে।'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল কুয়াশা। ঠিক আছে, একটু বাজিয়ে দেখা যাক। বলল, 'হুম, মনে হচ্ছে ঠিক কথাই বলছ তুমি। কিন্তু আমাকে কনভিন্স করতে চাইলে কোনও কিছুই গোপন রাখা চলবে না। ফেনিস সম্পর্কে সবকিছু বলতে হবে তোমাকে। তোমাদের উদ্দেশ্য, কাজের ধারা, রাখাল বালকের পরিচয়... সব!'

'অস্থির হবার কিছু নেই, ডার্লিং,' হাসল ক্রনা। একে একে কোট আর শার্টের বোতাম খুলল। কাপড় সরিয়ে দেখাল নিজের

বুকের বৃত্তাকার উল্কি। আসলে প্রলোভিত করতে চাইছে শিকারকে। 'এ-জিনিস যখন তোমার বুকেও শোভা পাবে, তখন মিলবে সব প্রশ্নের জবাব।'

'গায়ে উল্কি করাবার আগ্রহ নেই আমার,' চাঁছাছোলা গলায় জানাল কুয়াশা। 'আমার কৌতূহল এখুনি মেটাতে হবে তোমাকে।'

'গোঁয়ার্তুমি কোরো না...'

ক্রুনার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই চোখে পড়ল এক জোড়া হেডলাইট, রাস্তা ধরে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা গাড়ি। লিমাজিনকে দেখতে পেয়ে দিক বদলাল, নেমে এল মাঠে। থামল পাশে গিয়ে। দরজা খুলে ঝটপট নামল চারটা ছায়ামূর্তি। সবার হাতে রাইফেলের অবয়ব দেখা গেল।

'ওরা আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে,' বলল ক্রুনা। 'তোমার জবাব, কুয়াশা! বাঁচার কোনও উপায় নেই, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই? পিস্তলটা দিয়ে দাও আমাকে। আমার একটা আদেশে জীবন বদলে যেতে পারে তোমার। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু!'

শান্ত চোখে চারপাশ জরিপ করল কুয়াশা। গমখেতের মধ্যে কাভারের অভাব নেই। আলো-আঁধারিও যথেষ্ট সাহায্য করবে ওকে। পালিয়ে যেতে কষ্ট হবে না। ওটাই সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু কেন যেন নড়তে পারল না। ভাবছে ক্রুনার ভাষ্য নিয়ে। সত্যিই যদি ফেনিসের ভিতরে কোনও মিত্র থাকে, তার নাগাল পাওয়া দরকার। আর সেজন্যে একটাই পথ দেখতে পাচ্ছে।

'কুইক!' তাড়া দিল ক্রুনা। 'তোমার সিদ্ধান্ত জানাও!'

বড় শ্বাস নিল কুয়াশা। পিস্তলটা উল্টো করে ধরে বাড়িয়ে দিল ক্রুনার দিকে। বলল, 'আমি রাজি। তোমার লোকদেরকে থামতে বলো।'

'এতদিনে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করলে,' সন্তোষ ফুটল ক্রুনার কণ্ঠে। কুয়াশার হাত থেকে পিস্তল নিয়ে উল্টো ঘুরল। এগোল কয়েক পা। গলা চড়িয়ে বলল, 'অ্যাই, থামো তোমরা। গুলি করবার দরকার নেই।'

একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল, আলোকরশ্মি আছড়ে পড়ল মহিলার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল কুয়াশা কী ঘটতে চলেছে। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ব্যস্ত মাত্র একজন, বাকি তিনজন ফ্রি। ওর গায়ে নয়, আলোটা ফেলা হয়েছে ক্রুনার গায়ে। একটাই অর্থ এর, নতুন আদেশ পেয়েছে খুনিরা। পাশের শস্যখেত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ও।

পরমুহূর্তে আগুন ঝরাল তিন রাইফেল। এক পশলা বুলেট ছুটে এল অরক্ষিত ক্রুনা ভরগেনকে লক্ষ্য করে। বুক-পেট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার, ভারী শেলের আঘাতে ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে দেহটা মাটি স্পর্শ করবার আগেই।

আলো ঘুরে গেল কুয়াশার খোঁজে, একই সঙ্গে রাইফেলের নল। হামাগুড়ি দিতে দিতে আবারও গুলির আওয়াজ শুনল কুয়াশা, ওর চারপাশে ধুলো ওড়াল ব্যর্থ বুলেট। নিচুস্বরে ভাগ্যকে গাল দিয়ে উঠল ও। পিস্তলটা হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হয়নি।

কয়েক দফা গুলি ছুঁড়ে থেমে গেল খুনির দল। ধীরে ধীরে এগোল সামনে। সবার হাতেই এবার জ্বলে উঠেছে ফ্ল্যাশলাইট, খেতের মাঝখানে আলো ফেলে খুঁজছে কুয়াশাকে। মাঠের মাঝখানে ছোট একটা খোঁড়ল পেয়ে তাতে শরীর সেঁধাল কুয়াশা। গোড়া থেকে কয়েকটা গমগাছ উপড়ে এনে ঢেকে ফেলল দেহের উপরিভাগ। একটু পরেই শুনতে পেল পদশব্দ। ওর খুব কাছে এসে গেছে একজন খুনি।

লোকটাকে পেরিয়ে যেতে দিল কুয়াশা, তারপর ভূতের মত

উঠে দাঁড়াল পিছনে। শব্দ শুনে ঘোরার চেষ্টা করল খুনি, কিন্তু তার আগেই বাম হাতের ভাঁজে তার গলা আটকে ফেলল ও। রাইফেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করল না, তার বদলে লোকটার কোমরের হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল। গোলমালের আভাস পেয়ে ঘুরতে শুরু করেছে বাকি তিনটে ফ্ল্যাশলাইট, বিন্দুমাত্র দেরি না করে গুলি করল ও। একবার... দু'বার... তিনবার!

খুনিদের হাত থেকে সশব্দে খসে পড়ল ফ্ল্যাশলাইট আর রাইফেল... পিছু পিছু প্রাণহীন দেহ। হাতের ভাঁজে আটকানো লোকটার মাথার একপাশ আঁকড়ে ধরল কুয়াশা। প্রচণ্ড এক ঝটকায় মটকে দিল ঘাড়। অস্ফুট আর্তনাদ করল সে, মুক্তি দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। থেমে গেছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুয়াশা। লম্বা কদম ফেলে হাঁটতে শুরু করল লিমাজিনের দিকে।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর লুফথানসা এয়ারলাইন্সের বিমানে দেখা গেল কুয়াশাকে, ইকোনমি ক্লাসের শেষ সারির একটা সিটে নিঃসঙ্গভাবে বসে আছে। আবারও নিয়েছে বৃদ্ধের ছদ্মবেশ। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কফি দিয়ে যাওয়ায় মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানাল, তারপর ডুবে গেল আপন চিন্তায়।

আর একঘণ্টা পর প্যারিসে ল্যাণ্ড করবে ও। কর্সিকান মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে যোগাযোগ করবে রানার সঙ্গে। আলাদাভাবে এগোনোর পালা শেষ। এ-মুহূর্তে একসঙ্গে কাজ করা দরকার ওদের। খুব দ্রুত ঘটছে সব ঘটনা। তাল মেলানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে রানার সঙ্গে যোগ দিতে হবে ওকে।

মারিয়া মাযোলা-র কাছ থেকে পাওয়া অতিথি-তালিকার দুটো নাম ভেরিফাই করা হয়েছে—বিয়াঞ্চি আর ভারাকিন। দু'জনের

উত্তরাধিকারীই মৃত... খুন করা হয়েছে ওদের চোখের সামনে। পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বলি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। এদের মৃত্যু একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছে—কাউন্সিল-সদস্যদের বংশধররা খরচযোগ্য... ওরা মরে গেলেও কিছু যায়-আসে না। কাউন্ট বারেমির আদর্শের সত্যিকার উত্তরসূরি এখন অন্য কেউ... মার্সেলো বিয়াঞ্চি আর ক্রুনা ভরগেন তাদের বার্তাবাহক ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওরা নিজেরাও হয়তো জানত না সেটা।

কথা হলো, তালিকার শেষ দুই অতিথির বংশধর... ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি নাইজেল উইটিংহ্যাম এবং অ্যামেরিকান কংগ্রেসের সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড-এর স্ট্যাটাস-ও একই ধরনের কি না। তাদের বুকেও কি পাওয়া যাবে বৃত্তাকার ওই উল্কি? এখন পর্যন্ত যা দেখেছে, তাতে তো মনে হচ্ছে ওটা অকালমৃত্যুর প্রতীক। উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকেই মারা পড়েছে কুয়াশার চোখের সামনে।

রানা এখন ইংল্যাণ্ডে তদন্ত করছে। অথচ ওর-ই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ফেনিস-সদস্যদের মধ্যে। কেন? কী উদ্দেশ্যে? কে চেষ্টা করছে রানাকে বাঁচাবার?

যতই ভাবছে, ততই ঘোঁট পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কুয়াশা, এসব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলে রাখাল বালক নামের ওই রহস্যময় লোকটার কাছে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেদিকে এক কদমও এগোতে পারেনি ওরা। হতাশা অনুভব করল ও।

কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল কুয়াশা। চোখ ফেরাল পাশে। আইলের ওপাশের সিটে বসেছে এসেনের এক ব্যবসায়ী। ঘুমিয়ে গেছে লোকটা, কোলের উপর পড়ে আছে আজকের খবরের কাগজ। ওটার উপরে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি আটকাল কুয়াশার,

পরমুহূর্তে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কাগজটা।

প্রথম পাতার নীচদিকে ছাপা হয়েছে হাইনরিখ বোহ্‌লের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। সঙ্গে শিরোনাম: *অ্যাডভোকেট মার্ডারড্!* তাড়াতাড়ি পড়ল খবরটা।

গতকাল রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী **হাইনরিখ বোহ্‌ল। পথরোধ** করে তাঁর গাড়ি থামায় অজ্ঞাতনামা আততায়ী, উপর্যুপরি **গুলি** চালায় তাঁর বুকে-পেটে। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তার তাঁকে **মৃত ঘোষণা** করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এ-ঘটনাকে পুরনো শত্রুতার জের বলে ধারণা করছে, তবে বিস্তারিত তদন্তের আগে কোনও ধরনের মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা...

তীব্র অনুশোচনায় মাথা নাড়ল কুয়াশা। গতকাল স্ট্যাডওয়াল্ড থেকে ফেরার পর কয়েক দফা ফোন করেছিল ও বোহ্‌লের কাছে, একবারও রিসিভ করা হয়নি সেই ফোন। **শেষ** পর্যন্ত ভয়েস মেইলে মেসেজ দিয়ে রেখেছিল... সতর্ক করে দিয়েছিল তাকে। এখন বুঝতে পারছে, অযথাই চেষ্টা করেছে; হল অভ রেকর্ডস থেকে বাড়িই ফিরতে পারেনি বেচারা, পথেই শিকার হয়েছে ফেনিসের আততায়ীদের। ওর জন্য... শুধু ওরই জন্য মারা গেল আরেকজন নিরপরাধ **মানুষ। সাহায্য** চাইতে গিয়ে ও-ই তো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে বোহ্‌লকে!

নিজেকে একেবারে অসহায় **মনে হলো** কুয়াশার। ফেনিসকে মনে হলো পৌরাণিক কোনও দানব... **একটা মাথা** কাটলে বেরিয়ে আসছে দশটা মাথা। কীভাবে লড়বে এই দানবের **সঙ্গে?** আদৌ কি একে পরাস্ত করা সম্ভব?

সময়ই তা বলে দেবে।

বারো

চ্যারিং ক্রস স্টেশন থেকে দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে এল রানা, মিশে গেল স্ট্র্যাণ্ড-মুখী পথচারীদের ভিড়ে। বার কয়েক মাথা ঘুরিয়ে পিছনটা দেখল, ওকে অনুসরণ করা হবে বলে আশঙ্কা করছে। মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে ভাগ্যকে, এমনিতেই বিপদে আছে, সেটার মাত্রা আরও বেড়েছে কয়েক মিনিট আগে। স্টেশনের ভিতরে দেখা হয়ে গেছে এক আমেরিকানের সঙ্গে—লোকটা সিআইএ-র লণ্ডন শাখার লোক। হালকা ছদ্মবেশ নিয়েছে রানা, কিন্তু অভিজ্ঞ চোখের জন্য সেটা যথেষ্ট নয়। ওর দিকে তাকিয়ে ব্যাটা যেভাবে চমকে উঠল, তাতে সন্দেহ নেই যে ওকে চিনে ফেলেছে সে। এতক্ষণে হয়তো গ্রসভেনর স্কয়্যারের আমেরিকান এম্বাসিতে খবরও দিয়ে ফেলেছে: জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের হত্যাকারীর খোঁজ পাওয়া গেছে লণ্ডনে। লোকটা ফাঁকি দিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু তাতে বিপদ কমেনি একবিন্দু। খুব শীঘ্রি সিআইএ-র লণ্ডন নেটওঅর্ক সক্রিয় হয়ে উঠবে। ওকে খুঁজে বের করার জন্য মাঠে নামানো হবে স্থানীয় সমস্ত এজেন্ট, কন্ট্যাক্ট আর ইনফর্মারদেরকে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাহায্য নেয়া হবে বলে মনে হয় না, এসব কাজ আমেরিকান-রা একাকী করতে ভালবাসে। তাতে ওদের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে পারে না কেউ।

ট্রাফাল্গার স্কয়্যারে পৌঁছে ইন্টারসেকশন পেরুল রানা। সন্ধ্যার ভিড়ের মাঝখানে লুকাল নিজেকে। ঘড়ি দেখল—সোয়া ছ'টা বাজে; তারমানে প্যারিসে সোয়া সাতটা। আধঘন্টা পর সোনিয়াকে রু দ্য বাখ্-এর ফ্ল্যাটের নাম্বারে ফোন করবার কথা, কিন্তু তার আগে বদলে নিতে হবে বেশভূষা। সিআইএ এজেন্ট ওর পোশাকের বর্ণনা দিয়েছে নিঃসন্দেহে, দূর থেকে উইগুব্রেকার আর ময়লা ক্যাপ দেখে ওকে স্পট করে ফেলতে পারে অনুসন্ধানকারীরা।

কাছেই একটা ক্লোদিং স্টোর দেখতে পেয়ে তাতে ঢুকে পড়ল রানা। নতুন শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, হ্যাট আর জুতো কিনল। ট্রায়াল রুমে ঢুকে পরে ফেলল ওগুলো। পুরনোগুলো দান করে দিল স্কয়্যারের কোণে হাত পেতে বসে থাকা এক ভিখিরিকে। তারপর হাঁটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে। হে-মার্কেটের টেলিফোন কাউন্টারে পৌঁছে থামল। অপারেটরকে টাকা দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা কাঁচের বুথে।

কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়ির ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। সাতটা বাজতে দশ মিনিট। সোনিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর ফোনের। প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগের ইচ্ছে ছিল না রানার, কিন্তু রোজ ফোন করার শর্তটা ও-ই দিয়েছে। রানার কণ্ঠ না শুনলে নাকি অস্থিরতা অনুভব করে। আপত্তি করেনি রানা, মেয়েটার অনিশ্চয়তা-ভরা জীবনে এ-মুহূর্তে ও-ই একমাত্র আশ্রয়স্থল। ওর উপরেই ভরসা রাখছে সোনিয়া, সেটা কিছুতেই হারাতে দেয়া যাবে না।

রিসিভার তুলে প্যারিসের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। রিং হলো কি হলো না, ওপাশ থেকে ভেসে এল মেয়েটির সুরেলা কণ্ঠ। 'হ্যালো?'

বুকের ভিতর আলোড়ন অনুভব করল রানা। জানে উচিত হচ্ছে না, তা-ও কেন যেন সোনিয়ার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। ওর কণ্ঠ শোনার জন্য সোনিয়া যেমন উতলা, রানা নিজেও সে-তুলনায় কম নয়। প্রেম, নাকি ক্ষণিকের আবেগ,.. বলতে পারবে না ও।

গলা খাঁকারি দিল রানা। 'কোনও খবর আছে?'

'কুয়াশা এসেছে।'

'প্যারিসে? কখন?'

'কাল রাতে। চেহারা-সুরত দেখে মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে।'

'কথা বলতে দাও আমাকে।'

একটু নীরবতা। তারপরেই শোনা গেল কুয়াশার কণ্ঠ। 'কেমন আছ, রানা?'

'ভাল। কী খবর ওদিককার?'

'মিশন সাকসেসফুল বলতে পারো। অনেককিছু জানতে পেরেছি।'

'ভারাকিন?'

'জার্মানিতে মাইগ্রেট করেছিল সে। নাম বদলে ভরগেন হয়েছে। অ্যানসেল ভরগেন।'

'ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড!' চমকে উঠল রানা। 'সে তো বিশাল ব্যাপার!'

'কারেক্ট। আশি সালে মারা গেছে প্রিন্স ভারাকিন। এক ছেলে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ছেলে আদর্শবাদী বলে তার হাতে তুলে দেয়নি ফেনিস কাউন্সিলের পদ। দিয়ে গেছে নাতনিকে—ক্রুনা ভরগেন... তার নাম হয়তো শুনেছ তুমি।'

'এখন কোথায় আছে ওরা?'

'দু'জনেই মারা গেছে। আমার সামনে বাপকে খুন করিয়েছে ক্রুনা, পরে ওকে খুন করেছে ফেনিসের খুনিরা... সম্ভবত আমি ওর পরিচয় জেনে ফেলেছি বলেই।'

'কাউন্ট বিয়াঞ্চির মত।'

'এগজ্যাক্টলি,' একমত হলো কুয়াশা। 'ওরা আসলে হর্তা-কর্তা ছিল না সংগঠনের। ক্রুনার ভাষ্যমতে, রাখাল বালকের নির্দেশে ছোট ছোট মিশন সম্পন্ন করাই ছিল ওদের দায়িত্ব।'

'তারমানে ওই রাখাল বালক-ই ফেনিসের মাথা, এই তো?'

'হুম। তবে ক্রুনা মারা যাওয়ায় একদিক থেকে ভাল হয়েছে। ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ এখন নেতৃত্বশূন্য। কোম্পানিটার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে হলে নিজস্ব কাউকে ম্যানেজমেন্টের মাথায় বসাতে হবে ফেনিসকে। একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। দেখা যাক, কে হাল ধরে ভরগেনের।'

'মনে হচ্ছে আমার মত একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আপনি—বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে ফেনিস সারা দুনিয়ায়।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু কীভাবে কী করতে চাইছে, তা-ই বুঝতে পারছি না। কাজ-কারবারের কোনও মাথামুণ্ডু নেই ওদের।'

'আর কিছু?'

'তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার—আমাদের ফাইল মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে স্টাডি করেছে ওরা। সমস্ত কন্ট্যাক্ট—শত্রু, মিত্র... কাছের, দূরের... সব ওদের জানা। অলরেডি লেনিনগ্রাদ আর এসেনে আমার তিনজন বন্ধুকে খুন করেছে ওরা। কারও সাহায্য নেবার আগে ব্যাপারটা মাথায় রেখো।'

'ফাইলে যাদের নাম নেই, তাদেরকে ব্যবহার করব। তা ছাড়া... ফাইলে যত লোকের নাম আছে, তাদের সবাইকে কাভার দেয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'আমিও ও-কথা ভেবেছিলাম, সে-কারণে খুব ঘনিষ্ঠ তিনজনকে হারিয়েছি। সাবধানে থেকো। আর হ্যাঁ... উল্কির কথা বলেছিলাম আমার মেসেজে... মনে আছে?'

'হুঁ। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। একদল খুনি কেন নিজের গায়ে মোছার অযোগ্য চিহ্ন দিয়ে রাখবে?'

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্য,' বলল কুয়াশা। 'আরেকটা ব্যাপার বলা হয়নি তোমাকে—ওরা সুইসাইডাল। প্রাণ থাকতে ধরা দেয় না, মুখের মধ্যে সায়ানাইড পিল নিয়ে ঘোরে। আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, যতটা বড় বলে দেখানোর চেষ্টা চলছে, আসলে তত বড় নয় ফেনিসের দলটা। একান্ত অনুগত সৈনিকের সংখ্যা বেশ কম... ওদেরকে পাঠানো হয় নির্বাচিত এলাকায়, সিরিয়াস ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য। সাধারণ কাজগুলো সারা হয় সেকেণ্ড বা থার্ড পার্টির ভাড়াটে লোক দিয়ে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কীসের কথা বলছেন আপনি, বুঝতে পারছেন?'

'অবশ্যই!' বলল কুয়াশা। 'হাসাসিন—শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ্‌র মধ্যযুগীয় খুনি গোত্র। মানবহত্যাকে ধর্ম হিসেবে নিয়েছিল ওরা, প্রাণ উৎসর্গ করত তার জন্য।'

'মধ্যযুগের ওই ধর্মের আধুনিকায়ন করল কীভাবে?'

'আমার একটা থিয়োরি আছে এ-ব্যাপারে। দেখা হলে আলোচনা করা যাবে।'

'দেখা হচ্ছে আমাদের? কখন?'

'আগামীকাল রাতে... কিংবা পরশু সকালে। ছোট একটা

বিমান ভাড়া করব। হিথ আর অ্যাশফোর্ডের মাঝখানে একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ড আছে, ল্যাণ্ড করব ওখানে। আগেও বেশ কয়েকবার এভাবে ঢুকেছি ইংল্যাণ্ডে। রাত একটার মধ্যে পৌঁছুতে পারব বলে আশা করছি। তুমি কোথায় উঠেছ?'

সাঙ্কেতিক ভাষায় ঠিকানা দিল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল কুয়াশা। 'খুব শীঘ্রি দেখা হবে আমাদের। সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলবে?'

'হ্যাঁ।'

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার।

নিজের অফিসে বসে কাজ করছেন বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলো, ইণ্টারকম বেজে উঠল হঠাৎ করে। সামনে রাখা ফাইল থেকে দৃষ্টি সরালেন না তিনি, হাত বাড়িয়ে আলগোছে তুলে নিলেন রিসিভার। কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?'

'এক্সকিউজ মি, স্যর,' ওপাশ থেকে সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল। 'বিরক্ত করতে মানা করেছিলেন আপনি, কিন্তু একটা জরুরি কল আছে...'

'কে করেছে?'

'নাম বলছে না। শুধু বলল, আপনাকে রাজহাঁস শিকারের কথা মনে করিয়ে দিতে। তা হলেই নাকি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন আপনি।'

চমকে উঠলেন মি. লংফেলো। রাজহাঁস শিকার... ওটা মাসুদ রানার কোড!

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। বয়েসের বিস্তর পার্থক্য থাকায়, ব্যক্তি হিসেবে প্রিয় বলেও, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন মারভিন লংফেলো; তবে

স্নেহ ছাড়াও ওর প্রতি তাঁর সমীহ ও শ্রদ্ধার ভাবও আছে, কারণ বিপদে-আপদে অতীতে বহুবার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে সাহায্য করেছে রানা, এখনও করে। ওর সঙ্গে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন লংফেলো, তাই বিভিন্ন রকম কোড ঠিক করে রাখা হয়েছে।

'ঠিক আছে, লাইন দাও।'

খুটখাট শব্দ হলো, কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল রানার পরিচিত কণ্ঠ। 'হ্যালো, স্যর। কেমন আছেন?'

'একটু ধরো,' বললেন লংফেলো। 'আমি স্ক্র্যাম্বলার অন্ করছি।' টেলিফোন সেটের গায়ে একটা বোতাম চাপলেন তিনি। 'চালু হয়ে গেল ভয়েস এনক্রিপশন। আড়ি পাতলেও এখন আর ওঁদের কথা বুঝতে পারবে না কেউ। হ্যাঁ, এবার বলো।'

'আমার মিশন সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাহাত কিছুটা আভাস দিয়েছে। তুমি এখন কোথায়? গ্রসভেনর স্কয়্যার থেকে তোমার নামে একটা অ্যালার্ট জারি হয়েছে, সেটা জানো?'

'আপনি জানেন?' একটু অবাক হলো রানা। 'আমেরিকান-রা সাহায্য চেয়েছে বিএসএস-এর?'

'উঁহুঁ,' নেতিবাচক জবাব দিলেন লংফেলো। 'নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়েছি আমরা। ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমেরিকানরা মুখে তালা এঁটে রেখেছে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পরিণতির কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, স্যর। আমার ধারণা, আপনার পিছনে লোক লাগানো হয়েছে।'

'কী যে বলো না!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল মি. লংফেলোর কণ্ঠে।

এখানে... লণ্ডনের মাটিতে বিএসএস চিফের পিছনে লোক লাগাবে? এত সাহস হবে না সিআইএ-র।'

'আমেরিকানদের কথা বলছি না,' বলল রানা। 'আমার বসের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন ফেনিস সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না। একটা গুপ্তসংঘ এত শক্তিশালী হতে পারে না।'

'প্লিজ, আণ্ডার-এস্টিমেট করবেন না ওদেরকে। সতর্ক না থাকায় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন প্রায় খুন হয়ে যাচ্ছিলেন।'

'আমি সবসময় সতর্ক-ই থাকি। এনিওয়ে, কী করতে পারি তোমার জন্য?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার আমার। গোপনে। অনেক কথা আছে... সাহায্যও দরকার। ফোনে এত কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'কখন দেখা করতে চাও?'

'পারলে এখুনি। তবে কাক-পক্ষীকেও টের পেতে দেয়া যাবে না।'

'হুম!' একটু ভাবলেন লংফেলো। 'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি সাক্ষাতের। তুমি এখন কোথায়?'

'সোহো-তে। ওয়ার্ডোর আর শাফটস্‌বিউরি-র মোড়ে।'

'গুড। টটেনহ্যাম কোর্টের দিকে এগোও। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা খয়েরি রঙের মিনি-কার পৌঁছুবে ওখানে, অক্সফোর্ডের দিক থেকে আসবে। রাস্তার মোড়ে ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দেবে ওটার, থামবে কয়েক মিনিটের জন্য। নিগ্রো একজন ড্রাইভার থাকবে... ও-ই তোমার কন্ট্যাক্ট। ওর সঙ্গে উঠে যেয়ো গাড়িতে।'

'লোকটা কতখানি বিশ্বস্ত?'

'ষোলো আনা। আমার খাস লোক। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। জায়গামত নিয়ে আসবে তোমাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর।'

'ডোন্ট মেনশন। তোমার অপেক্ষায় রইলাম আমি।'

ঠিক সময়ে এসে গেল গাড়ি। চারপাশ দেখে নেবার জন্য এক মিনিট দেরি করল রানা, তারপর দরজা খুলে উঠে বসল সামনের সিটে।

'মি. রানা?' নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল নিগ্রো ড্রাইভার। কুঁৎকুতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে। একটা হাত দৃষ্টিসীমার আড়ালে, সম্ভবত পিস্তল ধরে রেখেছে।

'হ্যাঁ।' মাথার হ্যাট খুলে ফেলল রানা। চেহারা দেখতে দিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল ড্রাইভার। আড়াল থেকে স্টিয়ারিঙে উঠে এল হাত। ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি আগে বাড়াল। টটেনহ্যাম কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল মিনি। এবার নিজের পরিচয় দিল সে। 'আমার নাম আহাব।'

'আহাব?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ক্যাপ্টেন আহাবের নাম থেকে এসেছে... বাবা-মা মবিডিকের ভক্ত ছিলেন।' হাসল নিগ্রো। 'আপনি তো বিখ্যাত মাসুদ রানা! পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'নাইস টু মিট ইউ টু, আহাব।' রানাও হাসল।

সহজ হয়ে এল পরিবেশ। দক্ষিণদিকের পথ ধরে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে এল মিনি। হিথরো এয়ারপোর্টের রাস্তায় এগোল কয়েক মাইল, তারপর বাঁক নিয়ে রেডহিলের রাস্তা ধরল—পশ্চিমের কান্ট্রিসাইডের দিকে যাচ্ছে। খুব একটা কথা বলল না আহাব, বোধহয় বুঝতে পেরেছে, গল্প করার মুডে নেই রানা। নীরবতা পাওয়ায় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করতে পারল রানা। মারভিন লংফেলোর সঙ্গে কী কথা বলবে, তা সাজিয়ে নিল মনে মনে।

'আর একটু পরেই প্রথম ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব আমরা,' অনেকক্ষণ পর বলে উঠল আহাব।

'প্রথম ডেস্টিনেশন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটল রানার চোখে।

'হ্যাঁ। দু'ভাগ করা হয়েছে আমাদের ট্রিপ। সামনে গিয়ে গাড়ি বদলাব আমরা। আমাদের মত চেহারা-সুরতের দু'জনকে রাখা হয়েছে ওখানে, মিনি নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাবে ওরা। আপনি আর আমি আরেকটা গাড়ি নিয়ে এগোব। পরের জার্নিটা মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের। মি. লংফেলোর পৌঁছুতে একটু দেরি হতে পারে। চারবার গাড়ি বদলাবেন উনি।'

বোঝা গেল, রানার ওয়ার্নিংকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন বিএসএস চিফ। তাঁকে পুরো ব্যাপারটা কতখানি খুলে বলবে, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগছে রানা। না, ভদ্রলোকের সততা বা বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ নেই কোনও। কিন্তু তারপরেও ব্রিটেনের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার কর্ণধারের কাছে সে-দেশেরই পররাষ্ট্র-সচিব সম্পর্কে অভিযোগ করতে গেলে নিরেট তথ্য-প্রমাণ দরকার। অথচ পঁচাত্তর বছরের পুরনো একটা তালিকায় লেখা নাম ছাড়া নাইজেল উইটিংহ্যামের বিরুদ্ধে কিছুই নেই ওর থলেতে।

ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি কীভাবে সাহায্য করতে পারে ফেনিসকে, এ-নিয়েও ভাবছে রানা। বড় বড় কর্পোরেশনের কাভার নিয়ে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস-কে ফাইনান্স করছে সংগঠনটা, কিন্তু উইটিংহ্যামের তো সে-ধরনের কোনও ব্যবসা নেই। তবে এ-কথা ঠিক, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা চালাচালি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রানীতির বড় একটা ভূমিকা থাকে। আর আমেরিকা-ব্রিটেনের মত পরাশক্তিগুলোর বৈদেশিক নীতি যে বাকি পৃথিবীকে প্রভাবিত করে, সে তো জানা কথা। উইটিংহ্যাম কি মুদ্রা পাচারের কাজে ফেনিসকে সাহায্য

করছে কি না, সেটাই এখন দেখতে হবে।

গতি কমিয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি নামিয়ে ফেলল আহ্বাব। ইউ-টার্ন নিয়ে মুখ ঘোরাল যে-দিক থেকে এসেছে সে-দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ড পরেই রাস্তা ধরে বড় একটা বেন্টলি সেডান উদয় হলো। দরজা খুলে নেমে পড়ল আহাব, পিছু পিছু রানা। বেন্টলির ড্রাইভার আর আরোহীও নামল। হাতবদল হলো চাবি। নীরবে গাড়িও বদলাল ওরা। বেন্টলি নিয়ে আবার পশ্চিমদিকে রওনা হলো রানা আর আহাব।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?' একটু পর ইতস্তত করে বলে উঠল আহাব।

'করো।'

'ট্রেইনিং নেয়া আছে আমার... কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে খুন করিনি। ও-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে জমে যাই কি না, এই ভয়ে আছি। আচ্ছা... অভিজ্ঞতাটা কেমন?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আহাবের প্রশ্ন ওকে টানাপড়েনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যেন এমন এক জায়গায় ফিরে যেতে বলা হচ্ছে ওকে, যেখানে কষ্ট-বেদনা আর আত্মগ্লানি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। বলল, 'আসলে... বলবার মত কিছু নেই। একেবারে অনন্যোপায় না হলে কারও প্রাণ নেবে না তুমি। যখন নেবে, তখন মনে কোরো, ওই একটা প্রাণের বিনিময়ে অসংখ্য প্রাণ বাঁচাচ্ছ। এই একটা যুক্তি দেখিয়েই বুঝ দিতে হবে বিবেককে, তারপর স্মৃতিটা চাপা দিতে হবে মনের গভীরে। চেষ্টা করতে হবে ভুলে যেতে। যদি না ভোলো, বিবেকের দংশনে পাগল হয়ে যাবে তুমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল আহাব। 'এর থেকে বাঁচার কোনও উপায়

নেই, না?'

'না। এখন পর্যন্ত অমন কিছু ঘটেনি তোমার ভাগ্যে, বেঁচে গেছ। প্রার্থনা কোরো, কোনোদিন যাতে কারও প্রাণ নিতে না হয়। সে বড় ভয়ানক এক অভিজ্ঞতা।'

'আপনার নিশ্চয়ই সে-অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে?'

জবাব দিল না রানা। মন ভারী হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওর অভিজ্ঞতার ঝুলি পুরো হয়ে গেছে। মনের গভীরে এখন আর স্মৃতিগুলোকে চাপা দেবার জায়গা অবশিষ্ট নেই।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর গিল্ডফোর্ডের পিকনিক এরিয়ায় পৌঁছুল বেন্টলি, ঢুকে পড়ল পরিত্যক্ত পার্কিং লটে। চাঁদের আলোয় রেইল-ফেন্সের ওপাশে ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি দোলনা, স্লাইড আর সি-সঅ। বসন্তের বেশি দেরি নেই, তখন এ-জায়গা ভরে উঠবে শিশুদের কলকাকলি, হাসি-আনন্দ আর খেলাধুলায়। নিয়মিত চলবে বনভোজন। তবে আজ রাতে ইঞ্জিনের চাপা গর্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই এখানে।

পার্কিং লটে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়, তবে মারভিন লংফেলো নেই ওর ভিতরে। আগেভাগে দু'জন এজেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি মিটিঙের আগে লোকেশন-সুইপ করবার জন্য। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের উপর কীভাবে হামলা করা হয়েছিল, সে-খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন বিএসএস চিফ, তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে খুশি হলো রানা।

গাড়ি থেকে নামতেই বেঁটেখাটো একজন মানুষ হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। 'হ্যালো, মি. রানা!'

'হাই, কেমন আছ?' হাত মেলাল রানা। চেহারা পরিচিত, বিএসএস হেডকোয়ার্টারে একে আগে দেখেছে ও, কিন্তু নাম মনে

করতে পারল না।

'বোধহয় তিন-চার বছর পর দেখা হলো আমাদের, তাই না?' হাসল এজেন্ট। 'শেষবার আপনাকে দেখেছিলাম তাসখন্দের জয়েন্ট অপারেশনে যাবার আগে। ব্রিফিং দিয়েছিলাম আপনাকে... মনে পড়ে।'

'হ্যাঁ, অ্যাশটন,' নাম মনে পড়ে যাওয়ায় রানার মুখেও হাসি ফুটল। 'এখন কী করছ?'

'সাউদার্ন ইয়োরোপ ডেস্ক। খুবই নীরস কাজ।'

'মি. লংফেলো কোথায়?'

'এসে যাবেন শীঘ্রি। একটু অপেক্ষা করুন।'

মিনিটদশেক পরে দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল। তার কিছুক্ষণ পরে একটা লণ্ডন-ট্যাক্সি ঢুকল পার্কিং লটে। ক্যাবচালকের আসনে বসে আছেন লংফেলো স্বয়ং। আর কেউ নেই গাড়িতে। বেন্টলির পাশে এসে থামল ট্যাক্সি, দরজা খুলে নেমে এলেন বিএসএস চিফ। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে আড়ষ্টতা কাটালেন, তারপর এগিয়ে এলেন রানার দিকে।

'রানা! মাই বয়! কেমন আছ?' হাত মেলালেন তিনি।

'এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে আসায় ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতা জানাল রানা।

'ভুলে যাও। তোমার জন্য এটুকু করা তো কিছুই না। কিন্তু... লণ্ডনের এই ট্যাক্সিগুলো চালানো সহজ কাজ নয়। স্টিয়ারিং আর ট্রান্সমিশন, দুটোই যেন জ্যাম হয়ে আছে। সিটও ভীষণ শক্ত। পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।' হাসলেন লংফেলো। 'আগামীতে কখনও ট্যাক্সিতে চড়লে ড্রাইভারের বখশিশ বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেক কষ্ট করে বেচারারা।' ঘাড় ফিরিয়ে পার্কের এন্ট্রান্সের দিকে তাকালেন। 'চলো হাঁটি। ভিতরে গিয়ে শুনব তোমার কথা।'

পার্কে ঢুকে পাশাপাশি দুটো দোলনায় বসল ওরা। নিচু গলায় ফেনিস সম্পর্কে সব খুলে বলল রানা। এখন পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছে... আর আগামীতে যেসব তথ্য ভেরিফাই করে নিতে চায়। পররাষ্ট্র-সচিব নাইজেল উইটিংহ্যাম সম্পর্কে বলবার আগে একটু ইতস্তত করল, তবে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল খানিক পর।

ওর কথা শেষ হবার পর কিছুটা সময় চুপ করে রইলেন মারভিন লংফেলো। বোধহয় হজম করে নিতে চাইছেন এতসব তথ্য। একটু পর বললেন, 'ইট'স্ আনবিলিভেবল, রানা। আর কেউ বললে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু তারপরেও...'

'কোথায় খটকা লাগছে আপনার, স্যর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের ফরেন সেক্রেটারির ব্যাপারটা। নাইজেল উইটিংহ্যামকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ধোয়া তুলসীপাতা বলব না... তাই বলে ফেনিসের মত একটা সংগঠনের সদস্য বলে মনে হয় না।'

'ওটাই ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, মি. লংফেলো। এমন সব লোকের মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল করছে, যাদেরকে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ নেই।'

'হুম! তুমি যদি চাও, আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারি...'

'না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আপনার কাছ থেকে অন্যরকম সাহায্য চাই আমি। নাইজেল উইটিংহ্যামের সঙ্গে একটা আনঅফিশিয়াল মিটিঙের ব্যবস্থা করে দিন আমার।'

ভুরু কোঁচকালেন লংফেলো। 'সরাসরি কনফ্রন্টেশনে যাবে? ইটালিতে কিন্তু লাভ হয়নি। মার্সেলো বিয়াঞ্চি খুন হয়ে গেছে। ওর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারোনি তুমি।'

'এ-ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই। গোপনে খোঁজখবর নিতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় নেই আমার হাতে। আমার

আর কুয়াশার পিছনে খুনি লেলিয়ে দিয়েছে ওরা। কতক্ষণ ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে টিকে থাকতে পারব, জানি না।'

'তারপরেও তোমার এই ট্যাকটিক্স পছন্দ হচ্ছে না আমার,' অস্বস্তিভরে বললেন লংফেলো। 'কী করতে চাইছ, রাহাত তা জানে?' বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কথা জিজ্ঞেস করছেন তিনি।

'গতকাল কথা বলেছি আমি বসের সঙ্গে,' জানাল রানা।

'এ-কথা বোলো না যে, গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারির সামনে গিয়ে অভিযোগের আঙুল তোলার অনুমতি দিয়েছে তোমাকে রাহাত।'

'উনি শুধু বুঝে-শুনে এগোতে বলেছেন।'

'এ-ই বুঝি তোমার বুঝে-শুনে এগোনো? অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করব আমি... গোলমাল দেখা দিলে ফেঁসে যাব না?'

'আপনাকে বিপদে ফেলবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, স্যর,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখানে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা আমার আর ফরেন সেক্রেটারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে... ফেনিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকুক বা না-ই থাকুক। আফটার অল, বুদ্ধিমান কোনও রাজনীতিক তার পূর্বপুরুষের সঙ্গে একটা গুপ্তসংঘের কানেকশনের খবর বা গুজব... কোনোটাই প্রচার হবার ঝুঁকি নেবে না। তাতে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে ভদ্রলোকের।'

'ব্ল্যাকমেইল করবে ওঁকে?' আঁতকে উঠলেন লংফেলো। 'মাই গড!'

'আমি শুধু ফেনিসের মাথাটার খোঁজ জানতে চাইব তাঁর কাছে।'

'দিস ইজ ম্যাডনেস!' ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন

লংফেলো। 'তুমি স্রেফ পাগলামি করছ, রানা। এভাবে কিছুই জানতে পারবে না উইটিংহ্যামের কাছ থেকে।'

'দেখাই যাক,' বলল রানা। 'আপনি মিটিঙের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না বলুন। নইলে আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন বিএসএস চিফ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, করব আমি সাহায্য। তবে শুধুই তোমার অনুরোধের কারণে। আমি এখনও বলব, ভুল কৌশল বেছেছ তুমি।'

'আর কোনও বিকল্প থাকলে বলতে পারেন।'

'বলেছি তো, উইটিংহ্যামের ব্যাপারে তদন্ত করবার সুযোগ দাও আমাকে।'

'না, স্যর। আপনার নিরাপত্তার জন্যই সেটা উচিত হবে না। খোঁজখবর নেয়া শুরু করতেই মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে আপনার নামে... ঠিক অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মত। আমি সে-ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'বিএসএস চিফকে খুন করা এত সহজ নয়।'

'কথাটা প্রফেশনালদের ব্যাপারে খাটে না,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'প্লিজ, স্যর, আমাকে আমার মত কাজ করতে দিন। এমনিতেই আপনাকে সতর্ক হবার অনুরোধ করছি আমি, দয়া করে বিপদ বাড়াবেন না।'

হাল ছেড়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বললেন, 'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।'

তেরো

নাইটস্‌ব্রিজের একটা রুমিং হাউসে উঠেছে রানা, লণ্ডনের এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা গা-ঢাকা দেবার জন্য আদর্শ। সকাল সাড়ে নটায় ওখান থেকে বেরুল ও ব্রেকফাস্ট সারার জন্য। নিউজস্ট্যাণ্ডের সামনে ক্ষণিকের জন্য থামল সকালের পত্রিকা কিনতে, তারপর ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। এণ্ট্রান্সের কাছের একটা টেবিলে বসল ও, কাছেই একটা পে-ফোন ঝুলছে দেয়ালে। ঘড়িতে চোখ বোলাল, পৌনে দশটা বাজে। ঠিক সোয়া দশটায় মারভিন লংফেলোকে আবার ফোন করতে হবে—ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর নেবার জন্য।

ওয়েইট্রেস এলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা, তারপর ভাঁজ খুলে মেলে ধরল পত্রিকা। যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম পাতার এক কোণে ছোট্ট করে ছাপা হয়েছে খবরটা। নাশতা খেতে খেতে শুরু করল পড়তে।

ব্রুনা ভরগেন-এর মৃত্যু

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

এসেন, জার্মানি। ওয়ালথার ভরগেনের কন্যা, অ্যানসেল ভরগেনের নাতনি ব্রুনা ভরগেনের মৃতদেহ গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর ওয়ার্ডেনস্ট্রাসের পেন্টহাউসে আবিষ্কৃত

হয়েছে। ডাক্তারের মতে, ম্যাসিভ করোনারি স্ট্রোকে অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছেন তিনি। গত দু'দশক থেকে ফ্রাউলাইন ভরগেন তাঁর পিতার দিকনির্দেশনায় ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর পিতামাতা বর্তমানে স্ট্যাডওয়াল্ডের ব্যক্তিগত এস্টেটে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, কন্যার মৃত্যুসংবাদে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন ওয়ালথার ভরগেন; পারিবারিক ডাক্তার তাঁর জীবনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন...

তিক্ত একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। দু'দুটো মৃত্যুর ঘটনাকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্য ভাল কৌশলই বের করেছে ফেনিস। সন্দেহ নেই, ঘুষ পেয়ে জার্মানির বেশ কিছু লোকের পকেট ভারী হবে এই উসিলায়। খবরের বাকি অংশ পড়ার আর আগ্রহ পেল না। কলামের নীচদিকে চলে গেল চোখ, ওখানে এ-সংক্রান্ত আরেকটা সংবাদ ছাপা হয়েছে।

ভরগেন-এর মৃত্যুতে ট্রান্সকমের উদ্বেগ

(নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি)

পুরো ওয়াল স্ট্রিটকে বিস্মিত করে দিয়ে আজ সকালে ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের একদল প্রতিনিধি এসেনের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। ফ্রাউলাইন ক্রুনা ভরগেনের অকালমৃত্যু এবং তাঁর পিতা ওয়ালথার ভরগেনের অসুস্থতার ফলে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ এখন নেতৃত্বশূন্য; এই অচলাবস্থা নিরসন-ই তাঁদের পরিদর্শনের

মূল উদ্দেশ্য বলে জানা গেছে। এ-সংবাদ বিস্ময়জনক এ-কারণে যে, অতীতে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে আমেরিকান পুঁজি বিশ শতাংশের বেশি নয় বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কানাঘুষোয় বলা হচ্ছে, আসলে অস্ত্র-নির্মাতা ওই প্রতিষ্ঠানে আমেরিকান শেয়ার পঞ্চাশ শতাংশের উর্ধ্বে। যদিও ট্রান্সকমের বস্টন হেডকোয়ার্টার থেকে উক্ত গুজবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে...

বস্টন! ম্যাসাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের রাজধানী! ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ডেভিড ম্যাহোনি ওখানকার-ই সিনেটর—ফেনিসের তালিকার চতুর্থ মানুষটার উত্তরসূরি। রাজনৈতিক ঐতিহ্যধারী অত্যন্ত প্রভাবশালী এই পরিবার... কেউ কেউ কেনেডি পরিবারের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। ট্রান্সকমের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে এই পরিবারের? খোঁজ নিতে হবে, ভাবল ও।

টেলিফোনের কর্কশ রিং শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো রানার। দেয়ালে ঝোলানো পে-ফোন বাজছে। ঘড়ি দেখল, দশটা আট। ওয়েইট্রেসকে দেখল রিসিভার তুলতে। ভুরু কুঁচকে অপরপক্ষের সঙ্গে কথা বলল সে, তারপর রিসিভারটা হাতে ধরে কাস্টোমারদের দিকে ফিরল।

'এখানে মি. কায়সার বলে কেউ আছেন? মাসুদ কায়সার?'

চমকে উঠল রানা। মাসুদ কায়সার ছদ্মনামে মাঝে মাঝে কাজ করে ও। সেটা তো কারও জানার কথা নয়। নাকি ব্যাপারটা কাকতালীয়?

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ও। শেষে পরাস্ত হলো কৌতূহলের কাছে। টেবিল থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ওয়েইট্রেসের সামনে। 'আমিই মাসুদ কায়সার।'

ওর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। লম্বা করে শ্বাস নিল রানা। তারপর কথা বলল মাউথপিসে। 'হ্যালো?'

'সুপ্রভাত, মি. মাসুদ রানা!' ভেসে এল পরিশীলিত একটা কণ্ঠস্বর—পুরুষ। 'আশা করি রোম থেকে আসবার পর যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছেন আপনি?'

'কে তুমি?'

'আমার নাম গুরুত্বহীন। আমাকে আপনি চেনেন না। শুধু এটুকু বুঝুন, আপনাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা... চাইলে যে-কোনও মুহূর্তে হাতের মুঠোয় নিতে পারি। কিন্তু অযথা রক্তপাতে কারও উপকার হবে না। তারচেয়ে একসঙ্গে বসে নিজেদের বিভেদ মিটিয়ে নেয়া ভাল না? কথা বললে বুঝতে পারবেন, আমাদের বিভেদ যতটা বড় ভাবছেন, আসলে ততটা নয়।'

'আমাকে যারা খুন করবার চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি আছে আমার।'

'একটু ভুল হচ্ছে আপনার। কেউ কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে বটে, কিন্তু কেউ কেউ আবার বাঁচাতেও চাইছে।'

'কীসের জন্য? কেমিক্যাল থেরাপি দেবার জন্য? যাতে আমি কী আবিষ্কার করেছি, তা জেনে নেয়া যায়?'

'যা জেনেছেন, তা অর্থহীন। ওসব জেনে কিছুই করতে পারবেন না আমাদের বিরুদ্ধে। মাঝখান থেকে প্রাণটা হারাবেন। এমনিতেই শত্রুর অভাব নেই আপনার। আমেরিকান-রা আপনাকে জেনারেল ওয়ার্নারের হত্যার অভিযোগে খুঁজছে। ড. ইভানোভিচের খুনি কুয়াশা-র সঙ্গে হাত মেলানোয় রাশান-রাও নাখোশ আপনার উপর। দেখামাত্র আপনাকে খুন করবে ওরা। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে, মি. রানা। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়ামাত্র আপনাকে খতম করে দিতে পারি আমরা... এমনকী ভিতরেও!'

দ্রুত রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে নজর বোলাল রানা, সন্দেহজনক চরিত্র খুঁজছে। বেশ ক'জনকেই তার সন্দেহজনক মনে হলো, কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় নেই। বাইরের ভিড়ে ক'জন ওঁৎ পেতে আছে, কে জানে। সন্দেহ নেই, ফাঁদে পড়ে গেছে ও। লড়াই করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু তাতে রেস্টুরেন্টে উপস্থিত নিরীহ মানুষ আহত-নিহত হবে। কী করা যায়? বিএসএস চিফের কাছে সাহায্য চাইতে পারে, তবে নির্ধারিত সময়ের আগে ফোন করা যাবে না তাঁকে। ঘড়ি দেখে নিল, এখনও চার মিনিট বাকি। সময়টুকু নষ্ট করতে হবে এখানে।

'দেখা করতে চাও আমার সঙ্গে?' টেলিফোনের লোকটাকে বলল রানা। 'তা হলে গ্যারান্টি দাও, আমাকে এখান থেকে নিরাপদে বেরুতে দেবে।'

'দিচ্ছি গ্যারান্টি।'

'মুখের কথায় বিশ্বাস করি না। তোমার অন্তত একজন লোককে আইডেন্টিফাই করো রেস্টুরেন্টের ভিতর।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, মি. রানা,' কাটা কাটা স্বরে বলল লোকটা। 'তোমাকে এখানে আটকে রাখতে পারি আমরা, তারপর খবর দিতে পারি অ্যামেরিকান এম্বাসিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোণঠাসা হয়ে পড়বে তুমি। যদি কোনোভাবে আমেরিকানদের ফাঁকি-ও দাও, বাইরে আমরা অপেক্ষায় থাকব তোমার... আউটার সার্কেলে। কোনও চান্স নেই তোমার।'

ব্যস্ত চোখে ঘড়ি দেখল রানা—দশটা বারো। আরও তিন মিনিট।

'তা হলে তো বলব, আমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যাপারে তেমন কোনও ইচ্ছেই নেই তোমাদের,' বাঁকা সুরে বলল ও। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে, ফোনের লোকটা স্রেফ একজন বার্তাবাহক;

ওকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার নির্দেশটা অন্য কেউ দিয়েছে।

'আমি এখনও বলব...'

'একজনকে চিনতে চাই আমি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'নইলে কোথাও যাচ্ছি না!' দৃঢ়তা ফোটাল কণ্ঠে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল অপরপক্ষ। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'বেশ, আশপাশে তাকান। চোয়ালভাঙা একজনকে দেখবেন, গায়ে খয়েরি কোট...'

'দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা। পাঁচ টেবিল দূরে বসে আছে লোকটা।

'গুড। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোন। ও আপনার পিছনে থাকবে। ও-ই আপনার গ্যারান্টি।'

দশটা তেরো বাজে। আর দু'মিনিট।

'ওর নিজের কোনও গ্যারান্টি আছে? আমার সঙ্গে ওকেও যে খুন করে ফেলবে না তোমরা, সেটা জানছি কীভাবে?'

'ওহ্, কাম অন, মি. রানা!'

'হেসো না। তোমার নাম কিন্তু এখনও জানা হলো না।'

'বলেছি তো, ওটা গুরুত্বহীন।'

'কিছুই গুরুত্বহীন নয়। নামটা জানতে চাই আমি।'

'স্মিথ। মেনে নাও।'

দশটা চোদ্দ। এক মিনিট। সময় হয়েছে।

'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে দাও আমাকে। নাশতাও শেষ করতে চাই।'

লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও। নামিয়ে রাখল রিসিভার। উল্টো ঘুরে এগিয়ে গেল চোয়ালভাঙার কাছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল লোকটা, এক হাত চলে গেল ওভারকোটের তলায়।

'রিল্যাক্স!' কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আমাকে

বলা হয়েছে, তুমি নাকি বাইরে নিয়ে যাবে আমাকে। আর হ্যাঁ... যাবার আগে একটা ফোনও করতে হবে। আমাকে নাম্বার দেয়া হয়েছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারছে না চোয়ালভাঙা। তাকে ওই অবস্থায় রেখে উল্টো ঘুরল রানা, ফিরে এল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করল। কয়েকবার রিং হলো, তারপর কল রিসিভ করলেন লংফেলো... সম্ভবত স্ক্র্যাম্বলার চালু করবার জন্য সময় নিয়েছেন।

'তাড়াতাড়ি কথা সারতে হবে আমাদেরকে,' বিএসএস চিফ মুখ খোলার আগেই বলে উঠল রানা। 'আমার খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা বিপদে পড়ে গেছি।'

'কোথায় তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন লংফেলো। 'আমি সাহায্য পাঠাচ্ছি।'

ঠিকানা বলল রানা। 'দুটো সাইরেন দরকার আমার... রেগুলার পুলিশ কার হলেই চলবে। রেস্টুরেন্টে পলাতক আইরিশ বিপ্লবী আছে বলে জানাবেন ওদেরকে।'

'ধরে নাও রওনা হয়ে গেছে।' আরেকটা ফোন তুলে হড়বড় করে নির্দেশ দিলেন লংফেলো।

'উইটিংহ্যামের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যায়... বেলগ্রাভিয়ায় ওঁর বাড়িতে যেতে হবে। আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

'শিডিউলটা একটু এগিয়ে আনা যায় না?'

'মাথা খারাপ? কাল যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি, সেটাও সাত জনমের ভাগ্য। অ্যাডমিরাল্টি থেকে একটা ভুয়া রেকমেণ্ডেশন দিতে হয়েছে ওটার জন্য।' দম নেবার জন্য থামলেন লংফেলো। 'বাই দ্য ওয়ে, তোমার সন্দেহ ঠিক—কাল রাতে আমি কোথায়

ছিলাম, সেটা জানার চেষ্টা করেছে কারা যেন। হোম অফিসের নাম করে ফোন করেছিল আমার সেক্রেটারির কাছে। কী নাকি জরুরি খবর দিতে চেয়েছিল।'

'তারপর?'

'অ্যাডমিরাল্টি অফিসে একটা মিটিঙের কথা বলে বেরিয়েছিলাম... ওটাই জানিয়েছে আমার সেক্রেটারি।'

'ওরা যদি ভেরিফাই করার চেষ্টা করে?'

'ভয়ের কিছু নেই। তোমার সঙ্গে দেখা করে সোজা চলে গিয়েছিলাম অ্যাডমিরাল্টি অফিসে। রাত এগারোটার সময় সবাইকে দেখিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছেন, স্যর। ইয়ে... উইটিংহ্যামকে আমার নাম বলেননি তো?'

'উঁহুঁ। ভুয়া নাম দিয়েছি। তোমার মিটিং যদি ফলপ্রসূ না হয়, যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে আমাকে।'

ঝামেলা এমনিতেও কম হবে না, ভাবল রানা। ফেনিস যদি সত্যিই ওর প্রতিটা পদক্ষেপের উপর নজর রাখে, তা হলে ইতিমধ্যেই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে ফরেন সেক্রেটারি আর বিএসএস চিফের উপরে।

ও জানতে চাইল, 'আগামীকাল কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে?'

'রাত আটটায়। তবে যাবার আগে ফোন করে যেতে বলেছে। তোমাকে সাতটার দিকে তুলে নেব আমি। কোথায় থাকবে?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আজ বিকেলে ফোন করে জানাব আপনাকে... এই ধরুন, সাড়ে চারটার দিকে। অসুবিধে নেই তো?'

'উঁহুঁ। বাই চান্স যদি না পাও আমাকে, আসল জায়গার দু'ব্লক দূরের অ্যাড্রেস দিয়ে রেখো আমার সেক্রেটারিকে। আমি খুঁজে নেব

তোমাকে।'

'গতকাল আপনার ডিকয়-দেরকে যারা অনুসরণ করছিল, তাদের ছবি জোগাড় করতে পেরেছেন?'

'দুপুরের মধ্যে আমার ডেস্কে পৌছুনোর কথা।'

'আচ্ছা। এক কাজ করুন... ভেবেচিন্তে অফিশিয়াল একটা অজুহাত দাঁড় করান—কেন আমাকে নিয়ে ফরেন সেক্রেটারির বাড়িতে যেতে পারবেন না আপনি। তার বদলে প্রস্তাব দেবেন ওঁকেই বিএসএস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসবার... আপনি নিজেই নিয়ে আসবেন বলে কথা দেবেন।'

'হোয়াট!' চমকে উঠলেন লংফেলো।

রানার কথা শেষ হয়নি। না শোনার ভান করে ও বলে চলল, '...কিন্তু হেডকোয়ার্টারে না, ওকে আপনি নিয়ে আসবেন *কনৌট* হোটেলে। রুম নাম্বার এখুনি বলতে পারছি না, ওটা বিকেলে ফোন করে জানাব। আপনি যদি না থাকেন, তা হলে সেক্রেটারিকে অন্য একটা নাম্বার দেব। সেটা থেকে বাইশ বিয়োগ করে নেবেন।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, রানা?' হতভম্ব গলায় বললেন লংফেলো। 'সোজা কথায় ফরেন সেক্রেটারিকে কিডন্যাপ করাতে চাইছ আমাকে দিয়ে! কেন?'

'দুঃখিত, স্যর,' বিব্রত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু অনুরোধটা করছি আপনাদের দু'জনের নিরাপত্তার জন্যেই। প্লিজ... অমত করবেন না। আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরুবেন না উইটিংহ্যাম।'

'তুমি দেখছি আমাকে জেলের ভাত না খাইয়ে ছাড়বে না!' গম্ভীর গলায় বললেন লংফেলো। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি। কিন্তু এখুনি কোনও কথা দিচ্ছি না।'

পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। রানা

বলল, 'আপনার পাঠানো সাহায্য চলে এসেছে। রাখি, পরে কথা হবে। ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে ফেনিসের খুনির কাছে ফিরে এল ও।

'কার সঙ্গে কথা বললে?' সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল চোয়ালভাঙা। আমেরিকান উচ্চারণ।

'নাম বলেনি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কিন্তু ইন্সট্রাকশন পেয়েছি। আমাদেরকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

'কেন?'

'ঝামেলা দেখা দিয়েছে। তোমাদের একটা গাড়িতে রাইফেল পেয়েছে পুলিশ, ওটা আটক করা হয়েছে। এই এলাকা আইআরএ টেরোরিস্টদের আখড়া, জানো না বুঝি? চলো পালাই।'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চোয়ালভাঙা। ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। সঙ্গে সঙ্গে আরেক টেবিল থেকে উঠে পড়ল এক মাঝবয়েসী মহিলা, তার কাঁধে একটা বড়-সড় পার্স।

'হাঁটো!' বলল চোয়ালভাঙা। 'আমরা তোমার পিছনে থাকব।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল রানা। 'আমাকে বিল মেটাতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। আড়চোখে রেস্টুরেন্টের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছে। পুলিশের দুটো কার উদয় হয়েছে রাস্তার মোড়ে, এগিয়ে আসছে এদিকে। ইচ্ছে করে একটু সময় নিল ও বিল মেটাতে। বড় নোট দিল, যাতে ওটা ভাঙাতে সময় নেয় ক্যাশিয়ার। একটু পর খুচরো টাকা নিয়ে ও যখন উল্টো ঘুরল, তখন পুলিশের গাড়িদুটো রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইউনিফর্মধারী চারজন অফিসার বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। হাঁটতে শুরু করল ও। একটু দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করল চোয়ালভাঙা আর মাঝবয়েসী মহিলা। হিসেবি কদম ফেলে দরজার কাছে পৌঁছুল ও, ঠিক যখন পুলিশ অফিসার-রাও পৌঁছেছে ওপাশে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল রানা, মুখোমুখি হলো তাদের, পরমুহূর্তে ঝট্ করে উল্টো ঘুরল। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে... ওরা! ওদের কাছে অস্ত্র আছে!'

থমকে দাঁড়াল দুই দুর্বৃত্ত। হতবাক হয়ে গেছে। সংবিৎ ফেরার আগেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ অফিসাররা। ব্যাটনের আঘাত করে শুইয়ে ফেলল মেঝেতে, পরাতে শুরু করল হাতকড়া।

রানা ওসব দেখছে না। চিৎকার দিয়েই ছুটতে শুরু করেছে ও। চোখের পলকে পেরিয়ে এল দুই ব্লক। একটা গলিতে পৌঁছে থামল দম নেবার জন্য। পিছনটা দেখে নিল একই সঙ্গে। না, কেউ পিছু নেয়নি। রাস্তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। এক ছুটে ওটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল ও। ট্রায়াল রুম বেছে নিল একটা। ওটায় ঢুকে দরজা আটকাল, তারপর সেলফোন বের করে রিং করল প্যারিসে। কুয়াশাকে সতর্ক করে দিতে হবে। লণ্ডনে পৌঁছুবার পর নাইটস্‌ব্রিজের রুমিং হাউসে আসবার কথা তার... রানার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কিন্তু ও-জায়গার খোঁজ জেনে গেছে ফেনিস। কুয়াশা এলেই আটকা পড়বে তাদের হাতে।

দু'বার রিং হলো, তারপর তোলা হলো ফোন। ওপাশ থেকে ভেসে এল কুয়াশার গলা। 'ইয়েস?'

'আমি...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'কপাল ভাল আমাকে পেয়েছ।' একটু অস্বাভাবিক মনে হলো কুয়াশার কণ্ঠ। যেন কথা বলতে দ্বিধা করছে। 'একটু পরেই বেরিয়ে যাবার কথা আমার।'

'কপাল সত্যিই ভাল,' রানা বলল। 'কিন্তু... কী হয়েছে আপনার?'

'কই... কিছু না তো। কেন?'

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে আপনার গলা। সোনিয়া কোথায়? ও ফোন ধরল না কেন?'

'বাজার করতে গেছে। এসে যাবে শিগগির। গলা যদি অদ্ভুত শোনায়, তার কারণ—ফোন ধরতে পছন্দ করি না আমি।' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কুয়াশার। যুক্তিসঙ্গত কথা বলছে। 'তোমার কী হয়েছে, সেটাই বলো। অসময়ে ফোন করলে কেন?'

'এখানে পৌঁছুনোর পর জানবেন। তবে আপাতত নাইটস্‌ব্রিজের কথা ভুলে যান।'

'তা হলে তোমাকে পাব কোথায়?'

সাঙ্কেতিক ভাষায় আরেকটা জায়গার নাম বলল রানা।

'ঠিক আছে, ওখানেই দেখা হবে.' আলাপ শেষ করার সুরে বলল কুয়াশা।

'দাঁড়ান... সোনিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলব আমি। ওকে বলবেন আধঘণ্টা পর ফোনের কাছে থাকতে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল কুয়াশা। তারপর বলল, 'আসলে... বাজারশেষে ওর বেড়াতে যাবার কথা। লুভার মিউজিয়াম নাকি দেখেনি কোনোদিন। তাই ওকে ঘুরে আসতে বলেছি আমি। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে, বলা মুশকিল। চিন্তা কোরো না, কিচ্ছু হয়নি ওর। রাখি।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল কুয়াশা।

থম্ মেরে গেল রানা। ও-কথা বলল কেন কুয়াশা? কিচ্ছু হয়নি সোনিয়ার... তারমানে কি আসলে কিছু হয়েছে? ও লুভার

মিউজিয়ামে যাবে কেন? রু দ্য বাখ্‌-এর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরুবারই তো কথা নয় ওর। যত ভাবল, ততই বদ্ধমূল হলো ধারণাটা—প্যারিসেও বিপদ দেখা দিয়েছে। যে-ভাবে ওকে লণ্ডনে খুঁজে বের করেছে ফেনিস, একই ভাবে ওখানেও হয়তো খুঁজে বের করেছে ওরা কুয়াশাকে। কী ঘটেছে ওখানে? কোনও ধরনের হামলা? আহত হয়েছে সোনিয়া?

জানার উপায় নেই। নিষ্ফল হতাশায় ছটফট করতে লাগল রানা।

চোদ্দ

শুধুমাত্র চমৎকার একটা কিচেনের জন্য নয়, লণ্ডনের বিখ্যাত *কনৌট* হোটেল আত্মগোপনের জায়গা হিসেবেও একেবারে আদর্শ। শুধু লবি থেকে দূরে থাকতে হবে, এবং খাওয়াদাওয়া সারতে হবে রুম সার্ভিসের মাধ্যমে। সম্ভবত এই বিশেষ দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণেই ওখানে কামরা পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তত দু'তিন সপ্তাহ আগে থেকে বুকিং দিয়ে না রাখলে সেটা একেবারেই অসম্ভব। কার্লোস প্লেসের এই অভিজাত হোটেল রাজকীয় শাসনামলের শেষ চিহ্ন। উঁচুতলার লোকজনের শেষ আশ্রয়স্থল, যেখানে তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে গা-ঢাকা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, এখানে কেউ কাউকে বিরক্ত করে না।

বহুদিন থেকে এ-কারণে *কনৌট* হোটেলকে নিজের কাজে

ব্যবহার করছে রানা। স্বল্প সময়ের নোটিশে স্বাভাবিক নিয়মে কামরা পাওয়া অসম্ভব, তাই বিকল্প পন্থা অবলম্বন করেছে ও—ম্যানেজিং বোর্ডের একজন ডিরেক্টরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদে সাহায্য করে কৃতজ্ঞ বানিয়ে রেখেছে। প্রতিটা থিয়েটারে *হাউস-সিট* থাকে, বড় বড় রেস্তোরাঁতেও থাকে রিজার্ভড্ টেবিল... তাদের নামিদামি পৃষ্ঠপোষকদের জন্য একই নিয়মে *কনৌট* হোটেলও রাখছে কিছু খালি কামরা। ডিরেক্টরের কল্যাণে সেগুলোর যে-কোনোটা যখন-তখন পেতে পারে রানা। আজও তার ব্যত্যয় হয়নি।

'ছয়শ' ছাব্বিশ নম্বর স্যুইট,' রানার ফোন পেয়েই জানিয়েছেন ভদ্রলোক। 'লবিতে দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। লিফট ধরে সোজা চলে যাবেন ওখানে। ম্যানেজারকে ফোন করলে আপনার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পাঠিয়ে দেবে কামরায়।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে চলে এসেছে রানা। তার আগে সেরে নিয়েছে জরুরি আরেকটা কাজ রুমিং হাউসে ফেরা সম্ভব নয়, কিন্তু জামাকাপড় সব রয়ে গেছে ওখানে। কপাল ভাল, পাসপোর্ট আর টাকাপয়সা নিয়ে বেরিয়েছিল, তবে গায়ের কাপড় ছাড়া আর কোনও পরিধেয় ছিল না ওর কাছে। পোশাক-আশাকের গুরুত্ব কম নয়। ওর পেশায় ওগুলো স্রেফ লজ্জা-নিবারণ বা ফ্যাশনের বস্তু নয়, কাজ করবার হাতিয়ারও বটে। পোশাকের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যায় নিত্যনতুন পরিচয় বা স্ট্যাটাস। তাই বেশকিছু নতুন কাপড় কিনে নিতে হয়েছে।

মাঝরাতের সামান্য পরে কনৌট হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাঢ় একটা রেইনকোট পরেছে, মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট। সার্ভিস এলিভেটর ধরে বেজমেন্টে নামল, ওখান থেকে এমপ্লয়িদের এন্ট্রান্স ধরে পিছনের ব্যস্ত রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো

ওয়াটারলু ব্রিজের উদ্দেশে। বিকেলে পরিকল্পনামাফিক ফোন করেছিল মারভিন লংফেলোর কাছে। অফিসে ছিলেন না বিএসএস চিফ, তাঁর সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিয়েছে কনৌট হোটেলের রুম নম্বর—৬৪৮। ওটা থেকে বাইশ বিয়োগ করলে আসল নম্বরটা পেয়ে যাবেন তিনি।

একে একে ট্রাফালগার স্কয়্যার, স্ট্র্যাণ্ড আর স্যাভয় কোর্ট পেরিয়ে এল ট্যাক্সি; এগোল ওয়াটারলু ব্রিজের এণ্ট্রান্সের দিকে। আর সামনে যাবার মানে হয় না, টেমস্ আর ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টের সাইড স্ট্রিট ধরে হেঁটে চলে যাওয়া যাবে বাকি পথ। তাই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাঁধ স্পর্শ করে ও বলল, 'ব্যস, এখানেই নামব আমি।' ভাড়া আর বখশিশ বাবদ চকচকে দুটো নোট গুঁজে দিল লোকটার হাতে

স্যাভয় হোটেলের পাশের ঢালু লেইন ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা, নেমে এল পাহাড়ের নীচে। কৃত্রিম আলোয় আলোকিত, চওড়া বুলেভার্ডের ওপাশে দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের ওয়াকওয়ে আর ইঁটের উঁচু দেয়াল—টেমস্ নদীর সীমানা ঘিরে রেখেছে। নদীতীরের কাছে স্থায়ীভাবে মুরিং করে রাখা হয়েছে *ক্যালেডোনিয়া* নামে এক বিশাল বার্জ—ওটাকে পরিণত করা হয়েছে মদ্যশালায়। এখন অবশ্য বন্ধ। রাত এগারোটার পরে আর খোলা থাকে না ওটা। জানালার কাঁচের ওপাশে ম্লান আলো দেখে বোঝা গেল, ভিতরের কর্মচারীরা দিনশেষের সাফ-সুতরোয় ব্যস্ত।

গাছের সারিতে ঢাকা এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে সিকি মাইল দক্ষিণে গেলে দেখা পাওয়া যাবে ছোটখাট এক ফ্লিটের—বড়সড়, চওড়া, আরামদায়ক অনেকগুলো রিভারবোটের সমষ্টি, দিনভর পর্যটক আনানেয়া করে টাওয়ার অভ লণ্ডন, ল্যামবেথ ব্রিজ আর ক্লিওপেট্রা'স্ নিডলে। বহু বছর আগে এই বোটগুলো *টাওয়ার*

সেন্ট্রাল বলে পরিচিত ছিল... আর এখানেই কুয়াশাকে আসতে বলেছে রানা।

স্যাভয় হোটেলের পিছনের বাগানের ভিতর দিয়ে এগোল ও, উপর থেকে ভেসে আসছে বলরুমের সঙ্গীতের আবছা আওয়াজ। গার্ডেন পার্টির জন্য তৈরি করা একটা অ্যাম্ফিথিয়েটারে পৌঁছুল, বেঞ্চের সারির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে কয়েক জোড়া কপোত-কপোতী। নিঃসঙ্গ কেউ আছে কি না, দেখার জন্য চোখ বোলাল রানা, কিন্তু পেল না কাউকে। অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল তাই, পেভমেন্ট ধরে হাঁটতে শুরু করল বুলেভার্ডের পাশ ধরে।

কোথায় কুয়াশা? এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা। গাড়ি নিয়ে এসেছে? রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়ির খোঁজে নজর বোলাল রানা, কিন্তু এবারও হতাশ হতে হলো। গভীর রাতে খাঁ খাঁ করছে রাস্তা... একটা যানবাহনও নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে নদীতীরের দেয়াল ঘেঁষে, ওদের মাঝেও নেই লোকটা।

হঠাৎ একটা লাইটার জ্বলে উঠল। রাস্তার ওপারে, রিভারবোটে উঠবার পিয়ারের প্রবেশপথে। একবার নিভল, আবার জ্বলল। ওদিকে চোখ ফেরাতেই সাদাচুলো একজন পুরুষকে দেখতে পেল রানা, কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে স্বর্ণকেশী এক মেয়েকে। দাঁড়িয়ে গেল ও, চোখ পিট পিট করে বোঝার চেষ্টা করল, ওটা সঙ্কেত কি না।

তৃতীয়বারের মত জ্বলল লাইটার, এবার একটু বেশি সময়ের জন্য। কাঁপা কাঁপা আলোয় কুয়াশার রুক্ষ চেহারা চিনতে পারল রানা... কিন্তু সঙ্গের মেয়েটি কে? ডিকয়? লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি? গোপন সাক্ষাতের জায়গায় অপরিচিত একজনকে নিয়ে এসেছে কেন? এত বড় ভুল তো করার কথা নয় ওর। নাকি...

চমকে উঠল রানা। বুকের ভিতর বেজে উঠল অমঙ্গলের ডঙ্কা। রাস্তা পেরুতে শুরু করল ঘোরগ্রস্তের মত। হঠাৎ একটা গাড়ির হর্নে সংবিৎ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল দু'পা। পরমুহূর্তে সগর্জনে একটা ভ্যান পেরিয়ে গেল ওর সামনে দিয়ে। আরেকটু হলে চাপা পড়ত ওটার তলায়। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিসম্পাত দিল ও। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে পেরুল রাস্তা। কাছাকাছি হতেই বুঝতে পারল, জড়িয়ে ধরা মেয়েটি ডিকয় নয়। তাকে আদর করার ভঙ্গিতে ধরেনি কুয়াশা, বরং ধরে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়।

ফিসফিস করে মেয়েটির কানে কী যেন বলল কুয়াশা, তা শুনে মুখ ফেরাতে শুরু করল সে। বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার, সোনালি পরচুলার নীচে ওটা সেলিনার মুখ! মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে আছে... জীবনের কোনও চিহ্ন যেন নেই ওতে।

দ্রুত পা চালিয়ে ওদের পাশে পৌঁছুল রানা। মুখ খোলার আগেই কুয়াশা বলল, 'ওকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে।'

'হায় খোদা!' ফিসফিসাল রানা। 'আপনি ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? ফ্রান্সে হাজারটা জায়গা আছে, যেখানে লুকিয়ে রাখতে পারতেন... চিকিৎসাও দেয়া যেত ওকে!'

'যদি নিশ্চিত হতে পারতাম, তা হলে তা-ই করতাম,' কুয়াশার কণ্ঠ আশ্চর্য রকমের শান্ত। 'প্লিজ, খোঁচাখুঁচি কোরো না। সমস্ত বিকল্প খতিয়ে দেখেছি আমি।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল রানা। নীরব দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। প্যারিস থেকে সরিয়ে না আনলে হয়তো মারা পড়ত মেয়েটা। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'হুঁ। তবে না দেখালেও চলত।'

'কী ধরনের কেমিক্যাল দেয়া হয়েছে ওকে?'

'স্কোপোলামিন।'

'গতকাল সকালে। আঠারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।'

'আঠারো!' চমকে উঠল রানা। তবে এ-মুহূর্তে বিস্তারিত জানবার সময় নেই। 'গাড়ি আছে আপনার সঙ্গে?'

'না। চার্টার প্লেনের পাইলট একটা গাড়িতে করে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে এখানে। ওকে বিদায় করে দিয়েছি।'

'গিয়ে কাউকে বলে দেবে না তো? কতখানি বিশ্বাস করা যায় ওকে?'

'এক ফোঁটাও না। তাই কৌশল খাটিয়েছি। পথে একটা গ্যাস স্টেশনে থেমেছিল ও বাথরুম সারার জন্য। তখন ফুয়েল লাইন ফুটো করে দিয়েছি। ফিরতি পথে ফুরিয়ে যাবে তেল... নির্জন এলাকায়। সেলফোন নেই ওর সঙ্গে। সাহায্য চাইতে পারবে না, খবরও দিতে পারবে না কাউকে। কেটে পড়ার জন্য সময় পাব আমরা।'

'ভাল করেছেন,' বলে উল্টো ঘুরল রানা। 'একটু দাঁড়ান, আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।'

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, রানা।'

'পরে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

প্রায়-অচেতন অবস্থা সোনিয়ার, হোটেলে ফিরে বিছানায় শোয়ানোর পরেও চোখ খুলল না। তবে শ্বাস নিচ্ছে স্বাভাবিক লয়ে, সেটা স্বস্তির বিষয়। জ্ঞান ফেরার পর বমি বমি ভাব অনুভব করবে, তবে সেটা কেটে যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। তুলনামূলকভাবে অনেক কম ক্ষতিকর ড্রাগ এই স্কোপোলামিন। মেয়েটার শরীর চাদর দিয়ে ঢেকে দিল রানা, কপালে আলতো চুমো খেলো, তারপর বেরিয়ে এল কামরা থেকে। দরজা পুরোপুরি বন্ধ করল না, ঘুমের মধ্যে

অস্থির হয়ে উঠতে পারে সোনিয়া—ড্রাগের একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ওটা।

হোটেল স্যুইটের সিটিং রুমে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে কুয়াশা একটা সোফার উপরে। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেচারা। তার হাতে এক কাপ গরম কফি তুলে দিল রানা, নিজেও নিল, তারপর একটা চেয়ার টেনে বসল মুখোমুখি।

'কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল ও।

জবাব দিল না কুয়াশা। কফিতে চুমুক দিল। তারপর ছুঁড়ল পাল্টা প্রশ্ন। 'তুমি মারা গেছ বলে গুজব রটেছে... জানো সেটা?'

'হুঁ। কিন্তু তার সঙ্গে সোনিয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

'ওর সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওকে উদ্ধারের সম্পর্ক আছে।' কফির কাপের উপর দিয়ে রানার দিকে চাইল কুয়াশা। 'ওই গুজবটার জন্যই উদ্ধার করতে পেরেছি ওকে। কপাল ভাল, তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি।'

'মানে?'

'মাসুদ রানা সেজেছিলাম... পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেসিক কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। তারপর ওর মুক্তির বিনিময়ে নিজে ধরা দেবার প্রস্তাব দিলাম। ওরা রাজি হলো।'

'খোলাসা করুন ব্যাপারটা।'

'পারলে তো করতাম-ই,' সোজা হয়ে বসল কুয়াশা। বড় বড় কয়েক চুমুকে শেষ করল কফি, খালি কাপ নামিয়ে রাখল সাইডটেবিলের উপর। 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ফেনিসের ভিতরের কেউ তোমাকে জ্যান্ত রাখতে চাইছে। সে-কারণেই বাকিদের কাছে প্রচার করা হয়েছে তোমার মৃত্যু-সংবাদ। ফিল্ডের লোকজন শুধু আমাকে খুঁজছে... তোমাকে নয়।'

'কিন্তু সোনিয়া...'

'ওকে কীভাবে খুঁজে পেল, তা জানি না। হেলসিঙ্কি বা রোম... যে-কোনও জায়গা থেকে সূত্র পেতে পারে। সে যা-ই হোক, গতকাল সকালে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল ও... বেশি দূরে না, রাস্তার শেষ মাথায় একটা বেকারি আছে, ওখান থেকে রুটি আনতে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা পরও ফিরে এল না। ঝামেলার গন্ধ পেলাম। দুটো পথ ছিল আমার সামনে—ওর খোঁজে বেরুতে পারি, অথবা অপেক্ষা করতে পারি অ্যাপার্টমেন্টেই। খোঁজাখুঁজিতে যেতে ইচ্ছে হলো না। কোথায় খুঁজব তার কিছুই জানি না। তাই বসে রইলাম অ্যাপার্টমেন্টে... আগে হোক বা পরে, যারা-ই ওকে আটক করে থাকুক, ওখানে আসতেই হবে তাদেরকে। বেশ ক'বার ফোন বাজল, কিন্তু একবারও ধরলাম না। জানতাম, ফোনের জবাব না পেলে সশরীরে হাজির হবে ওরা...'

বাধা দিল রানা। 'আপনি তো আমার ফোন ধরেছিলেন!'

'ওটা অনেক পরে। ততক্ষণে ব্যাটাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে।'

'হুম। তারপর?'

'শেষ পর্যন্ত দু'জন লোক হাজির হলো দোরগোড়ায়। ওদেরকে বন্দি করলাম আমি। শার্ট খুলে একজনের বুকে গোল উল্কি দেখলাম। কী আর বলব, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি বহু কষ্টে... ইচ্ছে করছিল তখুনি ব্যাটাকে খুন করে ফেলি। পাগল-পাগল লাগছিল নিজেকে।'

'কেন?'

'লেনিনগ্রাদ আর এসেনে আমার তিনজন বন্ধুকে খুন করেছে এই উল্কিঅলারা... খুবই কাছের বন্ধু। ওসব পরে বলছি। আগে গতকালের ঘটনা শোনাই।'

'বলে যান।'

'সংক্ষেপে বলছি পরের অংশ...' শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নিয়ো তুমি। ফেনিসের ওই খুনি আর তার দোস্ত... স্থানীয় এক গুণ্ডা সে... ওদেরকে ঘণ্টাখানেক বন্দি করে রাখলাম আমি। এরপর এল একটা ফোন। ওটা তুলে কথা বললাম আমি, অপরপক্ষকে চমকে দেবার জন্যই পরিচয় দিলাম তোমার নাম বলে। ব্যাটার তো তখন প্যান্ট খারাপ হয়ে যাবার দশা। খসখসে গলায় জানাল, লণ্ডনে খোঁজ পাওয়া গেছে তোমার... প্যারিসে থাকি কী করে! জোর দিয়ে তখন জানালাম, লণ্ডনে যাকে দেখা গেছে, সে আমার ডিকয়... আমিই আসল মাসুদ রানা। নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করল লোকটা, ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে দূর করলাম তার সন্দেহ। তারপর বললাম, ধরা দিতে চাই। এভাবে ছোটাছুটি করে পোষাচ্ছে না আমার। ওরা যদি সোনিয়াকে ছেড়ে দেয়, তা হলে বন্দি খুনিকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করব আমি।'

'এক মিনিট,' আবার বাধা দিল রানা। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফোনের ওই লোক জানত, আমি বেঁচে আছি। যদি গুজব শোনা পার্টির কেউ হতো, তা হলে আপনার কথা বিশ্বাসই করত না।'

'এর মানেটা বুঝতে পারছ?' ভুরু নাচাল কুয়াশা।

'হ্যাঁ। ফেনিসের ভিতরে শ্রেণী বিভাজন রয়েছে।'

'একজ্যাক্টলি। সবাইকে সব কিছু জানানো হয় না... কিংবা জানানো হয় মিথ্যে তথ্য।'

'কেন?'

'সিম্পল,' পায়ের উপর পা তুলল কুয়াশা। 'বড় বড় সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনে নানা রকম খুঁত থাকে... ফেনিসও তার ব্যতিক্রম নয়। তা ছাড়া ওরা কাজ করছে উচ্ছৃঙ্খল, খুনে, ম্যানিয়াকদেরকে নিয়ে। তাদের সবাই যে সেন্ট্রাল কমাণ্ডের অর্ডার

মেনে নেবে, এমনটা ভাবা ভুল। তোমাকে জ্যান্ত রাখা দরকার... অথচ মুখের কথায় সেটা সম্ভব নয়। মাথা গরম সৈনিকরা তোমাকে দেখামাত্র খুন করে ফেলতে পারে। তাই চমৎকার একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে—তুমি মারা গেছ। মরা মানুষকে কেউ শিকার করে না, তা-ই না?'

'একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু দ্বিতীয়টা? আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে কেন ওরা?'

'আমি বলব, ফেনিস তোমাকে দলে ভিড়াতে চাইছে।'

'হোয়াট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

কুয়াশা নির্বিকার। বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার স্ট্যাটাস... তোমার কানেকশন... তোমার দক্ষতা... এসব কত কাজে লাগতে পারে ফেনিসের! আট-দশটা আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য তুমি, দুনিয়াব্যাপী রয়েছে তোমার নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নেটওঅর্ক, নামীদামি বহু মানুষ তোমার বুদ্ধি-পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। এমন যোগ্যতা ওদের পুরো অর্গানাইজেশনে আর কারও আছে কি না সন্দেহ!'

'আপনার ব্যাপারে ভিন্ন অ্যাপ্রোচ কেন?'

'কাম অন!' হাসল কুয়াশা। 'পলাতক এক বিজ্ঞানী আমি, এমনিতেই সারা দুনিয়ার পুলিশ খুঁজছে আমাকে। এ-অবস্থায় আমাকে দলে ভিড়ানো, আর খাল কেটে কুমির ডেকে আনা একই কথা।'

'এই দলে ভেড়ানোর আইডিয়া আপনার মাথায় এল কেন?'

'খুন হবার আগে আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল ক্রুনা ভরগেন—ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিল। ওই প্রস্তাব দেবার অধিকার ছিল না ওর, তবে কথাবার্তায় এটা বুঝেছি—যোগ্য প্রতিপক্ষ পেলে তাকে দলে টানার নজির আছে ফেনিসে। আমাকে

হয়তো চায় না ওরা... কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা। যদি রাজি করাতে না পারে, তা হলে নিঃসন্দেহে খুন করবে... কিন্তু এ-মুহূর্তে একটা বিকল্প দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

রেস্টুরেন্টের ফোনে শোনা সেই অচেনা লোকটার কথা মনে পড়ল রানার।

...একসঙ্গে বসে নিজেদের বিভেদ মিটিয়ে নেয়া ভাল না? কথা বললে বুঝতে পারবেন, আমাদের বিভেদ যতটা বড় ভাবছেন, ততটা আসলে নয়...।

কে জানে, কুয়াশার ধারণাই হয়তো সত্যি।

'প্যারিসের ঘটনা শেষ করুন,' বলল রানা। 'সোনিয়াকে উদ্ধার করলেন কীভাবে?'

'ওটা তেমন কঠিন হয়নি। তোমার নাম করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম না? ব্যাটা রাজি হয়ে গেল। কথাবার্তা বলে ডি ল্য কনকর্ডের রাস্তায় ঠিক দুপুর বারোটায় দেখা করবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো—গাড়ি নিয়ে যাব দু'পক্ষই; একটায় থাকবে সোনিয়া-সহ ওদের ড্রাইভার, অন্যটায় নিজস্ব একজন ড্রাইভার-সহ আমি আর ওদের বন্দি খুনি। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু ড্রাইভার অদল-বদল হবে। আমার ড্রাইভার সোনিয়াকে নিয়ে চলে যাবে, আর ওদের ড্রাইভার দায়িত্ব নেবে আমাদের। চালাকিটা খাটালাম ওখানেই। উল্কিঅলার সঙ্গের লোকটার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাই ওকে বেহুঁশ করে মাসুদ রানা বানালাম... আমি নিজে সাজলাম ড্রাইভার। বারোটার সময় যখন অদল-বদল হলো, গাড়ি-সহ সোনিয়াকে পেয়ে গেলাম আমি... ওদের হাতে ধরা না দিয়েই!'

'ওরা টের পায়নি?' অবাক হলো রানা।

'পাবে না কেন? দু'মিনিটের মধ্যেই পেয়েছে। ধাওয়াও

করেছিল। গাড়ি নিয়ে একটু খেল্ দেখাতে হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছি ওদেরকে।'

'কপাল ভাল আপনি প্যারিসে গিয়েছিলেন!' বলল রানা। 'নইলে সোনিয়াকে বাঁচাবার কোনও উপায় ছিল না।' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, 'ধন্যবাদ।'

'বাদ দাও তো ওসব!' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কুয়াশা। 'আজকের পেপার দেখেছ?'

'হ্যাঁ। আমেরিকার ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনালের বিশাল শেয়ার আছে ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে।'

'কীসের শেয়ার? আমার তো মনে হয় ওরাই মালিক। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, ওদের হেডকোয়ার্টার বস্টনে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য ফোর্থ-এর শহর, যাঁর পিতামহ কাউন্ট বারেমির ভিলায় অতিথি হয়েছিলেন। লোকটার সঙ্গে ট্রান্সকমের সম্পর্ক আছে কি না, সেটাই এখন দেখতে হবে আমাদেরকে।'

'দেখাদেখির কী আছে? নেই বলে ভাবছ নাকি?'

'এই মুহূর্তে কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিত নই আমি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'আসুন, দু'জনে কী কী জেনেছি, সেসব আলোচনা করলে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে।'

একমত হলো কুয়াশা। 'রোম দিয়ে শুরু করো। বিয়াঞ্চির ব্যাপারে সব জানতে চাই আমি।'

ইটালিতে ঘটে যাওয়া সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দিল রানা। একটু সময় নিল রেড ব্রিগেডের সঙ্গে সেনিয়ার কানেকশনের অংশটা ব্যাখ্যা করতে।

'তা হলে ও-জন্যেই কর্সিকায় লুকিয়ে ছিল সোনিয়া?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'ব্রিগেডের হাত থেকে বাঁচার জন্য?'

'হ্যাঁ। ব্রিগেডের ফাইনান্সিঙের ব্যাপারে যা শুনেছি ওর কাছে, সম্ভবত ওই পদ্ধতিতেই বাকি সব টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনকে টাকা দিচ্ছে ফেনিস।'

'আর পাভোরোনির ব্যাপারটা?'

'বিয়াঞ্চির হাত থেকে ফেনিসের মশাল এখন চলে গেছে পাভোরোনির হাতে। মানেটা পরিষ্কার—বংশ-পরিচয় নয়, কাউন্সিলের সদস্য হবার জন্য ভিন্ন যোগ্যতা প্রয়োজন।'

'ক্রুনা ভরগেনও একই কথা বলেছিল,' কুয়াশা বলল। 'ওদেরকে নাকি বাছাই করা হয়েছে।'

'লেনিনগ্রাদ থেকে জার্মানি পর্যন্ত কী ঘটল শোনা যাক এবার,' বলল রানা

শান্ত কণ্ঠে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল কুয়াশা। চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে; কিন্তু নাতালিয়া, শেভচেঙ্কো আর হাইনরিখ বোহ্‌লের কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেল ওর। কারণটা বুঝতে পেরে সহানুভূতির দৃষ্টি ফুটল রানার চোখে।

'অ্যানসেল ভরগেনে পরিণত হয়েছিল প্রিন্স আন্দ্রেই ভারাকিন,' উপসংহারে বলল কুয়াশা। 'ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা... ক্রুপদের পরেই জার্মানির সবচেয়ে বড় অস্ত্র-নির্মাতা ওরা। পুরো ইয়োরোপ জুড়ে ওদের ব্যবসা। ক্রুনাকে বানানো হয়েছিল তার দাদুর উত্তরসূরি।'

'ওয়ালথার ভরগেন বাদ পড়ে গেছে মাঝখানে,' মন্তব্য করল রানা। 'ঠিক যেমন বাদ পড়েছিল মার্সেলো বিয়াঞ্চি। আপনার ধারণাই ঠিক—বাছাই করে কাউন্সিল সদস্য নেয় ফেনিস।'

'এদের কেউই সংগঠনের জন্য অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না,' যোগ করল কুয়াশা। 'পরিচয় ফাঁস হবার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে খুন করে ফেলল... ইমপরট্যান্ট হলে ওভাবে মারতে পারত না।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদেরকে দলে রেখেছিল ফেনিস... অন্যদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ দেখিয়েছিল। ওদের কাজ শেষ; পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতেই আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি।'

'কিন্তু কী সেই কাজ?' অধৈর্য গলায় বলল কুয়াশা। 'কর্পোরেট স্ট্রাকচারের সাহায্য নিয়ে খুন আর সন্ত্রাসকে ফাইনান্স করছে ওরা, পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে অস্থিরতা আর আতঙ্ক। কেন? কোনও মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না এর।'

বেডরুমের দিক থেকে গোঙানির আওয়াজ আসায় উঠে দাঁড়াল রানা। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। না, জাগেনি সোনিয়া। ঘুমের ঘোরে গুঙিয়ে উঠেছে। একটু নড়াচড়া করে স্থির হলো। নিয়মিত তালে ওঠানামা করছে বুক। সিটিংরুমে ফিরে এল রানা।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'না। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠেছে,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে আলোচনার খেই ধরল কুয়াশা, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতি হয়নি আমাদের। চারটে নাম আছে আমাদের হাতে, তার মধ্যে দুজন মারা গেছে, বাকি দুজনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেলেও একই ঘটনা ঘটবে কি না, বলা যাচ্ছে না। ফেনিসের কুকীর্তির খবর পেয়েছি—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি টাকা ঢালছে রেড ব্রিগেডে, ভরগেন নিঃসন্দেহে বাদের-মেইনহফে, ট্রান্সকম কাদেরকে দিচ্ছে খোদাই জানে। কিন্তু এসব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারব না আমরা। মোটিভও জানতে পারিনি। সোজা কথায় বলা যেতে পারে—ফেনিসকে খুঁজে পেয়েছি আমরা, কিন্তু অদৃশ্য অবস্থায়! ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'বড় একটা সমস্যাই বটে,' স্বীকার করল রানা।

'কিন্তু যদি ধরাছোঁয়ার ব্যবস্থা করা যায়?' বলে উঠল কুয়াশা।

'কী বলতে চান?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ওদের একজনকে আটক করতে হবে আমাদের, রানা... বড়-সড় কাউকে, এবং জ্যান্ত অবস্থায়।'

'হোস্টেজ?'

'দ্যাট'স্ রাইট।'

'পাগলের মত কথা বলছেন!' বিরক্তি ফুটল রানার গলায়। 'যাকে আটকাবেন, তাকে খুঁজে বের করবার জন্য ফেনিসের পাশাপাশি লোকাল ল-এনফোর্সমেন্টও আদাজল খেয়ে পিছনে লেগে যাবে আমাদের। বেশি সময় টেকা যাবে না।'

'ভুল,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'ইটালির প্রাক্তন প্রাইম মিনিস্টার অল্ডো মোরে-কে পঞ্চান্ন দিন আটকে রেখেছিল রেড ব্রিগেড—রোমের পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র আট ব্লক দূরে! পুলিশ তার টিকিটিও খুঁজে বের করতে পারেনি।'

'প্রাইম মিনিস্টারের উদাহরণ দিচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাকে উঠিয়ে আনতে চান আপনি?'

সরাসরি জবাব দিল না কুয়াশা। অর্থপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'নাইজেল উইটিংহ্যামের ব্যাপারে কী প্ল্যান করেছ?'

'আজ রাত আটটায় এখানেই আসবার কথা উইটিংহ্যামের। বিএসএস চিফ মারভিন লংফেলোকে কনভিন্স করেছি। উনিই নিয়ে আসবেন ফরেন সেক্রেটারিকে। বিয়াঞ্চিকে যে-ভাবে চাপ দিয়ে ইনফরমেশন আদায় করেছিলাম, সে-ভাবে ওঁকেও ব্ল্যাকমেইল করব বলে ভাবছি।'

'ওসবের দরকার নেই। লোকটা এখানে আসছে যখন, তাকে কবজা করার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'মি. লংফেলো আসছেন

উইটিংহ্যামের সঙ্গে। আর যা-ই করুন, আমাদের হাতে তাঁর দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে কিছুতেই তুলে দেবেন না।'

'মি. লংফেলোকে আমাদের আসল প্ল্যান না জানালেই হয়।'

'ভেবেছেন ফরেন সেক্রেটারিকে বন্দি করতে গেলে উনি চুপচাপ বসে থাকবেন? তা ছাড়া... আমরা অমন কিছু করতে গেলে মহাবিপদে পড়ে যাবেন মি. লংফেলো। তাঁর কাস্টডি থেকে গায়েব হয়ে যাবেন উইটিংহ্যাম, এর জন্য ভয়ানক শাস্তি হয়ে যেতে পারে। না, না... জেনেশুনে ওঁকে এত বড় বিপদে ফেলতে পারব না আমি। তা হয় না!' রানার কণ্ঠে তীব্র আপত্তি।

'দুনিয়াদারি সম্পর্কে এখনও তোমার অনেক কিছু শেখার আছে, বন্ধু,' উপহাসের সুর ফুটল কুয়াশার কথায়। 'এখনও বুঝতে পারছ না, কীসের মধ্যে পড়েছি আমরা। কোণঠাসা অবস্থা আমাদের, চরম পদক্ষেপ নিতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাব। কী ভেবেছ তুমি, উইটিংহ্যামকে ব্ল্যাকমেইল করলেই হড়বড় করে সব বলে দেবে? বিএসএস চিফের সঙ্গে থাকবে ও, কাজেই মনে মনে এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করবে। জানবে, লংফেলো কিছুতেই ক্ষতি হতে দেবেন না তার। মুখ খোলাবার জন্য এই নিরাপত্তাই সরিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে, ওকে ফেলে দিতে হবে অনিশ্চয়তার মধ্যে। যখন জানবে তার কোনও আশা নেই, কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না... শুধুমাত্র তখনই কথা বলার তাগিদ অনুভব করবে মনের ভিতর।'

'আপনার যুক্তি আমি অগ্রাহ্য করছি না,' রানা বলল। 'কিন্তু মি. লংফেলোকে বিপদে ফেলবার মত কোনও কাজ করতে আমি রাজি নই।'

'তা হলে এসো, ওঁকে বিপদমুক্ত করবার ব্যবস্থা নিই,' বলল কুয়াশা। 'কখন আসছেন ওঁরা, কোন্ রাস্তায় আসবেন—সেগুলো

জানা আছে আমাদের। হোটেলে পৌঁছুনোর আগেই ওঁদেরকে রাস্তায় অ্যামবুশ করি না কেন? ছিনিয়ে নেব ফরেন সেক্রেটারিকে।'

'মি. লংফেলো?'

'ওই দিকটা কাভার দেবার জন্যই তো অ্যামবুশ করব! নইলে হোটেলের এই কামরাতেই ফাঁদ পাততাম। মিডিয়ার কাছে কোনও একটা সন্ত্রাসী দলের নামে ভুয়া মেসেজও পাঠাব আমরা, সঙ্গে থাকবে মুক্তিপণের দাবি। এর পরে কেউ আর দোষারোপ করতে পারবে না মি. লংফেলোকে।'

প্ল্যানটা নেড়ে-চেড়ে দেখল রানা। ছোটখাট খুঁত আছে, কিন্তু একদিক থেকে মন্দ নয়। গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি যেন-তেন মানুষ নন। তাঁর মুখ দিয়ে যদি দুনিয়ার সামনে ফেনিসের অস্তিত্ব আর লক্ষ্য নিয়ে কথা বেরোয়, তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না কেউ। তবু কেন যেন মন মানতে চাইছে না। মনে হচ্ছে যেন মি. লংফেলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে সেটা।

'কী ভাবছ?' ওর নীরবতা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'আমার প্রস্তাব পছন্দ হচ্ছে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আপনি যা করতে চাইছেন, সেটা অপরাধীদের পথ। আপনার জন্য মানানসই, কিন্তু আমি এভাবে কাজ করি না।'

'ন্যায়ের পথে থেকে এখন পর্যন্ত কী-ই বা করতে পেরেছ?' রূঢ় গলায় বলল কুয়াশা। 'মেনে নাও, রানা, ফেনিসকে পরাস্ত করতে গেলে ন্যায়-নীতি, আবেগ, দয়া... এসবকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। ওদের মত নিষ্ঠুর হতে হবে আমাদেরকেও।'

'তাই বলে বন্ধু আর মিত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

'প্রয়োজনবোধে... হ্যাঁ,' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল কুয়াশার। 'উইটিংহ্যামকে বাগে পাবার জন্য এরচেয়ে ভাল কোনও বুদ্ধি

থাকলে বলতে পারো। আমি শুনছি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হার মানল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনার প্ল্যান মোতাবেকই এগোব আমরা। দেখা যাক, উইটিংহ্যামকে আটক করে কিছু উদ্ধার করা যায় কি না। ভুল বলেননি, কোণঠাসা অবস্থা আমাদের... এখন দু'চারটে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ যুক্ত হলে কিছু যায়-আসে না। তবে একটাই শর্ত আমার—অ্যামবুশের সময় মি. লংফেলোর কোনও ক্ষতি করা যাবে না। আমি চাই না তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও লাগুক।'

'তেমন ইচ্ছে আমারও নেই...'

কুয়াশার কথা শেষ হবার আগেই বেডরুম থেকে আবার শোনা গেল গোঙানি। এবার আগের চেয়ে জোরে। তার পিছু পিছু ভেসে এল ব্যথাতুর একটা চিৎকার, বিছানায় শরীর তড়পানোর আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল রানা, চলে গেল সোনিয়ার পাশে। ছটফট করছে মেয়েটা, ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ... কিন্তু চেতনা ফেরেনি এখনও। মাথার কাছে বসে চুলে হাত বোলাতে শুরু করল। একটু পরে শান্ত হয়ে এল মেয়েটা।

রানার পিছু পিছু কামরার দরজা পর্যন্ত এসেছে কুয়াশা। ওখান থেকে বলল, 'উইথ্ড্রোয়াল সিনড্রোম। সকাল পর্যন্ত চলবে। শরীর থেকে বেরুতে শুরু করেছে ড্রাগ... ব্যথাটা সাইড-এফেক্ট। কিছু করার নেই তোমার, শুধু ধরে রাখো ওকে।'

'জানি। থাকছি আমি ওর কাছে।' মৃদু গলায় বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল কুয়াশা। তারপর বলল, 'আমি এখন চলি। সকালে আবার যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে। রাতের প্ল্যান-প্রোগ্রাম তখন ফাইনাল করে নেয়া যাবে।'

'চাইলে এখানেই থাকতে পারেন রাতটা,' প্রস্তাব দিল রানা।

'দু'জনের এক জায়গায় থাকা ঠিক হবে না,' কুয়াশা বলল। 'লণ্ডনে আমার মাথা গোঁজার অনেক জায়গা আছে। কিচ্ছু ভেবো না। সকালে ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বিদায়,' হাত নাড়ল কুয়াশা। 'খেয়াল রেখো মেয়েটার দিকে।'

'রাখব,' বলল রানা। 'কুয়াশা?'

চলে যাবার জন্য উল্টো ঘুরেছিল কুয়াশা, রানার ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল। 'কী?'

'আপনার বন্ধুদের জন্য আমি দুঃখিত। কথা দিচ্ছি, ওদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।'

দরজার সামনে থেকে সরে গেল কুয়াশা।

পনেরো

জানালা গলে সকালের রোদ মুখে পড়তেই জেগে উঠল সোনিয়া। নড়ল না সঙ্গে সঙ্গে, নিঃসাড়ে পড়ে রইল কয়েক মিনিট। আবছাভাবে কানে ভেসে আসছে পরিচিত দুটো পুরুষকণ্ঠ। আস্তে আস্তে চোখ মেলল ও, কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানায় উঁচু হলো একটু। চোখ বোলাল চারপাশে। কামরা-টা অচেনা, হোটেলের বেডরুম বলে মনে হলো। কখন-কীভাবে এখানে এসেছে, কিচ্ছু মনে নেই। তবে রানা-কুয়াশার কণ্ঠ অন্তরে বুলিয়ে দিচ্ছে স্বস্তির

পরশ।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল সোনিয়া। চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে ঝুলছে একটা রোব—ওটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল স্যুইটের বসার ঘরে। সোফায় বসে আছে বাংলাদেশের দুই দুর্ধর্ষ মানুষ, ঝুঁকে রয়েছে সেন্টার-টেবিলের উপর বিছানো একটা ম্যাপের উপর। নিচুস্বরে আলোচনা করছিল, পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাল।

'ঘুম ভেঙেছে তা হলে?' হাসি ফুটল রানার মুখে। সোফা ছেড়ে উঠে এল ওর দিকে। 'কেমন বোধ করছ?'

রাতে অসুস্থতার ঘোরে রানাকে ঠিকমত চিনতেই পারেনি সোনিয়া, এখন দেখামাত্র আবেগ ভর্ করল। রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। ফিসফিস করে বলল, 'এসব কী ঘটছে, রানা?'

গলা খাঁকারি দিল কুয়াশা। তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো সোনিয়া। মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। 'সরি, মি. কুয়াশা।'

'সরি না, ধন্যবাদ জানাও ওঁকে,' বলল রানা। 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উনিই তো উদ্ধার করেছেন তোমাকে।'

বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চোখে। 'তা-ই?'

'ও কিছু না,' হাত নাড়ল কুয়াশা। 'এসব আমাদের জন্য সহজ কাজ।'

'কোথায় আমরা?' চারপাশে তাকাল সোনিয়া।

'লণ্ডনের একটা হোটেলে,' রানা বলল। 'গতকাল রাতে তোমাকে নিয়ে এসেছেন কুয়াশা। কিডন্যাপাররা একটা ড্রাগ দিয়েছিল তোমাকে, তাই কিছু টের পাওনি।'

'লণ্ডন?' বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চেহারায়।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কেমন বোধ করছ তুমি? কোনও

অসুবিধে নেই তো?'

'একটু দুর্বল লাগছে, আর কিছু না।'

'গুড। ড্রাগটা তা হলে শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। গোসল-টোসল সেরে খাওয়া-দাওয়া সারো। সুস্থ হয়ে নাও পুরোপুরি। আজ রাতে তোমাকে দরকার হবে আমাদের।'

'কীসের জন্য?' কৌতূহল ফুটল সোনিয়ার চোখে।

'পরে জানতে পারবে,' বলল কুয়াশা। 'এখন যাও।'

'তোমার জন্য কিছু জামা-কাপড় কিনে এনেছি সকালে,' যোগ করল রানা। 'ক্লজিটে পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেডরুমে চলে গেল সোনিয়া।

কুয়াশার পাশে এসে বসল রানা। বলল, 'রাতের অপারেশনে ওকে রাখার ব্যাপারে এখনও মনের সায় পাচ্ছি না আমি।'

'কেন?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'যথেষ্ট ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে। তা ছাড়া এসবের জন্য ট্রেইনড্ নয় মেয়েটা।'

'ভুল বললে। রেড ব্রিগেড থেকে এ-ধরনের কাজেরই ট্রেইনিং পেয়েছে ও। আর ধকল-টকল... ওসব আপাতত সহ্য করে নিতে হবে। রাতের জন্য তৃতীয় একজনকে দরকার আমাদের; ও ছাড়া হাতে আর কেউ নেই এ-মুহূর্তে।'

'জানি,' শ্রাগ করল রানা। 'তবু...'

'ওসব চিন্তা আপাতত দূর করো মাথা থেকে,' কুয়াশা বলল। 'আমাদের প্ল্যান অভ অ্যাকশনই তো ঠিক হলো না এখনও। এসো... হাতে সময় নেই বেশি।'

টেবিলের উপর আবার ঝুঁকে পড়ল দু'জনে। লণ্ডন শহরের স্ট্রিট ম্যাপ বিছিয়েছে ওখানে।

'বেলগ্রাভিয়া থেকে আসবেন লংফেলো... ফরেন সেক্রেটারিকে

নিয়ে,' ম্যাপে আঙুল রাখল কুয়াশা। 'কনৌট হোটেলে আসবার জন্য ডাইরেক্ট রাস্তা হলো এটা।'

'উঁহুঁ, এ-পথে আসবেন না,' রানা মাথা নাড়ল। 'বিএসএস হেডকোয়ার্টারে যাবার কথা বলে রওনা হবেন। কনৌট হোটেলের দিকে ঘুরবেন শেষ মুহূর্তে, যাতে আগেভাগে কিছু টের না পান উইটিংহ্যাম।'

'তা হলে হাইড পার্ক পেরুনোর পর ঘুরবেন উনি।' চঞ্চল চোখে ম্যাপ জরিপ করল কুয়াশা। 'অনেকগুলো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি; তার মধ্যে যে-কোনোটা বেছে নিতে পারেন।'

'সেটা শুধু বেসওঅটর ক্রস করা পর্যন্ত। কার্লোস প্লেসে আসতে হলে এজওয়্যার রোডে আসতে হবে ওঁকে।'

'ওখানে অ্যামবুশ করা একটু রিস্কি হয়ে যায় না?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'অনেক বড় রাস্তা, মানুষ আর গাড়িঘোড়ার অভাব নেই।'

'আজ রবিবার,' মনে করিয়ে দিল রানা। ট্রাফিক অনেক কম থাকবে রাস্তায়। তবে হ্যাঁ... তারপরেও জায়গাটা সুবিধের না। অন্য স্পট খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

'এটা?' ম্যাপে আবার আঙুল রাখল কুয়াশা। 'এজওয়্যার রোড থেকে কার্লোস প্লেসে যাবার সরাসরি রাস্তা এটা। খুব বড় নয়।'

'জর্জ স্ট্রিট,' নাম পড়ল রানা। 'হুঁ, বেটার। তবে আরেকটু দেখা যাক।'

মিনিট পনেরো ব্যয় করল দু'জনে ম্যাপ স্টাডি করায়, কিন্তু আর কোনও ভাল জায়গা খুঁজে পেল না। পুরো রুটে জর্জ স্ট্রিট-ই একমাত্র সুবিধাজনক স্পট। তাই ওখানেই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

'ওকে, জায়গা ঠিক হলো,' সোফায় হেলান দিয়ে বসল

কুয়াশা। 'গাড়ি?'

'অফিশিয়াল না, ব্যক্তিগত গাড়িতে আসবেন লংফেলো,' জানাল রানা। 'ওটা একটা অ্যাসটন-মার্টিন। ধূসর রঙা। লাইসেন্স নাম্বার জিবি-১০৯৮।'

'সিকিউরিটি?'

'গোপন মিটিঙে আসছেন ওঁরা, সঙ্গে সিকিউরিটি থাকার কথা না। মি. লংফেলোকে মানাও করে দিয়েছি আমি।'

'খুব ভাল। তা হলে আমাদের প্ল্যান ফাইনাল করে নেয়া যাক। সোনিয়া প্রাথমিক ব্যারিকেডে থাকবে—গাড়ি থামানো, এবং লংফেলোকে নিউট্রালাইজ করা ওর দায়িত্ব। এরপর অ্যাসটন-মার্টিন দখল করব আমি, উইটিংহ্যামকে নিয়ে আসব অস্ত্রের মুখে।'

'আমি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'মি. লংফেলোর গাড়ি চেনো তুমি, কাজেই স্পটার এবং কো-অর্ডিনেটর হিসেবে থাকতে হবে তোমাকে... সেইসঙ্গে থাকবে আমাদের ব্যাকআপ হিসাবে,' জানাল কুয়াশা। 'দ্বিতীয় একটা গাড়ি থাকবে তোমার কাছে। সোনিয়াকে পিকআপ করে আমার পিছু নেবে তুমি।'

'সোনিয়ার কাজটা একটু কঠিন হয়ে গেল না?'

'কিছু করার নেই। লংফেলোর সামনে পরিচিত কাউকে পাঠানো যাবে না। ফাইলে আমার ছবি দেখেছেন তিনি, তোমাকে তো এক মাইল দূর থেকে চিনবেন। শুধু সোনিয়াকেই চেনেন না ভদ্রলোক। ও ছাড়া আর কেউ কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

'কিন্তু ওঁকে কাবু করবে কীভাবে সোনিয়া?'

'ইঞ্জেকশন হলে কেমন হয়? ছোট্ট একটা খোঁচা... একটা মেয়ের জন্য অতখানি কাছে যাওয়া কঠিন নয়।'

ভেবে দেখল রানা। ভাগ্যের একটু সহায়তা লাগবে, সেইসঙ্গে দক্ষ অভিনয় আর ঠাণ্ডা মাথা... হয়তো উৎরে যাবে সোনিয়া। তা ছাড়া কাছাকাছি ও আর কুয়াশা তো থাকছেই। মনের মধ্যে একটু খুঁতখুঁতানি থাকলেও রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আসুন, এবার কী কী জিনিসপত্র দরকার, সেগুলো ঠিক করে নিই...'

রাত সোয়া আটটা।

জর্জ স্ট্রিট আর এজওয়্যার রোডের মোড় থেকে সামান্য দূরে একটা বিল্ডিঙের ছাতের উপর বসে আছে রানা। চোখে লাগিয়ে রেখেছে বিনকিউলার। রোডলাইটের কারণে রাস্তা আলোকিত, তারপরেও একটা নাইট ভিশন রেখেছে সঙ্গে। কানে লাগিয়ে রেখেছে মিনিয়েচার কমিউনিকেশন ডিভাইস—রেঞ্জ দু'মাইল। একই জিনিস রয়েছে কুয়াশা আর সোনিয়ার কাছে। জর্জ স্ট্রিটের একশো গজ ভিতরে ছায়ায় লুকিয়ে আছে ওরা। পজিশন নেবার আগে সাইলেন্সার-অলা পিস্তলের গুলিতে বেশ কয়েকটা রোডলাইট নষ্ট করে দিয়েছে, অ্যামবুশের জায়গাটা যেন বেশ কিছুটা অন্ধকার হয়ে যায়।

রানা এজেন্সির সেফ হাউস থেকে সমস্ত ইকুইপমেণ্ট এনেছে রানা। কোনও সমস্যা হয়নি। এখন পর্যন্ত প্ল্যান মোতাবেক এগোচ্ছে সব। ওর ধারণাই ঠিক, সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কম, জর্জ স্ট্রিটকে মোটামুটি নির্জনই বলা চলে। কদাচিৎ একটা-দুটো গাড়ি যাচ্ছে, কিংবা উদয় হচ্ছে নিঃসঙ্গ পথচারী। এভাবে চলতে থাকলে সহজেই কার্যোদ্ধার হবে।

'রানা!' খড়খড় করে উঠল কানে লাগানো রেডিও—কুয়াশার গলা। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' জবাব দিল রানা। 'তবে সময় হয়ে এসেছে। তৈরি থাকুন। সোনিয়ার কী অবস্থা?'

'আমি রেডি, রানা,' বলল মেয়েটা। 'কিচ্ছু ভেবো না।'

'যে-ভাবে বলেছি, সে-ভাবেই কোরো সব। বাড়তি কিছু করতে যেয়ো না।'

'আচ্ছা।'

দূরে একজোড়া হেডলাইট চকচক করে উঠল এ-সময়। বিনকিউলার ঘোরাল রানা। অ্যাসটন-মার্টিন। লাইসেন্স নাম্বার চেক করল—ভুল নেই, মারভিন লংফেলোরই গাড়ি ওটা। ঘণ্টাখানেক আগে ফোনে কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। জানিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনৈক এশিয়ান কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে মিটিঙের অজুহাত দিয়েছেন তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে, বিএসএস হেডকোয়ার্টারে গোপনে যাবার জন্য রাজি করিয়েছেন। কথা বলার সময় বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে রানা, ইচ্ছে করছিল মি. লংফেলোকে সতর্ক করে দেয়... জানায় কী করতে চলেছে ওরা। পরিস্থিতির জন্য পারেনি। তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে হৃদয়। শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে ধোঁকা দিতে চলেছে ও... কীভাবে তা মেনে নেবে? কিন্তু উপায়ও তো নেই!

ভাবাবেগ চাপা দিয়ে রেডিওতে সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'কুয়াশা, সোনিয়া... গেট রেডি। আসছে গাড়িটা।'

এজওয়্যার রোড থেকে মোড় নিয়ে জর্জ স্ট্রিটে ঢুকল অ্যাসটন-মার্টিন। বিনকিউলারে সামনে-পিছনে দেখে নিল রানা—না, সিকিউরিটির জন্য আর কেউ নেই। নাইট-ভিশনের সাহায্যে দেখে নিল গাড়ির ভিতরটাও। দু'জন মাত্র আরোহী। তারমানে সব ঠিকঠাক আছে। সঙ্গীদের জানিয়ে দিল সেটা।

মোড় ঘোরার সময় গতি কমাতে বাধ্য হয়েছেন লংফেলো, জর্জ

স্ট্রিটে ঢুকে ধীরে ধীরে আবার বাড়াতে শুরু করলেন। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে নজর রাখল রানা, অ্যাসটন-মার্টিন ওর প্রত্যাশিত পজিশনে পৌঁছুতেই রেডিওতে নির্দেশ দিল, 'এবার, সোনিয়া... এবার!'

বিনা নোটিশে রাস্তার পাশের গলি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল মেয়েটা। পরনে শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড়, হাত দিয়ে ঠেলছে একটা ভাঙাচোরা শপিং কার্ট—সেটা বাতিল জিনিসপত্রে ঠাসা। গৃহহীন উদ্বাস্তুর সাজ, দেখে মনে হবে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে গেল গাড়ির সামনে।

ব্রেক কষলেন মারভিন লংফেলো, দেরি করে ফেলেছেন, রাস্তার অ্যাসফল্টে কর্কশ আওয়াজ তুলল টায়ার। ঘষটাতে ঘষটাতে ছুটে গেল সামনে। একটা চিৎকার দিয়ে গাড়ির সামনে থেকে সরে গেল সোনিয়া, অ্যাসটন-মার্টিনের বাম্পারের আঘাতে ছিটকে গেল ওর শপিং কার্ট। ভিতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

স্কিড করে বিশ ফুট যাবার পর থামল গাড়ি। ঝট্ করে খুলে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজা, বিএসএস চিফের পরিচিত অবয়বকে নেমে আসতে দেখল রানা। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে থাকা সোনিয়ার দিকে।

'তোমার কোথাও লাগেনি তো?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইলেন লংফেলো। নিখাদ উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে।

'হাঁটু ছড়ে গেছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সোনিয়া। 'কিন্তু আমার জিনিসপত্র... ওহ্, কত কষ্ট করে জমিয়েছি ওগুলো...'

ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার উপরে তাকালেন বিএসএস চিফ। ছেঁড়া কাপড়চোপড়, খালি টিন আর কাঁচের বোতল, পুরনো বইখাতা... এমন হরেক রকম জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাঁর চোখে জঞ্জাল, কিন্তু সন্দেহ নেই, গৃহহীন দরিদ্র মানুষের জন্য এগুলোই

সাত রাজার ধন।

'কোনও অসুবিধে নেই,' নরম গলায় বললেন তিনি, 'এসো, আমি সব কুড়িয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

'বড় ভাল মানুষ আপনি,' একটু হাসি ফোটাল সোনিয়া ঠোঁটের কোনায়।

ঝুঁকে রাস্তা থেকে জিনিসপত্র কুড়াতে শুরু করলেন লংফেলো, পায়ে পায়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল সোনিয়া। সাবধানে পোশাকের আড়াল থেকে বের করে আনল একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—চেতনানাশক ইঞ্জেকশন রয়েছে ওটার ভিতর।

'মুভ!' বিল্ডিঙের উপর থেকে কুয়াশাকে রেডিওতে নির্দেশ দিল রানা।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল অ্যাস্টন-মার্টিনের দিকে। ওর অংশটা বেশ সহজ—দরজা খুলে উঠে পড়বে ড্রাইভিং সিটে, পিস্তল দেখাবে উইটিংহ্যামকে, তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা কেটে পড়বে ওখান থেকে। কিন্তু কয়েক পা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল পরিস্থিতি, দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

পিছনে সোনিয়ার উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন মারভিন লংফেলো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে বিপদসঙ্কেত দিতে শুরু করেছে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন। সিরিঞ্জটা তাঁর বাহুতে গেঁথে দেবার চেষ্টা করছিল সোনিয়া, তার আগেই খপ্ করে ধরে ফেললেন ওর কবজি। হাত মোচড়াল সোনিয়া, মুক্ত করতে চাইল নিজেকে, পারল না। বরং ঝাঁকি দিয়ে ওকে সিরিঞ্জ ফেলে দিতে বাধ্য করলেন বিএসএস চিফ। তারপর এক ঝটকায় ঘুরিয়ে ফেললেন লাটিমের মত, ওর পিঠ নিজের দিকে আসতেই পিছন থেকে জাপটে ধরে ফেললেন, ডানহাত মুচড়ে ধরেছেন পিঠের

উপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সোনিয়া।

'বিরাট ভুল করে ফেলেছ, মেয়ে,' কঠিন গলায় বললেন লংফেলো। 'কে তুমি?'

বিনকিউলার দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছে রানা। 'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'সোনিয়া ধরা পড়ে গেছে!'

কুয়াশাও দেখতে পেয়েছে। নড়িয়ে পড়ল। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী করব এখন?'

'দাঁড়াবেন না! মি. লংফেলো ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই কেটে পড়ুন উইটিংহ্যামকে নিয়ে। সোনিয়াকে আমি দেখছি।'

ছুটতে শুরু করল কুয়াশা। কপাল ভাল, এদিকে পিঠ দিয়ে রেখেছেন লংফেলো, ওকে দেখতে পাচ্ছেন না। আশপাশে নজর বোলাল, কৌতূহলী লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে রাস্তার দু'পাশে। হাতে সময় নেই।

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে অ্যাস্টন-মার্টিনের দরজা খুলল কুয়াশা, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটের পিছনে। নাইজেল উইটিংহ্যাম বসে আছেন যাত্রীর আসনে, মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব চোখে তাকালেন ওর দিকে। চেঁচাবার জন্য মুখ খুলে থেমে গেলেন, কুয়াশার পিস্তলের চকচকে কালো নল তাকিয়ে আছে তাঁর কপাল বরাবর।

'একটুও আওয়াজ করবেন না!' হিসিয়ে উঠল কুয়াশা। 'চুপচাপ বসে থাকুন।' হাত বাড়াল ইগনিশনের দিকে।

ইঞ্জিন চালু করতে পারল না ও। তার আগেই দ্বিগ্বিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল হাই-পাওয়ার রাইফেলের আওয়াজে। অ্যাস্টন-মার্টিনের উইণ্ডশিল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, উইটিংহ্যামের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর আর্তনাদ।

ছিটকে আসা কাঁচের টুকরোয় মুখ-হাত কেটে গেছে কুয়াশার। ইনস্টিঙ্কটের বশে মাথা নামিয়ে ফেলল, ওখান থেকে তাকাল

ফরেন সেক্রেটারির দিকে। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে আছে ভদ্রলোকের, বুকে বিশাল এক ক্ষত... গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে সেখান দিয়ে। আবার গুলি হলো. সিটের উপর ঝাঁকি খেলো তাঁর দেহ, নতুন দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো বুকে। তারপরই এলিয়ে পড়লেন উইটিংহ্যাম।

রানা এসবের কিছুই দেখেনি, বিল্ডিঙের ছাত থেকে সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে আসছে ও সোনিয়াকে সাহায্য করবার জন্য। গুলির আওয়াজ শুনে রেডিওতে চেঁচাল, 'হচ্ছেটা কী, কুয়াশা?'

'স্নাইপার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কুয়াশা। 'গুলি করছে আমাদের দিকে। উইটিংহ্যাম মারা গেছেন! আমরা একা নই, আরও কেউ অ্যামবুশ পেতেছে এখানে!'

চমকে উঠল রানা। মস্ত ভুল করে ফেলেছে। লংফেলো আর ফরেন সেক্রেটারির পুরো যাত্রাপথে জর্জ স্ট্রিট-ই একমাত্র অ্যামবুশ-যোগ্য স্থান। কাজে নামার আগে এখানে আর কেউ ঘাপটি মেরেছে কি না, দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

'হায় খোদা!' ফিসফিস করে বলল ও, 'সোনিয়া! মি. লংফেলো! ওদেরকে সরিয়ে নিতে হবে ওখান থেকে, কুয়াশা...!'

'জানি,' বলল কুয়াশা। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

ইগনিশন ঘুরিয়ে অ্যাসটন-মার্টিনের ইঞ্জিন চালু করল ও। ব্যাক গিয়ার দিয়ে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল গাড়ি। চারদিকে তখন নরক ভেঙে পড়েছে। মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠছে পুরো রাস্তা, দু'পাশে জড়ো হওয়া আতঙ্কিত মানুষ ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে।

একের পর এক গুলিতে ফুটো হয়ে যাচ্ছে অ্যাসটন-মার্টিনের চেসিস, যতদূর সম্ভব পিছাল কুয়াশা, তারপর ব্রেক কষল। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল পিছনের সিটে। সেখান থেকে দরজা খুলে

নেমে পড়ল রাস্তায়। মারভিন লংফেলো আর সোনিয়ার খোঁজে রাস্তার উপর নজর বোলাল, চমকে উঠল জড়াজড়ি করে রক্তাক্ত দুটো মানবদেহকে পড়ে থাকতে দেখে।

‘সোনিয়া! মি. লংফেলো!’ চেঁচিয়ে উঠে ওদের দিকে ছুটে গেল ও।

নিথর হয়ে আছেন বিএসএস চিফ, শরীরের একপাশে গুলি লেগেছে, অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। তাঁর নীচে চাপা পড়েছে সোনিয়া, ধস্তাধস্তি করছে বেরিয়ে আসার জন্য। ওকে সাহায্য করল কুয়াশা, টান দিয়ে নিয়ে এল গাড়ির পিছনে।

‘গুলি লেগেছে তোমার?’ মেয়েটার রক্তে ভেজা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

‘ন্... না,’ কাঁপতে কাঁপতে বলল সোনিয়া। ‘এগুলো মি. লংফেলোর রক্ত। গুলি শুরু হতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছিলেন, তখনই গুলি খেয়েছেন... ছিটকে পড়েছেন আমার গায়ে।’

হতাশায় দাঁত পিষল কুয়াশা। রেডিওতে বলল, ‘রানা, আমাদের সাহায্য দরকার! কোথায় তুমি?’

‘দশ সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছুচ্ছি,’ সিঁড়ির ধাপ টপকাতে টপকাতে জানাল রানা।

ওর কথা শেষ হতেই রাস্তার মাথায় কালো একটা ভ্যানকে উদয় হতে দেখল কুয়াশা। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি পৌঁছে ব্রেক কষল, থামল একেবারে ওদের পাশে এসে। ঝটপট খুলে গেল সাইড-ডোর। স্নাইপারের গুলি থেমে গেল, স্কি-মাস্কপরা ষণ্ডামার্কা চারজন লোক নেমে এল ভ্যান থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশা আর সোনিয়ার উপর।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রানা দেখল, জোর-জবরদস্তি করে

ওদেরকে ওঠানো হচ্ছে ভ্যানে। চেঁচিয়ে উঠল ও, শোল্ডার হোলস্টার থেকে সিগ-সাওয়ার বের করে ছুটল বাধা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল স্নাইপারের রাইফেল। রানার পায়ের কাছে রাস্তার অ্যাসফল্টে মাথা কুটল বুলেট ঝাঁপ দিল রানা, এক গড়ান দিয়ে সোজা করল পিস্তল। কোত্থেকে গুলি করা হচ্ছে, জানে না; আন্দাজের উপর ভর করে দু'বার ট্রিগার চাপল।

কাজ হলো না ওতে। আবারও গুলি চালাল আততায়ী। মুখের কাছে ছিটকে ওঠা অ্যাসফল্টের গুঁড়োয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পিছাতে বাধ্য হলো রানা। পেভমেন্টের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মেইলবক্সের পিছনে আশ্রয় নিল ও। ওখান থেকে তাকাল ভ্যানের দিকে ধস্তাধস্তি করে চার প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কুয়াশা আর সোনিয়া, ওদেরকে তুলে ফেলা হয়েছে ভিতরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, টায়ার পুড়িয়ে সবেগে আগে বাড়ল ভ্যান। সিগ-সাওয়ার তুলে ওটার চাকার দিকে গুলি করল রানা, লাগাতে পারল না। হতাশায় ছেয়ে গেল অন্তর।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই এখন। কাজ শেষ করে স্নাইপারও সম্ভবত পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছে। ভ্যান সরে যাওয়ায় রাস্তাতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটা চোখে পড়ল রানার। বুকটা ধক্ করে উঠল।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। পাগলের মত ছুটে গেল বিএসএস চিফের দিকে। তাড়াতাড়ি চেক করল পালস্। বেঁচে আছেন লংফেলো, কিন্তু নাড়ির গতি অতি মন্থর। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ তাঁর জীবনীশক্তি কেড়ে নিতে শুরু করেছে। আঘাত পরীক্ষা করল রানা—বুকের ডান পাশে লেগেছে গুলি, একটুর জন্য মিস করেছে হৃৎপিণ্ড তবে ফুসফুস পাংচার হয়ে গেছে। পকেট

থেকে রুমাল বের করে ক্ষতস্থানে গুঁজে দিল রানা, গা থেকে নিজের কোট খুলে পেঁচাল লংফেলোর শরীরে, গিঁঠ দিল রুমালের উপরে। রক্তপাত থামানোর চেষ্টা।

প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গেছে পথচারীদের মধ্য থেকে। ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে তারা রানা আর লংফেলোর কাছে।

'অ্যাম্বুলেন্সের জন্য খবর দিন, প্লিজ!' চেঁচাল রানা জনতার দিকে তাকিয়ে। 'হাসপাতালে নিতে হবে ওঁকে।'

হাত-পা কাঁপছে ওর, পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু। পিছনে সাইরেনের আওয়াজ শুনল—পুলিশ না অ্যাম্বুলেন্স কে জানে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। কোলের মধ্যে জাপটে ধরে রেখেছে মারভিন লংফেলোর নিস্পন্দ দেহ। হঠাৎ খেয়াল করল, সভয়ে পিছাতে শুরু করেছে লোকজন। কী ব্যাপার দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতে শুরু করল, কিন্তু মাথা পুরোপুরি ঘোরার আগেই ঘাড়ের উপর পড়ল প্রচণ্ড এক রদ্দা।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল রানার, কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে। দু'জোড়া শক্তিশালী হাত দু'পাশ থেকে চেপে ধরল ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করল অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে। পিছনের দরজা খুলে তাতে ওঠানো হলো ওকে।

'সুইট ড্রিমস্, মি. রানা!' বলে উঠল খসখসে একটা কণ্ঠ।

পরমুহূর্তে চোয়াল বরাবর আরেকটা ঘুসি খেলো ও। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনে।

গাড়ির মৃদু ঝাঁকিতে অনেকক্ষণ পর চোখ মেলল রানা। উল্টোদিক থেকে পার হতে থাকা বেশ কয়েকটা হেডলাইট চোখে পড়ল ওর, নিজেকে আবিষ্কার করল পুলিশ কারের পিছনের সিটে, হ্যাণ্ডকাফ পরা অবস্থায়, অস্ত্র-শস্ত্র সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। ফ্রন্টসিট আর

ব্যাকসিটের মাঝখানে রয়েছে লোহার নেট, তার ওপাশে একা বসেছে ড্রাইভার। ইউনিফর্মধারী দ্বিতীয় পুলিশ বসে আছে ওর পাশে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' নীরস গলায় বলে উঠল লোকটা।

ঘাড় ফেরাতেই তার রিভলভারের নল দেখতে পেল রানা, তাক করে রাখা হয়েছে ওর দিকে। আলোছায়ার মাঝে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না লোকটার চেহারা। তবে কণ্ঠটা চেনা। নাইটস্‌ব্রিজের রেস্টুরেন্টে এই কণ্ঠই শুনেছিল টেলিফোনে।

'স্মিথ, রাইট?' বলল রানা।

হাসল লোকটা। 'আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করছি, মি. রানা। তবে ওটা আমার আসল নাম নয়।'

'বুঝতে পারছি,' সিটের উপর সোজা হয়ে বসল রানা। 'ইউনিফর্ম থেকে নেমপ্লেট খুলে রেখেছ এজন্যেই।'

'আপনার নজর চোখা, মি. রানা।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রানা জানতে চাইল।

'এ-মুহূর্তে আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে।' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল স্মিথ। 'খুব খারাপ একটা কাজ করেছেন আপনি, মি. রানা। গ্রেট ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারিকে খুন করেছেন... গুলি চালিয়েছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফের উপরেও।'

প্রতিবাদ করল না রানা। বোঝা যাচ্ছে, নতুন করে ওকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে ফেনিস। শুধু প্রশ্ন করল, 'মি. লংফেলো... উনি বেঁচে আছেন?'

'এখন পর্যন্ত... হ্যাঁ। কপাল ভাল, ঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেছে তাঁর কাছে। তবে শেষ পর্যন্ত টিকবেন কি না, তা এখুনি বলা যাচ্ছে না।'

'আর আমার বন্ধুরা?'

'কুয়াশা আর ওই মেয়েটা? ওরাও বেঁচে আছে, একটা বিমানে তুলে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। আপনি যতক্ষণ আমাদের সহযোগিতা করবেন, ততক্ষণ আয়ু থাকবে ওদের।'

'সহযোগিতা?'

'এখনও শ্বাস ফেলছেন দেখে বুঝতে পারছেন না সেটা? কেউ একজন আপনাকে জীবিত দেখতে চায়।'

'কী চায় সে আমার কাছে?'

'আমার জানা নেই। আমরা খুবই নীচের লেভেলের লোক। স্রেফ একটা নির্দেশ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য।'

'কী নির্দেশ?'

'আমেরিকায় যেতে হবে আপনাকে। ম্যাসাচুসেট্সে... ওখানকার বিশেষ একটা শহরে। আমার ধারণা, শহরের নাম আপনি জানেন।'

'বস্টন?' বলল রানা। 'কেন?'

'ওই বিশেষ মানুষটি দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে। রিটজ্ কার্লটন হোটেলে উঠবেন... সোমনাথ চ্যাটার্জি নামে। ক্লিয়ার?'

'তারমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাওয়া হচ্ছে না আমার?'

'উঁহুঁ। একটু পরে গাড়ি থামাব আমরা, আপনি নেমে যাবেন।'

'ফরেন সেক্রেটারির খুনিকে ছেড়ে দিচ্ছ, ওপরঅলার কাছে কী জবাব দেবে?'

'ওসব নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দিন। গল্প সাজানোয় আমি একটা ছোটখাট প্রতিভা... মেটেরিয়াল এভিডেন্সও পয়দা করতে জানি। লোকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবে—কৌশল খাটিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন আপনি।'

'কিন্তু পুরো ব্রিটেনে আমার নামে হুলিয়া জারি হবে।

আমেরিকায় যাব কীভাবে?'

মুখ বাঁকাল স্মিথ। 'এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমাদের। তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক, একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে ফেলবেন। আমি শিয়োর! একটা কথা মনে রাখুন, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি বস্টনে না পৌঁছান, তা হলে মারভিন লংফেলো, কুয়াশা, আর ওই মেয়েটা... সবাই মারা যাবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। 'একটা প্রশ্ন করব? মি. লংফেলো আর নাইজেল উইটিংহ্যাম যে ওই রাস্তায় যাবেন, তা কীভাবে জেনেছ তোমরা?'

'নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবেন আপনি, মি. রানা, আসলে তা নন,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল স্মিথ। 'বিএসএস চিফ স্ক্র্যাম্বলড্ লাইনে ফোন করেন, তাতে কথা বোঝা যায় না, কিন্তু কোথায় ফোন করছেন না করছেন, তা ঠিকই ট্রেস করা যায়। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে কনৌট হোটেলে ফোন করেছিলেন তিনি, সম্ভবত মিটিঙের ব্যাপারটা কনফার্ম করতে। উইটিংহ্যাম নিজেই আমাদেরকে ওই মিটিঙের ব্যাপারে জানিয়েছেন। মারভিন লংফেলোর নাম শুনে আমরা বুঝতে পারি, আসলে ওঁর মাধ্যমে আপনিই দেখা করতে চাইছেন ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে। উপর থেকে তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিছুতেই তাঁকে আপনার হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। তাই মি. উইটিংহ্যামকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রুটের সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় আক্রমণ চালিয়েছি আমরা; ওখানে আপনাকেও পেয়ে যাব, তা ভাবিনি। তবে... ফরচুন ফেভারস্ দ্য ব্রেভ, এ-কথা কে না জানে!'

'শটগুলো কে নিয়েছে?' রানার গলা থম থম করছে।

'আজ্ঞে... আমি!' একগাল হাসি দিয়ে বলল স্মিথ। 'প্ল্যানটা চমৎকার না? গুলি চালালাম, তারপর আবার তড়িৎগতিতে রেসপণ্ড

করলাম অকুস্থলে... কে সন্দেহ করবে, বলুন?'

নির্জন একটা রাস্তায় এসে পড়েছে পুলিশ কার। গতি কমিয়ে রাস্তার পাশে, একটা গাছের তলায় থামল ড্রাইভার। বলল, 'এটাই ভাল জায়গা।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্মিথ। বড় একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে, ভিতরটা অন্ধকারে ছাওয়া। ওখান দিয়ে সহজেই কেটে পড়তে পারবে রানা। সন্তুষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ, পারফেক্ট।' রানার দিকে ফিরল। 'এবার আপনাকে যেতে হয়, মি. রানা। আর বোধহয় কোনোদিন দেখা হবে না আমাদের। বিদায়।'

চাবি নিয়ে একহাতে রানার হ্যাণ্ডকাফ খুলতে শুরু করল সৈ।

'একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'বললে তোমরা লোয়ার লেভেলের লোক। তারমানে গুরুত্বহীন, রাইট? তোমাদের বাঁচামরায় কিছু আসে-যায় না ফেনিসের, আমার বন্ধুদের উপর প্রভাব পড়বে না তার।'

ভুরু কোঁচকাল স্মিথ। 'এ-কথা কেন বলছেন?'

'এ-জন্য!' হ্যাণ্ডকাফ খুলে গেছে, সাপের মত ছোবল দিল রানার দু'হাত। বাঁ হাতে লোকটাকে চেপে ধরল সিটের উপর, ডান হাতে খামচে ধরল পিস্তল-ধরা হাতটার মুঠি। অস্ত্রটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল না, তার বদলে তর্জনী ঢুকিয়ে দিল ট্রিগার গার্ডের ভিতরে। পিস্তলটা ড্রাইভারের দিকে ঘোরাল, স্মিথের আঙুলের উপর দিয়েই চেপে দিল ট্রিগার।

গাড়ির বদ্ধ জায়গায় বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো, নেটের ফাঁক দিয়ে চলে গেল বুলেট, ড্রাইভারের মাথার খুলির পিছনটা উড়ে গেল। একরাশ রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে স্টিয়ারিঙের উপর এলিয়ে পড়ল তার শরীরের উর্ধ্বাংশ।

হতভম্ব হয়ে গেছে স্মিথ, হাত ঘুরিয়ে রানা পিস্তলটা তার

থুতনিতে ঠেকাতেই বাস্তবে ফিরে এল। দু'চোখের তারায় দেখা দিল আতঙ্ক।

'প্লিজ, মি. রানা!' ফ্যাসফেঁসে গলায় অনুনয় করল সে। 'আমি স্রেফ হুকুমের দাস...'

'আর আমি প্রতিহিংসার,' আবেগহীন গলায় বলল রানা। 'এটা মি. লংফেলোর জন্য।' ট্রিগার চেপে দিল ও।

চোয়ালের নীচ দিয়ে ঢুকল বুলেট, মগজ ভেদ করে... খুলির উপরের অংশ বিস্ফোরিত করে বেরুল। রানার মুখ-হাত ভিজে গেল তাজা রক্তে। স্মিথের নিথর মুঠি থেকে পিস্তলটা মুক্ত করে নিল ও। নিল নিজের সিগ-সাওয়ারটাও। ওটা লোকটার কোমরে গোঁজা ছিল। লাশের দিকে তাকাল না... তাকাল না আশপাশে কেউ আছে কি না, সেসব দেখার জন্যও।

গাড়ি থেকে নেমে পার্কের অন্ধকারে মিশে গেল রানা।

ষোলো

চারদিন আগে যে-ভাবে ফ্রান্স উপকূল ত্যাগ করেছিল রানা, ফিরল ওভাবেই—মোটরবোটে চড়ে। প্যারিসে পৌঁছুতে বেশ সময় লেগে গেল, ওর পুরনো কণ্ট্যাক্ট পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে। লণ্ডনের ঘটনায় ইন্টারপোলের মাধ্যমে পুরো ইয়োরোপে হুলিয়া জারি করা হয়েছে রানার নামে, এ-অবস্থায় ওর সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চাইছে না লোকটা।

কী আর করা, আল্লাহ-খোদার নাম করে ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা, রওনা হলো প্যারিসের পথে। একটানা গেল না; নিরাপত্তার খাতিরে পথে কয়েকবার বদলাল ট্যাক্সি, একইসঙ্গে বদলাল ছদ্মবেশ, শেষ পর্যন্ত সকাল ন'টা নাগাদ পৌঁছুল রাজধানীতে। ভুয়া পাসপোর্ট ছিল সঙ্গে, এয়ারপোর্টে গিয়ে এয়ার-কানাডার মন্ট্রিয়ল-গামী ফ্লাইটের টিকেট কিনে নিতে অসুবিধে হলো না। দুপুর একটায় টেকঅফ করল বিমান।

বিজনেস ক্লাসের আরামদায়ক সিটে বসেও ছটফট করতে লাগল রানা। সোনিয়া আর কুয়াশাকে টোপ বানিয়ে ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্য—একজনের প্রতি অনুভব করে ও দায়িত্ব, অন্যজনের প্রতি শ্রদ্ধা। জানা কথা, ওকে বাগে পাবার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ওদের, খুন করা হবে দু'জনকেই। বাস্তবতাকে মেনে নিতে হচ্ছে রানার—বুঝতে পারছে ওদেরকে বাঁচাবার আসলে কোনও উপায় নেই। আর এই উপলব্ধি মাথায় আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওর, সেই আগুনের আঁচে সবার আগে পুড়েছে স্মিথ আর তার সঙ্গী... এরপর আসবে শত্রুপক্ষের বাকিদের পালা। রানার মাথায় এখন শুধু প্রতিশোধের চিন্তা। ক'দিন আগের মাসুদ রানার সঙ্গে এখনকার মানুষটার আর মিল পাওয়া যাবে না। না, ফেনিসকে আর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় না, চায় ধ্বংস করতে... নিজের হাতে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মারভিন লংফেলোর মত পিতৃসম দু'জন মানুষ জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ফেনিসের কারণে; ওদের হাতে মারা গেছে অসংখ্য নিরীহ-অসহায় মানুষ... এখন আবার হত্যা করতে চলেছে সোনিয়া আর কুয়াশাকে! না, এই পিশাচদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা দেখাবে না ও। প্রতিশোধ নেবে... ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!

একটাই সূত্র আছে এখন রানার হাতে—ম্যাসাচুসেট্সের

সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড। সত্যিই কি তিনি জড়িত ফেনিসের সঙ্গে? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলছে, আগামী বছরের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে চলেছেন ম্যাহোনি। জন্মের পর থেকে সম্ভবত এই একটা লক্ষ্য নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে তাঁকে। ম্যাহোনি পরিবারের অগাধ ধন-সম্পদ, পারিবারিক প্রভাব আর ফেনিসের মদদকে মাথায় রাখলে এমন পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব বলে মনে হয় না। সিনেটরের বিষয়ে এরই মধ্যে ছোটখাট একটা গবেষণা করে ফেলেছে ও, যেসব তথ্য পেয়েছে, তাতে বিশ্বাস করা মুশকিল, এত বছর থেকে মানুষটা ধোঁকা দিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়াকে। অবস্থাদৃষ্টে যা-ই দেখাক না কেন।

খটকা যে নেই রানার মনে, তা নয়। উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ম্যাহোনি, মার্কিন ওঅর রেকর্ড বলে: সেখানে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সাহসিকতার জন্য পাঁচ-পাঁচটা পদক পেয়েছেন। বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যর্থ করে দিয়েছেন প্রতিপক্ষের হামলা, কয়েকবার উদ্ধার করেছেন আহত সহযোদ্ধাদেরকে। নিজেও জখম হয়েছেন বেশ কয়েকবার। মার্কিন সেনাবাহিনীতে এ-কারণে কিংবদন্তি-তুল্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসেও আরেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। ম্যাসাচুসেটস্ টার্নপাইকে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন ম্যাহোনি। একটা পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে তাঁর গাড়ির। মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। হাসপাতালে নেবার পর ডাক্তাররা ধরেই নিয়েছিলেন কোনও আশা নেই, পত্রিকাগুলো বের করেছিল বিশেষ সংখ্যা—ম্যাহোনির মত বীর আমেরিকানের আশু-মৃত্যুর কথা ভেবে। হাজার হাজার মানুষ

জড়ো হয়েছিল হাসপাতালের সামনে, সমবেতভাবে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল তাঁর সুস্থতার জন্য। সংবাদপত্রের ভাষায়... মানুষের এই ভালবাসাই নাকি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাঁকে।

এই ঘটনাগুলোই খটকার জন্ম দিয়েছে রানার মনে। ফেনিসের এমন গুরুত্বপূর্ণ একজন অ্যাসেট, যাকে ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদে বসানোর জন্য, সে কেন বার বার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেবে? এতবড় ঝুঁকি কেন নেবে সংগঠনটা? ম্যাহোনি মারা গেলে তো তাদেরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি! কিন্তু এ-ও ঠিক, দুঃসাহসিক ওসব কার্যকলাপের মাধ্যমেই পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন সিনেটর, জয় করেছেন জনসাধারণের ভালবাসা ও আস্থা। প্রাণ বিলিয়ে দেবার নিঃস্বার্থ মনোভাবই তাঁকে বিজয়ী করতে চলেছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তবে কি ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিয়েছিল ফেনিস? ম্যাহোনিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ফেলেছে মৃত্যুর মুখে?

প্যারিস এয়ারপোর্ট থেকে হেরাল্ড ট্রিবিউনের একটা কপি কিনেছে রানা। ওতে সংক্ষিপ্তভাবে জানানো হয়েছে নাইজেল উইটিংহ্যামের মৃত্যুসংবাদ। সন্ত্রাসী হামলার কথা আছে, তবে রানার নাম নেই। রহস্য ভেদ করবার আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সম্ভবত বিস্তারিত জানাতে চাইছে না মিডিয়াকে। তবে এ-খবর রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, করেছে ট্রান্সকম আর ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজ সম্পর্কিত একটা ফলো-আপ নিউজ। ওতে বস্টনের কোম্পানিটার বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের একটা আংশিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তৃতীয় নামটাই ম্যাসাচুসেট্সের সিনেটরের। ফেনিসের সঙ্গে তাঁর কানেকশনের ব্যাপারে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড শুধু ভিলা বারেমির অভ্যাগত একজন অতিথির বংশধর নন, ফেনিসের

সত্যিকার উত্তরসূরিও বটে।

স্পিকারে পাইলটের ঘোষণা শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। চ্যানেল আইল্যাণ্ড অতিক্রম করছে বিমান, ছ'ঘণ্টা পর অতিক্রম করবে নোভা স্কোশিয়া-র উপকূল; মন্ট্রিয়লে ল্যাণ্ড করবে তারও এক ঘণ্টা পরে। আন্দাজ করল রানা, এয়ারপোর্ট থেকে আরও চার ঘণ্টা লাগবে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে পৌঁছুতে। রিশেলিউ নদী হয়ে লেক চ্যাম্পলেইন দিয়ে আমেরিকায় ঢোকার প্ল্যান করেছে ও। অভিযানের চূড়ান্ত অংশের শুরুটা হবে তখনই। বাঁচবে কিংবা মরবে রানা, কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। উত্তেজনা অনুভব করল বুকের ভিতর।

বস্টন।

ওখানে কেউ দেখা করতে চায় ওর সঙ্গে।

কে? কেন?

কুয়াশার ধারণা, ওকে ফেনিসের দলে ভেড়াতে।

কিন্তু না, পিশাচদের সঙ্গে কোনোদিনই ও হাত মেলাবে না, এটা কি জানে না ওরা? যদি অকালমৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়, তা-ও রানা মাথা নোয়াবে না ওদের কাছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত, মরার আগে ফেনিসকে উপযুক্ত একটা শিক্ষা দিয়ে যাবে ও। বুঝিয়ে দেবে, ওকে কতখানি আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিল ওরা।

জোর করে চোখ মুদল রানা, একটু ঘুমিয়ে নেয়া প্রয়োজন। আগামী কয়েকটা দিন নির্ঘুম কাটবে ওর।

আটলান্টিকের দিক থেকে ছুটে আসছে দামাল হাওয়া, বৃষ্টির ছাঁটে বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে উইণ্ডশিল্ড, ওয়াইপার-দুটো তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুঝছে অবিরাম। কোস্টাল হাইওয়ে ধরে এরই মাঝ দিয়ে ছুটছে রানার গাড়ি। পোর্টল্যাণ্ড থেকে সাদামাটা চেহারার

একটা সুবারু সেডান ভাড়া করেছে ও, এগিয়ে চলেছে বস্টনের পথে। তবে ওখানে গিয়েই শত্রুপক্ষের সামনে নিজের উপস্থিতি জাহির করবে না, অপেক্ষা করবে না ফেনিসের পরবর্তী চালের জন্য। ওদের জালে পা দিলেই সব শেষ—সমাপ্তি ঘটবে আশা-ভরসার। তা হতে দেবে না রানা, নিজস্ব ছকে এগোবে বলে ঠিক করেছে। সোনিয়া-কুয়াশাকে নিয়ে এখুনি অস্থির হচ্ছে না; জানে, ওকে বাগে না পাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে শত্রুরা। দুই জিম্মিকে মেরে ফেললে রানার উপরে চাপ সৃষ্টির মত আর কোনও অস্ত্র থাকবে না তাদের হাতে।

হ্যাঁ, বস্টনে যাচ্ছে ও... কিন্তু প্রতিপক্ষকে তা জানিয়ে নয়। গোপনে মন্ট্রিয়লের রানা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবস্থা করে এসেছে—একদিনের ব্যবধানে রিটজ্ কার্লটন হোটেল দুটো টেলিগ্রাম পাবে। প্রথমটায় বলা হবে, আগামীকাল পৌঁছুবেন সোমনাথ চ্যাটার্জি, তার জন্য একটা স্যুইট যেন রিজার্ভ রাখা হয়। পরদিন বিকেলে আসবে দ্বিতীয় টেলিগ্রাম—তাতে জানানো হবে, ফ্লাইট নিয়ে গোলমাল হওয়ায় দু'দিন দেরি হবে মি. চ্যাটার্জির; ওই হিসেবে যেন রিজার্ভেশনের তারিখ পরিবর্তন করে নেয়া হয়।

এই দুটো টেলিগ্রাম ছাড়া রানার ব্যাপারে আর কিছুই জানতে পারবে না ফেনিস। আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হবে না রানার, আবার শত্রুকে একটু নিশ্চয়তাও দেয়া হবে—বস্টনে আসার নির্দেশটা ও পালন করতে চলেছে। সোনিয়া, কুয়াশা বা মারভিন লংফেলোর ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেবার বিষয় ইতস্তত করতে হবে ওদেরকে। ভুলে যেতে হবে আটচল্লিশ ঘণ্টার ডেডলাইন।

তিনদিন সময় রানার হাতে। এর মাঝে ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে যতকিছু সম্ভব জেনে নিতে হবে ওকে; খুঁজে বের করতে হবে এমন কোনও গলদ, যেটাকে অস্ত্র বানিয়ে

পৌঁছুনো যায় সিনেটর ম্যাহোনির কাছে। হাতে সময় কম, কিন্তু কাজ অনেক। বস্টনে রানা এজেন্সির শাখা আছে, কিন্তু ওখানে যাওয়া যাবে না। অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে ওকে। কার কাছে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

একটা রোড-সাইন পেরিয়ে এল রানা—মার্বেলহেড নামে একটা শহরের নাম লেখা আছে ওতে। তারমানে বস্টন আর ত্রিশ মিনিটের দূরত্ব। গন্তব্য এসে পড়েছে, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ও।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বস্টনে ঢুকল রানা। বিরূপ আবহাওয়া আর অফিস ছুটির সময় মিলিয়ে পুরো শহরে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। বয়েলস্টোন স্ট্রিটের ব্যস্ত শপিং ডিস্ট্রিক্টে যখন পৌঁছুল, চারপাশে শুনতে পেল শত শত গাড়ির অবিরাম হর্ন... কান ঝালাপালা হবার দশা। প্রুডেনশিয়ালের আণ্ডারগ্রাউণ্ড লটে ভাড়া করা গাড়িটা পার্ক করল ও। রওনা হলো রেস্টুরেন্টের খোঁজে। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু পেটে না দিলেই নয়। বৃষ্টিভেজা সাইডওঅক ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ল এক বৃদ্ধের নাম। কর্পোরেট ল-র উপর হার্ভার্ডের স্কুল অভ বিজনেসে পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করবার পর বছরদুই আগে রিটায়ার করেছেন ভদ্রলোক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনে না রানা, তবে আমেরিকার কর্পোরেট ব্যবসাজগতের বিষয়ে প্রফেসর অ্যান্থনি স্যাণ্ডার্স নামের এই বৃদ্ধের জ্ঞান বিশ্বকোষতুল্য। অতীতে রানা এজেন্সি বেশ কয়েকবার সাহায্য নিয়েছে তাঁর।

রেস্টুরেন্টে ঢুকেই পে-ফোন ব্যবহার করল রানা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিল প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের। তারপর দ্রুত খাওয়াদাওয়া সেরে একটা ট্যাক্সিতে চাপল, হাজির হয়ে গেল বৃদ্ধের ব্র্যাটল স্ট্রিটের বাড়িতে।

বেল চাপলে এক বৃদ্ধা দরজা খুললেন। মায়াময় চেহারা,

দু'চোখে কৌতূহল।

'মিসেস স্যাণ্ডার্স?'

'ইয়েস?'

'আধঘণ্টা আগে ফোন করেছিলাম আমি...'

'তুমি মাসুদ কায়সার?'

'জী। একটা রিসার্চের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আপনার স্বামীর সঙ্গে...'

'এসো, এসো, ভিতরে এসো!' তাড়াতাড়ি বললেন বৃদ্ধা। 'বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে। কী যে শুরু হলো দু'দিন ধরে... বন্যা দেখা দেয় কি না, ঈশ্বর জানেন!' প্রায় জোর করেই রানার কাছ থেকে কোট আর টুপি নিলেন তিনি। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি এলিজাবেথ স্যাণ্ডার্স।' হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

'নাইস টু মিট ইউ, মিসেস স্যাণ্ডার্স,' পাল্টা হাসি দিয়ে হাত মেলাল রানা। 'প্রফেসর স্যাণ্ডার্স আছেন?'

'যাবে কোথায়? এখন ওর ইভনিং ড্রিঙ্কের সময় না? তুমি এসেছ ভাল হয়েছে। এখন একজন পার্টনার পাবে। এসো।'

বৃদ্ধার পিছু পিছু বিশাল এক লিভিংরুমে ঢুকল ওরা। ঘরের চারদিকের দেয়ালজুড়ে তৈরি করা হয়েছে শো'কেস আর শেলফ। তাতে শোভা পাচ্ছে নানা রকম রেলিক আর বই, সংখ্যায় অগণিত। দুটো জিনিসেরই সংগ্রহের বাতিক আছে সম্ভবত এই ঘরের মালিকের। ঘরের একপ্রান্তে গদিমোড়া একটা বড় সোফায় বসে আছেন ভদ্রলোক, পা তুলে রেখেছেন সামনে রাখা টিপয়ের উপর, কোলের উপরে কম্বল বিছানো, তার উপর একটা বই, হাতে ধরে রেখেছেন ড্রিঙ্কের গ্লাস। মগ্ন হয়ে আছেন তিনি।

'অ্যান্থনি, তোমার গেস্ট এসেছে,' ঘোষণা করলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স।

চোখ তুললেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স।

'মাসুদ কায়সার, স্যর,' নাম বলল রানা। পকেটে কয়েকটা ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে সবসময় ঘোরে ও, সেখান থেকে নয়া দিল্লির একটা পত্রিকার আই.ডি কার্ড বাড়িয়ে ধরল। 'ভারত থেকে এসেছি, সাংবাদিক। আমেরিকার কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের উপর একটা প্রবন্ধ লিখছি। ফোনে বলেছিলাম আপনাকে।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... মনে আছে,' হাসলেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স। 'বোসো। *তুমি* করে বলছি, কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'না, না। আপনি বয়সে ও জ্ঞানে আমার অনেক বড়।' বৃদ্ধের মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল রানা।

'কী খাবে?'

'কিছু না। ধন্যবাদ।'

'একটু উইস্কি নাও। ভিজে-টিজে এসেছ, উইস্কি খেলে গা গরম হবে।'

'বেশ,আপনি বলছেন যখন...' মাথা ঝোঁকাল রানা।

'আমি দিচ্ছি।' বলে গ্লাস আনতে চলে গেলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। ফিরে এলেন একটু পরে, উইস্কি পরিবেশন করলেন।

'হ্যাঁ, বলো কী করতে পারি তোমার জন্য।' বললেন স্যাণ্ডার্স।

নোটবুক আর কলম বের করল রানা। 'বস্টন সম্পর্কে এ-মুহূর্তে গবেষণা করছি আমি। যদ্দূর জেনেছি, এখানকার সবচেয়ে বড় কর্পোরেট এনটিটি হলো ট্রান্স-কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল। ওদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাকে?'

'পারব না কেন?' কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'কে না চেনে *অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইড অভ বস্টন*-কে? কংগ্রেস স্ট্রিটের রানি বলি আমরা ওটাকে।'

'অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইড?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'কংগ্রেস স্ট্রিটের ট্রান্সকম্ টাওয়ার,' পাশ থেকে ব্যাখ্যা করলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। 'সাদা পাথরের বিশাল এক বিল্ডিং—চল্লিশ তলা উঁচু। প্রতিটা ফ্লোরে সারি সারি গোল জানালা। এমন বিল্ডিং আর একটাও নেই গোটা শহরে।'

'দূর থেকে মনে হয়, শত শত চোখ নজর রাখছে বস্টনের উপর,' যোগ করলেন প্রফেসর স্যাণ্ডার্স। 'সূর্যের আলোর কারসাজিতে কোনও চোখকে মনে হয় খোলা, কোনোটা বন্ধ... আবার কোনও কোনোটা যেন চোখ টিপছে!'

'অদ্ভুত তো!' মন্তব্য করল রানা। বৃত্তাকার জানালা... *পার নস্ত্রো সার্কোলো...* আমাদের চক্রের জন্য! কাকতালীয়, নাকি সত্যিই কোনও মেসেজ দেয়া হচ্ছে?

'অদ্ভুত... একই সঙ্গে মনে প্রভাব ফেলবার মত!' বললেন স্যাণ্ডার্স। 'একটু বিসদৃশ ঠেকে চোখে, তবে ইচ্ছে করেই সম্ভবত করা হয়েছে সেটা। এক ধরনের শুদ্ধতার প্রতীক... ফিনানশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের অন্ধকার কংক্রিট জঙ্গলের মাঝে আলোর একটা স্তম্ভের মত অবয়ব ওটার।'

'ইন্টারেস্টিং!' বৃদ্ধের কথায় উপমা খুঁজে পেল রানা—সাদা দালানটা আলো, আর জঙ্গলটা হচ্ছে বিশৃঙ্খল পৃথিবী।

'যথেষ্ট হয়েছে অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইডের কথা,' বললেন স্যাণ্ডার্স। ট্রান্সকম সম্পর্কে কী জানতে চাও?'

'আপনি যা জানেন, সব।' রানা জবাব দিল।

একটু অবাক হলেন স্যাণ্ডার্স। 'সব? খুব বেশি কিছু তো বলতে পারব না। আসলে... ওরা একটা ক্লাসিক মাল্টিন্যাশনাল কংগ্লোম্যারেট। ডাইভার্সিকেশনের দিক থেকে তুলনাহীন, ম্যানেজমেণ্টও ব্রিলিয়ান্ট।'

'পেপারে পড়েছি, ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজে ওদের হোল্ডিঙের

পরিমাণ জেনে বিস্মিত হয়েছে লোকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'অনেকেই অবাক হয়েছে, তবে আমি হইনি। ভরগেনের মালিকানার একটা বড় অংশ যে ট্রান্সকমের দখলে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন আরও চার-পাঁচটা দেশের কথা বলতে পারি, যেখানে একই ধরনের হোল্ডিংস রয়েছে ওদের।' উইস্কিতে চুমুক দেয়ার জন্য একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'আসলে... যে-কোনও কংগ্লোম্যারেটের ফিলোসফিই হলো যতটা সম্ভব সম্পদ আর মার্কেট বাড়ানো। ইকোনমিক্সের মালথুসিয়ান ল-কে প্রয়োজনে ব্যবহার, কিংবা অবজ্ঞা করে ওরা। নিজস্ব র‍্যাঙ্কের ভিতরে সৃষ্টি করে আগ্রাসী প্রতিযোগিতা, আবার ছেঁটে ফেলে বাইরের প্রতিযোগীদেরকে। এ-থিয়োরির বাস্তব প্রয়োগের কারণে ট্রান্সকম এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর একটা।'

বৃদ্ধ প্রফেসরের মুখভঙ্গি যাচাই করল রানা। আগ্রহোদ্দীপক বিষয় পেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। ও বলল, 'বুঝলাম আপনার কথা। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো না—আরও চার-পাঁচটা দেশের নাম বলতে পারবেন বলছেন। কীভাবে সম্ভব সেটা?'

'যে-কেউই পারবে। একটু শুধু পড়াশোনা করতে হবে, সঙ্গে দরকার হবে কল্পনাশক্তি।' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন স্যাণ্ডার্স। 'আইন, কায়সার, আইন! হোস্ট কান্ট্রির আইন। ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি!'

'আইন?'

'ওটাই একমাত্র জিনিস, যেটাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যে-দেশেই ব্যবসা করতে চাও তুমি, সে-দেশের আইনকে মানতেই হবে। হ্যাঁ... আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করবে তুমি, বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নেবে... তারপরও একেবারে এড়িয়ে যেতে

পারবে না। কিন্তু কীভাবে ডিল করবে আইন-আদালতের সঙ্গে? সরাসরি তো আর রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না নিজেকে, লইয়ার আর ল-ফার্মের সহায়তা নিতেই হবে তোমাকে... এবং সেটা হতে হবে স্থানীয়। কারণ, বস্টনের একজন অ্যাটর্নি হংকং বা এসেনে কাজে আসবে না তোমার।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?' দ্বিধান্বিত গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'বিভিন্ন দেশের ল-ফার্ম নিয়ে স্টাডি করতে হবে তোমাকে,' সামনে ঝুঁকলেন স্যাণ্ডার্স। 'যে-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ, তারা বিদেশি কোনও ল-ফার্মকে টাকা দিচ্ছে কি না, সেটা বের করো। তারপর মিলিয়ে দেখো, ওই ফার্মের ক্লায়েন্টদের মধ্যে কার কর্মকাণ্ড আমাদের ওই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা করছে। ব্যস, তা হলেই পেয়ে গেলে, গোপনে কোন্ কোন্ জায়গায় পুঁজি খাটাচ্ছে ওরা।' বক্তৃতা দিতে মজা পাচ্ছেন বৃদ্ধ আইনবিদ, হাসি হাসি হয়ে উঠল মুখ। 'খুব মজার একটা খেলা বলতে পারো এটা, বিভিন্ন সেমিনারে বহু কর্পোরেট প্রতিনিধিকে চমকে দিয়েছি ওদের গোমর বলে দিয়ে। ওসবের একটা ইনডেক্সও রেখেছি আমি।'

'ট্রান্সকমের ব্যাপারে কখনও গবেষণা করেছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই! সেজন্যেই তো চার-পাঁচটা দেশের কথা বললাম।'

'কোথায় কোথায় রয়েছে ওদের ইনভেস্টমেন্ট, আমাকে বলতে পারেন?'

চোখ বন্ধ করে স্মরণ করার প্রয়াস চালালেন স্যাণ্ডার্স। 'দাঁড়াও, ভেবে দেখি। হুমম... ভরগেন ইণ্ডাস্ট্রিজের ব্যাপারটা তো জেনেছ। ট্রান্সকমের ওভারসিজ রিপোর্টে এসেনের মাইনহফ-স্যালেঙ্গার ফার্মে বড় অঙ্কের পেমেন্টের রেকর্ড আছে। ভরগেনের সঙ্গে রয়েছে

মাইনহফের সরাসরি লিগাল কানেকশন। ফার্মটা ছোটখাট ক্লায়েন্ট বা ট্রানজ্যাকশনে আগ্রহী নয়। এ-কারণে বহু আগেই ভরগেনে ট্রান্সকমের শেয়ারের ব্যাপারে নিশ্চিত হই আমি।'

'আর?'

'আর... কিয়োটা, জাপান। ওখানকার আকিওয়া না কী যেন নামের একটা ফার্মকে ব্যবহার করে ওরা। তার মানে দাঁড়ায়... ইয়াকাশুবি ইলেকট্রনিক্স।'

'ইয়োরোপে?'

'ভরগেন তো আছেই... এরপর আসে আমস্টারড্যাম। ওখানকার ল-ফার্ম হলো হাইনট অ্যাণ্ড সান্স। তাই আমার ধারণা, নেদারল্যাণ্ড টেক্সটাইলসে বড় ধরনের মালিকানা আছে ট্রান্সকমের; ওটা আবার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে লিসবান পর্যন্ত বিরাট এক অঞ্চলজুড়ে ব্যবসা করছে।'

'আর আছে?'

'হ্যাঁ। তারপরেরটা সম্ভবত ফ্রান্সের লিঅঁ-তে...' বলতে বলতে থেমে গেলেন স্যাণ্ডার্স। মাথা নাড়লেন। 'না, বোধহয় ভুল করছি। লিঅঁ-র চাইতে ইটালির তুরিন হবার সম্ভাবনা বেশি।'

'তুরিনের কোন্ কোম্পানি?'

'ফার্মটার নাম প্যালাদিনো ল্য তোনা... ওরা পুরো ইটালিতে একটামাত্র কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে—বিয়াঞ্চি-পাভোরোনি।'

'ওরে বাবা!' নিখাদ বিস্ময় প্রকাশ পেল রানার গলায়। 'এ তো রীতিমত বিশাল এক কার্টেল!'

'তা তো বটেই,' একমত হলেন বৃদ্ধ আইনবিদ। 'এককভাবেই বিয়াঞ্চি-পাভোরোনির অর্থনৈতিক ক্ষমতা কম নয়; তার সঙ্গে যদি ভরগেন, নেদারল্যাণ্ড টেক্সটাইলস্ আর ইয়াকাশুবি-সহ ইংল্যাণ্ড, স্পেন আর সাউথ আফ্রিকার আরও ক'টা জায়ান্ট যুক্ত হয়...

ওগুলোর কথা বলিনি আমি তোমাকে... তা হলে নিঃসন্দেহে ট্রান্সকম একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সুপারপাওয়ারে পরিণত হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।'

'ঠিকই ধরেছ,' স্বীকার করলেন স্যাণ্ডার্স। 'ইকোনোমিক পাওয়ারের এমন সেন্ট্রালাইযেশন ভাল নয়। মালথুসিয়ান ল-র বিপরীত, প্রতিযোগিতা বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তবে এ-ধরনের সাফল্যের পিছনে যে-প্রতিভা আছে, তার কদর করি আমি। বলতে গেলে অসম্ভব একটা লক্ষ্য অর্জন করেছে সে। জিয়োভান্নি গুইদেরোনি-র কথা বলছি... ট্রান্সকমের প্রতিষ্ঠাতা।'

'নাম শুনেছি ভদ্রলোকের,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'আধুনিক যুগের রকফেলার বলা হয় তাঁকে, তাই না?'

'কমই সেটা। নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন গুইদেরোনি, সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিলুপ্তপ্রায় বিজনেস জায়ান্টদের শেষ সদস্য... ব্যবসাজগৎ ও অর্থনীতির অলিখিত সম্রাট। পশ্চিমের বেশিরভাগ সরকার-ই সম্মান করে তাঁকে, এমনকী ইস্টার্ন ব্লকেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়... বিশেষ করে রাশায়।'

'রাশা!'

'হ্যাঁ।' স্ত্রী-র দিকে তাকিয়ে আবার উইস্কি পরিবেশনের ইশারা দিলেন স্যাণ্ডার্স। 'পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের হিসাব করলে গুইদেরোনির ধারেকাছে পাওয়া যাবে না কাউকে। অবশ্য একই কথা পুরো দুনিয়াব্যাপী ব্যবসার বেলাতেও খাটে। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন, বয়স পঁচাশি-র উপরে... কিন্তু শুনেছি, বহু বছর আগে বস্টন ল্যাটিনে বড় হবার সময় যে-তেজ ছিল তাঁর, তা আজও কমেনি একবিন্দু।'

'উনি বস্টনের মানুষ? নাম শুনে তো মনে হয় না।'

'ঠিকই আন্দাজ করেছ। বস্টনে বড় হলেও গুইদেরোনি আসলে ইয়োরোপিয়ান। সে-ও এক ইন্টারেস্টিং কাহিনি। জাহাজে চড়ে অশিক্ষিত বাপের সঙ্গে দশ-এগারো বছর বয়সে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে আমেরিকায় আসেন তিনি। সেখান থেকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছেন... দ্য গ্রেট অ্যামেরিকান ড্রিমের সফল উদাহরণ বোধহয় একেই বলে!'

নিজের অজান্তেই সোফার হাতল খামচে ধরল রানা। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস আটকে আসছে। 'কোত্থেকে এসেছিল ওই জাহাজ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ও।

'ইটালি,' উইস্কিতে চুমুক দিলেন স্যাণ্ডার্স। 'দেশের দক্ষিণাংশ সম্ভবত। বোধহয় সিসিলি বা আর কোনও দ্বীপ থেকে।'

পরের প্রশ্নটা করতে রীতিমত নার্ভাস বোধ করছে রানা। 'আপনার কি জানা আছে, জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে ম্যাহোনি পরিবারের কারও পরিচয় ছিল কি না?'

মদের গ্লাসের উপর দিয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ আইনবিদ। 'অবশ্যই জানি। আমি কেন, ম্যাসাচুসেটসের সবাই জানে—ম্যাহোনি পরিবারে কাজ করত জিয়োভান্নির বাবা... আমাদের সিনেটরের দাদার আমলে, ম্যাহোনি হলে। বুড়ো ম্যাহোনি-ই প্রথম জিয়োভান্নির মধ্যে প্রতিভার ঝলক দেখতে পান, তাই ওকে ভর্তি করে দেন স্কুলে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। সে-আমলের বিচারে যথেষ্ট উদার একটা কাজ। কারণ গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইমিগ্র্যান্টদের কুকুর-বেড়ালের মত ট্রিট করত আমেরিকার লোকজন; তাদের কাউকে স্কুল-কলেজে পড়তে দেবার মত মহত্ত্ব ছিল না ওদের। বুড়ো ম্যাহোনিকে নিঃসন্দেহে এর জন্য অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ডেভিড ম্যাহোনি দ্য ফার্স্টের কথা বলছেন?'

ফিসফিসিয়ে বলল রানা। এই লোকই কাউন্ট বারেমির ভিলায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিল।

'হ্যাঁ।'

'এতকিছু করেছেন তিনি একটা অচেনা ছেলের জন্য?'

'অসাধারণ, তাই না? অথচ সে-সময়ে ঝুটঝামেলার অন্ত ছিল না ম্যাহোনি পরিবারে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সর্বস্ব হারাতে বসেছিল, মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল ওদের। এর-ই মাঝে জিয়োভান্নির জন্য উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল বুড়ো ম্যাহোনি। যেন দেয়ালের লিখন পড়তে পারছিল সে।'

'মানে?'

'এক হাতে ম্যাহোনি পরিবারের দুর্দশার ইতি ঘটিয়েছেন জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। শুধু তাই নয়, ওদের ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছেন কয়েকশ' গুণ। মরার আগে নিজের কোম্পানিকে সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখেছে বুড়ো ম্যাহোনি... দেখেছে টাকার বন্যা বইতে। সবই ঘটেছে সামান্য এক চাকরের ছেলেকে দয়া দেখানোর ফলে... যেন জেনেশুনেই ওকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে নেমেছিল লোকটা। বললাম না, খুবই ইন্টারেস্টিং কাহিনি!'

একটু ভাবল রানা। বলল, 'যদি ভুল না করে থাকি, গুইদেরোনি শব্দটা এসেছে ইটালিয়ান *গুইদা* থেকে.. মানে, গাইড।'

'অথবা রাখাল,' বলে উঠলেন স্যাণ্ডার্স

ঝট্ করে তাঁর দিকে তাকাল রানা। 'কী বললেন?'

'আমি না, গুইদেরোনি-ই বলেছেন কথাটা... সাত-আট মাস আগে, জাতিসংঘে।'

'জাতিসংঘ?'

'হুঁ। সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ দেয়া হয় তাঁকে, সে-আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণও করেছিলেন। শোনোনি ওই ভাষণ? সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হয়েছে ওটা—রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট... সবখানে'

'দুঃখিত, শোনার সৌভাগ্য হয়নি। কী বলেছিলেন উনি?'

'তুমি একটু আগে যা বললে, সে-কথাগুলোই। বিনীত স্বরে জানিয়েছিলেন, তাঁর নামের উৎস লুকিয়ে আছে *গুইদা* বা গাইড শব্দের ভিতরে। সে-দৃষ্টিতেই নিজেকে দেখেন তিনি—সামান্য এক রাখাল হিসেবে, অন্যকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যার কর্তব্য। দুনিয়াজোড়া ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন—অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের উপকারে কাজ করবার জন্য। খুবই হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ছিল ওটা, জাতিসংঘ থেকে তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইকোনোমিক কাউন্সিলের মেম্বার হবার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখনও অবশ্য সাড়া দেননি গুইদেরোনি।'

'আপনি নিজ কানে শুনেছেন ওই ভাষণ।'

'অবশ্যই! বস্টনবাসীদের জন্য তো প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল ওটা। যতক্ষণ ভাষণ দিয়েছেন ভদ্রলোক, ততক্ষণ টিভি-রেডিওতে আর কোনও অনুষ্ঠান প্রচার হয়নি।'

'ওঁর গলাটা কেমন ছিল?'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাণ্ডার্স। 'ব্যাখ্যা করা মুশকিল। বুড়ো হয়ে গেছেন গুইদেরোনি—কথা বলেন তেজোদীপ্ত কণ্ঠে, কিন্তু বয়সের ছাপ ঠিকই পড়েছে তাতে।' স্ত্রী-র দিকে তাকালেন। 'তোমার কী মনে হয়?'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন মিসেস স্যাণ্ডার্স। 'তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছি, বয়সের তুলনায় অনেক পরিষ্কার মি.

গুইদেরোনির গলা—কথা একদম জড়ায় না। এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেলেন, শোনার সময় মনে হয় যেন শোঁ শোঁ বাতাস বইছে কানের পাশে। বড়ই অদ্ভুত এক অনুভূতি ওটা।'

পোর্তো ভেচিয়োর খামারবাড়িতে শোনা মারিয়া মাযোলার কথাগুলো মনে পড়ল রানার। রেডিওতে পঁচাত্তর বছরের পুরনো একটা কণ্ঠ শুনেছিলেন তিনি... যে-কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর!

আর কোনও সন্দেহ নেইঃ রাখাল বালকের খোঁজ পেয়ে গেছে ও।

সতেরো

প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এল রানা। বেরুনোর আগে ম্যাহোনি পরিবার সম্পর্কে আরও দু-চারটে প্রশ্ন করেছে, তারপর উঠে পড়েছে ধন্যবাদ জানিয়ে। ওর এই অকস্মাৎ প্রস্থানে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো অবাক হলেন, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। যা জানা দরকার, তা জেনে গেছে... এরপর আর ওখানে সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।

সাইডওঅক ধরে দ্রুত হাঁটতে থাকল ও—উত্তেজিত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়। বৃষ্টির ছাঁটে গা ভিজে যাচ্ছে, পরোয়া করছে না। পেয়েছে... অবশেষে ফেনিসের মূল ব্যক্তিটির খোঁজ পেয়েছে ও! এখন শুধু ভেবে বের করতে হবে,

কীভাবে তাকে ঘায়েল করা যায়।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনিকে আতঙ্কগ্রস্ত করবার মত অস্ত্র পেয়ে গেছে রানা। কিচ্ছু না, শুধু ওয়াশিংটনে ভদ্রলোকের কাছে একটা ফোন করতে হবে ওকে—বর্ণনা করতে হবে পঁচাত্তর বছর আগেকার একটা মিটিঙের বিবরণ। উনিশশো ছত্রিশের চৌঠা এপ্রিলের সেই মিটিং, বারেমি ভিলায় যেটাতে অংশ নিয়েছিল তার পিতামহ। কী বলবে তখন সিনেটর। অস্বীকার করতে পারবে, এত বছর ধরে একটা গুপ্তসংঘের সঙ্গে নিজের পরিবারের সংশ্লিষ্টতার কথা? এ তো বোঝাই যাচ্ছে, রাখাল বালকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছে সে—কারণ লোকটাকে ওরাই আজকের অবস্থানে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

খানিক ভেবেচিন্তে সরাসরি এগোনোর চিন্তা বাতিল করে দিল রানা। এখন পর্যন্ত এ-কৌশলে কোনও কাজ হয়নি। তা ছাড়া ডেভিড ম্যাহোনি ফেনিসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে সে, তাকে রক্ষার জন্য হাজারটা পন্থা অবলম্বন করবে ওরা। রানার হাতে কোনও প্রমাণ নেই তার বিরুদ্ধে। জনসমক্ষে তার মুখোশ খুলতে চাইলে নিরেট তথ্য-প্রমাণ চাই।

তারমানে আরও গভীরে যেতে হবে ওকে।

বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, তা ডেভিড ম্যাহোনির আসল চরিত্র নয়। সময় নিয়ে... অত্যন্ত সুকৌশলে তাকে জনগণের সামনে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের ওসব বীরত্ব কি তা হলে শুধুই কাহিনি? হাসপাতালের সামনে শত শত মানুষ জড়ো করা হয়েছিল কি টাকার বিনিময়ে? একেবারে অবাস্তব নয় চিন্তাটা। কাউকে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য এ-ধরনের নাটক অতীতে বহুবার করা হয়েছে। দক্ষ পরিচালকের হাতে সেই নাটক চরম

সাফল্য অর্জন করতে পারে।

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আসলে বীর নয় ম্যাহোনি, স্রেফ একটা পুতুল। তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের পদে বসিয়ে নিজেদের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি ও তার গুপ্তসংঘ। তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে চাইলে ম্যাহোনির নাগাল পেতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

চলে আসবার আগে প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের কাছ থেকে সিনেটরের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে এসেছে রানা। কনকর্ডে তাঁর সরকারি আবাস, কিন্তু সেখানে শুধু গ্রীষ্মের সময়টা কাটান তিনি ও তাঁর পরিবার। পিতা ডেভিড ম্যাহোনি জুনিয়র মারা গেছেন বেশ ক'বছর আগে। এরপর তাঁর বিধবা মায়ের কাছ থেকে চড়া দামে ম্যাহোনি হল্ কিনে নিয়েছেন জিয়োভান্নি গুইদেরোনি; ম্যাহোনি পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে কথা দিয়েছেন, ভবনের নাম বদলানো হবে না। বৃদ্ধা মিসেস ম্যাহোনি এখন বিকন হিলে থাকেন—লুইসবার্গ স্কয়্যারের পুরনো একটা ব্রাউনস্টোন বিল্ডিং ওটা। বয়স সত্তরের উপরে, নিভৃতচারী।

কিছু কি জানা যাবে ওই বৃদ্ধার কাছ থেকে? পরিবারের মহিলারা সাধারণত গোপন তথ্যের বিশাল উৎস... এমন সব ব্যাপার জানা থাকে তাঁদের, যা ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়রাও বলতে পারে না। কথা বলা যায় না মিসেস ম্যাহোনির সঙ্গে? বাড়িটায় পাহারা থাকতে পারে, তবে রানা নিশ্চিত—সে-পাহারা খুব কড়া হবে না। নানা দিক চিন্তা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। রিটজ্ কার্লটনে ওঠার আগে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির ব্যাপারে সবকিছু জেনে নিতে হবে ওকে।

চেস্টনাট স্ট্রিট থেকে লুইসবার্গ স্কয়্যারে যাবার ঢালু রাস্তাটা

একেবারে নির্জন। মনে হয় যেন কোলাহলমুখর দুনিয়া থেকে আলাদা কোনও জগতে যাবার পথ ওটা। উজ্জ্বল নিয়ন-আলোর স্থান নেই ওখানে, তার বদলে মিটমিট করে জ্বলছে পুরনো আমলের গ্যাসবাতি। কবলস্টোনে গড়া রাস্তা আর চত্বর একেবারে ধুলোবালি-হীন। স্কয়্যারে পৌঁছুনোর পর ছায়ার আড়ালে চলে গেল রানা। একটা বিনকিউলার কিনে এনেছে, ওটা চোখে লাগিয়ে তাকাল রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়ির সারির দিকে। নজরদারির জন্য ওসব গাড়ি আদর্শ, ভিতরে বসে অনায়াসেই কয়েক ঘণ্টা চোখ রাখা যায় লক্ষ্যবস্তুর দিকে।

কিন্তু না, কেউ নেই কোনও গাড়িতে।

বিনকিউলার কোটের ভিতরে লুকিয়ে ফেলল রানা, হাঁটতে শুরু করল ব্রাউনস্টোনে গড়া মিসেস মাহোনির বাড়ির দিকে। আশপাশের ইমারতগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম ওটা—নির্মাণশৈলী রাজকীয় ধাঁচের। চারপাশে রয়েছে খোলা জায়গা আর ফুলের বাগান। রাত নামায় তাপমাত্রা কমে গেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে বার বার কেঁপে উঠছে বাড়ির বাইরে লাগানো গ্যাসবাতির শিখা।

নুড়িপাথরের ওয়াকওয়ে ধরে লন পেরুল রানা, সিঁড়ি ধরে উঠে এল ফ্রন্ট পোর্চে। দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল বাজাল। বাড়ির ভিতরে শোনা গেল জলতরঙ্গের আবছা আওয়াজ, একটু পর ওপাশে প্রকট হয়ে উঠল পদশব্দ। একটু অস্বস্তি বোধ করল রানা, পোর্চটা বড্ড আলোকিত। ছায়া থাকলে ভাল হতো, ওর চেহারা দেখা যেত না। আশঙ্কাটা যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেণ্ড পরেই।

ছিটকিনি নামানোর শব্দ পেল রানা, তারপর খুলে গেল দরজা। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে উদয় হয়েছে চৌকাঠের ওপাশে, পরনে নার্সের ইউনিফর্ম। ওকে দেখেই চমকে উঠল চকিতের জন্য,

পরমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু যা বোঝার বুঝে গেছে রানা—ওকে চিনে ফেলেছে মেয়েটা।

'ইয়েস?' গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে প্রশ্ন করল নার্স।

'মিসেস ম্যাহোনি আছেন?'

'দুঃখিত, শুয়ে পড়েছেন উনি।'

দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল নার্স, কিন্তু পারল না। রানা এক পা ঢুকিয়ে দিয়েছে চৌকাঠের মাঝখানে কাঁধ দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল পাল্লায়, মেয়েটা পিছন দিকে ছিটকে যেতেই ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে।

'তুমি ধরা পড়ে গেছ, ডিয়ার!' বলল রানা।

হিংস্রতা ফুটল নার্সের সাদাসিধে চেহারায়, দ্রুত হাত ঢোকাতে চেষ্টা করল ইউনিফর্মের পকেটে, কিন্তু রানা বাধা দেয়ায় ব্যর্থ হলো। খপ্ করে একহাতে মেয়েটার কবজি চেপে ধরল ও, আরেক হাতে ধরল গলা। এক ঝটকায় তাকে মেঝে থেকে শূন্যে তুলল, তারপর আছড়ে ফেলল মেঝেতে।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল নার্স, তবে সেই চিৎকার হলো ক্ষণস্থায়ী। গায়ের উপর চড়ে বসেছে রানা, গলায় চাপ বাড়তেই চোখ উল্টে ফেলল, বাতাসের অভাবে ছটফট করতে লাগল রানার দেহের তলায়। নিষ্ঠুরের মত গলাটা ধরে রাখল রানা, চাইলে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারবে, তবে অতদূর যাবার ইচ্ছে নেই ওর। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেলে হাত সরাল, দেখে নিল পালস্, তারপর সরে এল দেহের উপর থেকে।

সতর্ক দৃষ্টিতে আশপাশে তাকাল রানা, বাড়িতে আরও লোক থাকতে পারে। মেয়েটার চিৎকারে ছুটে আসে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। তবে কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে যাবার পরও কিছু ঘটল না। না শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ, না শোনা গেল পায়ের

আওয়াজ। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও, মনোযোগ দিল নার্সের দিকে। শরীরতল্লাশি করে পকেটের ভিতর থেকে একটা রিভলভার বেরুল। ওটাই বের করে আনার চেষ্টা করছিল সে।

মিসেস ম্যাহোনির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো বাড়িতে থম থম করছে নিস্তব্ধতা। নার্সের কথাই কি তবে ঠিক? সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি? খোঁজ নেবে রানা, তবে তার আগে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া প্রয়োজন।

মেয়েটার ইউনিফর্মের বোতাম খুলে ফেলল ও, অনাবৃত করল উর্ধ্বাঙ্গ। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে দেখল বুকটা। দুই স্তনের মাঝখানে, ব্রেসিয়ারের ঠিক নীচে জ্বলজ্বল করছে একটা বৃত্তাকার উল্কি—ফেনিসের চিহ্ন।

হঠাৎ... উপর থেকে একটা মোটরের গুঞ্জন ভেসে এল। লাফ দিয়ে অজ্ঞান নার্সের কাছ থেকে সরে গেল রানা, সিঁড়ির ছায়ায় লুকিয়ে পিস্তল তাক করল ওদিকে। একটু পরেই মাঝখানের ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে উদয় হলেন এক বৃদ্ধা। সাদা রঙের চেয়ার-লিফটে বসে আছেন, দেয়ালের সঙ্গে বসানো গার্ড-রেইল বেয়ে নেমে আসছে ওটা। পরনে উঁচু কলারঅলা গাউন। বলিরেখায় জর্জরিত মুখ। যখন কথা বললেন, শোনা গেল খনখনে গলা।

'যদি ডাকাতি করতে এসে থাকো, বলার কিছু নেই। তবে উদ্দেশ্য যদি সেক্সুয়াল হয়ে থাকে, তা হলে তোমার বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, ইয়াং ম্যান।'

মাতাল হয়ে আছেন মিসেস ম্যাহোনি। হাবভাবে মনে হলো, বহু বছর থেকেই এমন মাতাল তিনি।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা। বলল, 'আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—আপনার সঙ্গে দেখা করা, ম্যা'ম। এই মেয়েটা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, তাই আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।

ওর শরীরে লুকানো অস্ত্র আছে কি না, তা-ই চেক করে দেখছিলাম। আসলে আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, চাইলে আমার আই.ডি. দেখাতে পারি আপনাকে।'

হাত নাড়লেন মিসেস ম্যাহোনি। 'দরকার নেই। তুমি কে, তাতে কিছু আসে-যায় না।' চেয়ার-লিফট পৌঁছে গেছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। নেমে পড়লেন। দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'কাজ শেষ করো, লিভিংরুমে পাবে আমাকে।'

নার্সের ইউনিফর্মের বোতাম লাগিয়ে দিল রানা. তারপর অজ্ঞান দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে গেল সিঁড়ির তলার স্টোররুমে। ভিতরে ঢুকে মেয়েটার হাত-পা বাঁধল স্টোররুমে পাওয়া দড়ি দিয়ে। মুখে গুঁজে দিল রুমাল। ওকে ওখানেই ফেলে রেখে বেরিয়ে আটকে দিল দরজা। তারপর পা বাড়াল মিসেস ম্যাহোনির সঙ্গে দেখা করতে।

লিভিংরুমের ভিতরটা যেন মদ্যশালা। দু'দিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে হাজারো তাক-অলা শেলফ আর কারুকাজে ভরা কাঠের কাউন্টারে, সবখানে শোভা পাচ্ছে হরেক প্রকার মদের বোতল। যে-কোনও অ্যালকোহলিকের স্বর্গরাজ্য। পিঠ-উঁচু একটা সোফায় বসেছেন মিসেস ম্যাহোনি, হাতে মদের গ্লাস। নাগালের মধ্যে আছে অন্তত আরও চারটে বোতল।

'বি মাই গেস্ট।' রানা ভিতরে ঢুকতেই নিজের সংগ্রহের দিকে ইশারা করলেন বৃদ্ধা।

'না, ধন্যবাদ।' ড্রিঙ্ক নিল না রানা। এগিয়ে গেল মিসেস ম্যাহোনির দিকে। 'জ্ঞান ফিরলে একটা সবক পাবে আপনার নার্স—অযথা যার-তার দিকে যেন অস্ত্র তাক না করে। খুব অদ্ভুত কায়দায় আপনার সেবা করছে ও. মিসেস ম্যাহোনি।'

'অদ্ভুত তো বটেই,' স্বীকার করলেন বৃদ্ধা। 'কিন্তু যেহেতু ব্যর্থ

হয়েছে ও, দয়া করে জানতে পারি, কে তুমি? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

'বসে বলি?'

'প্লিজ!'

একটা চেয়ার টেনে বৃদ্ধার মুখোমুখি বসল রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা—রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর।' ভুয়া পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন মনে করছে না। নার্সের মাধ্যমে ওর সত্যিকার পরিচয় এমনিতেই ফাঁস হতে চলেছে। 'কিছুদিন আগে একটা কেস নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধের সঙ্গে আপনার ছেলের সম্পৃক্ততার কথা জানতে পেরেছি...'

'তাই নাকি?' হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি। 'ভারি মজার ব্যাপার তো!'

'দুঃখিত, ম্যা'ম। ব্যাপারটা হালকা চোখে দেখবার অবকাশ নেই।'

'ভণিতা না করে আসল কথা বলো, ইয়াং ম্যান।'

ফেনিসের নাম উচ্চারণ করল না রানা, তবে ওদের মতই একটা সংগঠনের কথা বলল মিসেস ম্যাহোনিকে। সারাক্ষণ যাচাই করল তাঁর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এমন কিছু দেখল না, যাতে মনে হতে পারে—ফেনিস সম্পর্কে তিনি সচেতন। শেষে যোগ করল, 'ইয়োরোপ থেকে পাকা খবর পেয়েছি আমরা, মিসেস ম্যাহোনি। ওটা জনসমক্ষে প্রচার করবার আগে সত্য-মিথ্যা পরখ করে নিতে চাই। বুঝতেই পারছেন, এ-খবর ফাঁস হলে সিনেটর ম্যাহোনির অনেক ক্ষতি হবে।'

তাচ্ছিল্যের একটা হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। 'বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, ইয়াং ম্যান কিছুই সিনেটরকে স্পর্শ করতে পারবে না। সামনের নির্বাচনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে

ও, এটা জানো না? সবাই বলছে এ-কথা... সবাই তা চায়ও।'

'কিন্তু এ-ধরনের একটা স্ক্যাণ্ডাল সে-সম্ভাবনা ভেস্তে দিতে পারে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'প্লিজ, ম্যা'ম, আমাকে জানতে হবে—রাজনীতিতে নামার আগে আপনার ছেলে পারিবারিক ব্যবসায় কতখানি সক্রিয় ছিলেন? আপনার স্বামীর সঙ্গে কখনও কি তিনি ইয়োরোপে যেতেন? বস্টনে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ছিল? ম্যাহোনি হলে কারা দেখা করতে আসত তাঁর সঙ্গে?'

'ম্যাহোনি হল?' যেন স্মৃতির সাগরে ভেসে গেলেন বৃদ্ধা। 'বস্টনের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ছিল ওটা... জানালা দিয়ে দেখা যেত পুরো শহরটাকে। আমার শ্বশুর তৈরি করেছিলেন বাড়িটা, প্রায় একশো বছর আগে। আহা, কী চমৎকার ছিল সেসব দিন...'

'মিসেস ম্যাহোনি,' ভদ্রমহিলাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা, 'আপনার ছেলে যখন গালফ ওঅর থেকে ফিরল...'

'ওই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করি না আমরা!' রূঢ় গলায় ওকে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। চেহারায় মেঘ জমেছে। 'আলোচনা করা বারণ!'

'কেন?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন বৃদ্ধা। 'সত্যি করে বলো তো, ওই নার্স তোমাকে আক্রমণ করেছিল কেন? কী বলেছিলে ওকে তুমি?'

'তেমন কিছুই না। এটুকুই যে, আপনার খোঁজ নিতে সিনেটর ম্যাহোনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি। 'আগে বলবে তো! তোমাকে ঠেকাবার চেষ্টা তো করবেই মেয়েটা!'

'এসবের জন্য?' চারপাশে শোভা পেতে থাকা মদের সংগ্রহ দেখাল রানা। 'আপনাকে মাতাল অবস্থায় দেখতে দিতে চাইছিল

না? ভাবছিল ওতে সিনেটর অসন্তুষ্ট হবেন?'

'বোকার মত কথা বোলো না। ও বুঝতে পেরেছিল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'মিথ্যে?'

'অবশ্যই! সিনেটর আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই করে না... খোঁজখবর নেয়া তো অনেক পরের কথা। আজ পর্যন্ত একবারও এ-বাড়িতে পা রাখেনি সে। শেষবার একান্তে আমাদের দেখা হয়েছে আট বছর আগে... আমার স্বামীর শেষকৃত্যে। এখন মা-ছেলে একত্রে দেখা দিই শুধু মিডিয়ার সামনে... ছবি তোলার জন্য। কথা বলি না কেউ কারও সঙ্গে। তা ছাড়া, ওসব অনুষ্ঠানে যাবার আগে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় আমাকে; ওষুধ খাইয়ে স্বাভাবিক বানানো হয়। আফটার অল, লোকের সামনে হবু প্রেসিডেন্টের মা মাতলামি করলে চলবে কেমন করে?'

'আপনাদের সম্পর্কের এমন অবনতি হয়েছে কীভাবে, জানতে পারি?'

'উঁহুঁ, ওসব আমি বলতে পারব না। তবে তুমি যে-ফালতু অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছ, তার সঙ্গে ওসবের সম্পর্ক নেই।'

'যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা বারণ বললেন কেন?'

'খোঁচাখুঁচি বন্ধ করো, বাছা। আগুন নিয়ে খেলছ তুমি!' সাবধান করলেন মিসেস ম্যাহোনি। কাঁপছেন তিনি, হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাস। ঝুঁকে ওটা তুলে নিল রানা।

'খারাপ লাগছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ন্... না। কিছু মনে না করলে আমাকে আরেকটা ড্রিঙ্ক এনে দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

বারের কাছে গিয়ে নতুন একটা গ্লাস নিল রানা। তাতে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এল বৃদ্ধার কাছে। তাঁর হাতে তুলে দিল।

'আমাকে জানতে হবে, ম্যা'ম,' বলল রানা। 'যুদ্ধ নিয়ে কেন কথা বলতে চান না আপনি?'

'বাজে একটা বিষয়, এটাই কি কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়?'

'উঁহুঁ। আমি নিজেও বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, অভিজ্ঞতার অভাব নেই। যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে আলাপ করার জন্য আমার চেয়ে উপযুক্ত মানুষ আপনি আর পাবেন না।'

'তা-ই? যুদ্ধে শুধু প্রাণ যায় না মানুষের, বেঁচে থেকেও সত্তা হারায় তারা—তোমার বেলাতে ঘটেছে এমন কিছু?'

'কীসের কথা বলছেন?'

'পরিবর্তন, ইয়াং ম্যান। যুদ্ধ মানুষকে বদলে দেয়! তুমি বদলাওনি?'

'হ্যাঁ, বদলেছি,' স্বীকার করল রানা। 'আপনার ছেলের বেলাতেও কি তেমন কিছু ঘটেছে?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ম্যাহোনি। 'ডাক্তাররা বলেছিল, যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা পাল্টে দিয়েছে আমার ছেলেকে। আমূল বদলে গেছে ও...'

'কী ধরনের পরিবর্তন?'

'না... ওসব নিয়ে কথা বলা বারণ! আমি বলতে পারব না!'

'প্লিজ, মিসেস ম্যাহোনি!' অনুরোধ করল রানা। 'বলুন আমাকে! জানতে চাই আমি। হয়তো সাহায্য করতে পারব সিনেটরকে।'

মলিন হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। 'কীভাবে সাহায্য করবে? কোনও আশাই তো নেই। ভিতরটা বদলে গেছে ওর... এতটা বেশি, তা এখন আর ঠিক করার উপায় নেই। বাইরে থেকে যা

দেখে লোকে, তা শুধুই এক মুখোশ। কিন্তু এমন ছিল না ও! কত্তো ভাল একটা ছেলে ছিল আমার ডেভিড... বুক ভরা ভালবাসা ছিল ওর, ছিল সবার জন্য দরদ! অথচ যুদ্ধে গিয়ে সব হারিয়ে গেল।' চোখ থেকে অশ্রু নেমে এল তাঁর। 'মা হয়েও কিছুই করার ছিল না আমার...'

'কেন? কী করেছিলেন তিনি?'

'জানি না, বুঝতে পারিনি। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে একেবারে অন্য মানুষে পরিণত হলো ও। শীতল, প্রাণহীন। ভালবাসা বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না ওর মাঝে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল কোনও কারণ ছাড়া। বেঁচে থাকার পরও একমাত্র সন্তানকে হারালুম আমি। হতাশায় মদ খেতে শুরু করলাম...' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাহোনি।

এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল রানা। নীরবে সান্ত্বনা দিল।

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়াং ম্যান।'

মাথা ঝোঁকাল রানা।

নিজেকে একটু সামলে নিলেন মিসেস ম্যাহোনি। গাউনের হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'হয়তো অবাক হবে, কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি আমি। আজও বাড়ির একটা কামরা ওর জন্য আলাদা করে রেখেছি। সাজিয়ে রেখেছি ওর-ই জিনিসপত্র দিয়ে—ঠিক যেভাবে বহু বছর আগে ঘর ছাড়ার সময় রেখে গিয়েছিল ও।'

হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে বসল রানা। 'মিসেস ম্যাহোনি, ওই কামরাটা আমি দেখতে পারি? প্লিজ?'

'উচিত হবে না,' দ্বিধা করলেন বৃদ্ধা। 'আমার ছেলের কামরা...

ওর অনুমতি ছাড়া কীভাবে কাউকে ঢুকতে দিই? ওই কামরাই তো ডেভিডের একমাত্র স্মৃতি... আমার লক্ষ্মী, মিষ্টি ডেভিডের!'

'আমি কোনও অসম্মান করব না তার স্মৃতির,' নরম গলায় বলল রানা। 'একবার... শুধু একবার দেখব কামরাটা।' মনের ভিতর এমন তাগিদ অনুভব করছে কেন, তা ও নিজেও জানে না।

কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ম্যাহোনি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমাকে কেন যেন খুব আপন মনে হচ্ছে, বাছা। ডেভিডের ছায়া দেখতে পাচ্ছি তোমার মাঝে। ঠিক আছে, চলো। আমাকে আমার চেয়ার-লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দাও। কামরাটা ওপরতলায়।'

কয়েক মিনিট পরেই দোতলার করিডোর ধরে এগোল দু'জনে। বাড়ির শেষ মাথায়, বন্ধ একটা দরজার সামনে থামলেন বৃদ্ধা। হাতল ঘোরাবার আগে বললেন, 'কিছুতে হাত দিয়ো না। আমার ছেলে খুব গোছালো স্বভাবের, এলোমেলো জিনিস পছন্দ করে না।'

'কথা দিলাম,' মুখে হাসি এনে বলল রানা।

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল দু'জনে। অল্পবয়েসী তরুণের রুম যেমন হয়, ভিতরটা তেমনি। বিছানার পাশে রয়েছে পড়ার টেবিল, পুরনো আমলের নানা রকম পোস্টার ঝুলছে দেয়ালে। শেলফে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের খেলাধুলার পদক আর ট্রফি। টেবিলের উপর রয়েছে একটা মাইক্রোস্কোপ আর কেমিস্ট্রি সেট। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা ভলিউমও খোলা অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে। খোলা পাতায় আণ্ডারলাইন করা, মার্জিনে ছোট ছোট নোট। বেডসাইড টেবিলে কয়েকটা গল্পের বই আর ম্যাগাজিন। খাটের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে জুতো, স্যাণ্ডেল আর স্পোর্টস্ শু-র সারি। আলনায় ঝুলছে রঙচঙা শার্ট-প্যান্ট, জিন্স আর

জ্যাকেট।

অশুভ একটা অনুভূতি হলো রানার। এ-কামরার মালিক একজন জীবিত মানুষ, তাও সবকিছু সংরক্ষণ করা হয়েছে মৃতের প্রতি সম্মান জানানোর রীতিতে। অদ্ভুত ব্যাপার! পাশ ফিরে মিসেস ম্যাহোনির দিকে তাকাল—দেয়ালে ঝোলানো কতগুলো ফটোগ্রাফের উপর সেঁটে আছে তাঁর দৃষ্টি। ও-ও মনোযোগ দিল ওদিকে।

ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ডের অল্পবয়েসের ছবি ওগুলো—একাকী, কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে তুলেছেন। মাঝখানের ছবিটা তোলা হয়েছে একটা সেইলবোটের ডেকে, পিছনের ব্যানার বলছে: *মার্বেলহেড সেইলিং চ্যাম্পিয়নশিপ, ১৯৮৫।* মোট চারজনকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে—ম্যাহোনি এবং তাঁর তিন সঙ্গী। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ছেলেটার উপর আটকে গেল রানার দৃষ্টি। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে—দৈহিক গড়ন আর চেহারায় প্রচুর মিল আছে ম্যাহোনির সঙ্গে। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো দেখল, বেশক'টাতেই আছে এই ছেলে। সিনেটরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল নিঃসন্দেহে।

'কে এই ছেলে?' জানতে চাইল রানা। 'চেহারা দেখে তো আত্মীয় মনে হচ্ছে।'

'আত্মীয় নয়, তবে দু'ভাইয়ের মত বড় হয়েছে ওরা,' উদাস গলায় বললেন মিসেস ম্যাহোনি। 'যুদ্ধেও যাবার কথা ছিল একসঙ্গে। কিন্তু আমার ডেভিডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও, পালিয়ে যায় ইয়োরোপে। আমার ছেলেকে একা যেতে হয় যুদ্ধে... বন্ধু ছাড়া, ভাই ছাড়া! যদি দুঃখকষ্ট শেয়ার করার জন্য কাউকে পেত, তা হলে হয়তো এভাবে বদলে যেত না ও! অবশ্য নিয়তিও প্রতিশোধ নিয়েছে ওর হঠকারিতার। গোস্তাদে স্কিইং করতে গিয়ে

দুর্ঘটনায় মারা গেছে ও। সেই থেকে আর কোনোদিন ওর নাম উচ্চারণ করেনি আমার ছেলে।'

'সেই থেকে? কবে সেটা?'

'বিশ বছর আগে।'

'কে ছিল এই ছেলে? কী ওর পরিচয়?'

জানালেন মিসেস ম্যাহোনি। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল রানার। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে রাখাল বালককে খুঁজে পাবার পরও মন বলছিল তদন্ত না থামাতে... আর তার ফলাফল ও দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। সব ধোঁয়া কেটে গেছে সামনে থেকে, দূর হয়ে গেছে সমস্ত খটকা... পেয়ে গেছে সব প্রশ্নের জবাব। চরম সত্যটা জেনে গেছে ও, এখন শুধু তার স্বপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করা প্রয়োজন।

তা-ই করবে রানা।

আঠারো

মিসেস ম্যাহোনিকে তাঁর বেডরুমে নিয়ে গেল রানা, শেষ এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। আসার পথে ডেভিড ম্যাহোনির কামরা থেকে একটা ছবি খুলে নিয়েছে। নার্সের এখনও জ্ঞান ফেরেনি, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। মোক্ষম একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে ও ফেনিসের বিরুদ্ধে, এখন ওই মেয়ের মাধ্যমে বস্টনে ওর উপস্থিতির কথা ফাঁস হলে

কিছু যায়-আসে না।

লুইসবার্গ স্কয়্যার থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ডাউনটাউনে চলে এল রানা। উঠল ছোট্ট একটা হোটেলে। রাত কাটাল ওখানে। গুছিয়ে নিল চিন্তা-ভাবনা আর পরবর্তী কর্মকৌশল। সকাল হতেই চলে গেল ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালে।

হাসপাতালের রেকর্ড অ্যাণ্ড বিলিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছে এক বয়স্কা নার্স। তাকে সরকারি একটা পরিচয়পত্র দেখাল রানা, বলল—সিনেটর ম্যাহোনির অফিস থেকে এসেছে। তারপর জানাল নিজের চাহিদা।

'ডাক্তার আর নার্সদের তালিকা চান সিনেটর?' বিস্মিত গলায় বলল নার্স। 'বিশ বছর আগেকার সড়ক দুর্ঘটনার পর যারা ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন? কেন?'

মুখে অমায়িক হাসি ফোটাল রানা। 'আগামী মাসে ওই ঘটনার বর্ষপূর্তি হতে চলেছে। সিনেটরের ভাষায়... ওটা ছিল তাঁর নবজন্ম। যারা তাঁকে এই নতুন জীবন দিয়েছেন, তাদেরকে সম্মান দেখাতে চান তিনি বিশেষ ওই দিনে।'

'হ্যাঁ, আমাদের সিনেটরের কাছে এমনটাই আশা করা যায়!' হাসল নার্সও। 'অসাধারণ এক মানুষ! বেশিরভাগ মানুষ অমন অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে চায়; কিন্তু ম্যাহোনিকে দেখুন! ভোলা তো দূরের কথা, উল্টো স্মরণ করার ব্যবস্থা করছেন। যারা তাঁকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনল, তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চাইছেন। এজন্যেই তাঁকে এত ভালবাসে লোকে।'

'ঠিক বলেছেন।'

এক টুকরো কাগজে প্রফেসর স্যাণ্ডার্সের কাছে শোনা সন-তারিখ লিখে দিয়েছে রানা, সেটা নিয়ে ফাইলিং কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল নার্স। বলল, 'দেখবেন, কেনেডির পর আবার

আমরা এই স্টেট থেকে একজন প্রেসিডেন্ট পাব। পুরো দেশের উপকার হবে তাতে।'

'আমি একমত,' মহিলার সঙ্গে তাল দিল রানা। 'ইয়ে... পুরো ব্যাপারটা কিন্তু গোপন রাখতে হবে। সিনেটর কোনও পাবলিসিটি চাইছেন না।'

'আর বলতে হবে না,' আশ্বাস দিল নার্স। 'ধরে নিন, আমার ঠোঁট সেলাই হয়ে গেছে।'

একটু পরেই ঢাউস এক ফোল্ডার নিয়ে ফিরে এল সে, তুলে দিল রানার হাতে। বলল, 'এর ভিতরে পাবেন সব। দুঃখিত, হাতে অনেক কাজ, নইলে আমিই ফাইল ঘেঁটে নামগুলোর লিস্ট করে দিতাম।'

'না, না,' রানা বলল। 'আমিই করে নিতে পারব। কোনও অসুবিধে নেই।'

'ওই যে, ওদিকে চেয়ার-টেবিল আছে,' আঙুল তুলে দেখাল নার্স। 'ওখানে বসে আরামে কাজ করতে পারবেন। কেউ বিরক্ত করবে না। কাজ শেষ হলে ফাইলটা ওখানেই রেখে যেতে পারেন, আমি পরে তুলে রাখব।'

'সো নাইস অভ ইউ!'

'উঁহুঁ। সো নাইস অভ আওয়ার সিনেটর।'

হেসে নিজের কাজে চলে গেল মহিলা। ফোল্ডার নিয়ে টেবিলে বসল রানা। ধুলো ঝেড়ে খুলল ওটা। ভিতরে হাজারো কাগজের ভিড়ে মিশে আছে ডেভিড ম্যাহোনির উনিশশো একানব্বুই সালের মেডিক্যাল রেকর্ড। আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল রানা। যা পেল, তা বিস্ময়কর... কিন্তু ওর সন্দেহের সঙ্গে মিল পাওয়া গেল রেকর্ডে।

আটাশে ডিসেম্বরে দুর্ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে

ম্যাহোনিকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তিনি প্রায়-মৃত। হাড়-গোড় ভেঙে, ধ্বংসস্তূপে থেঁতলে গিয়ে বলতে গেলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল শরীর: চেহারা এত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে চেনারই উপায় ছিল না। হাজারো ড্রাগ আর সেরামের বিশাল এক ফর্দ পাওয়া গেল, ওগুলোর সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। সেইসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল অত্যাধুনিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম। প্রায় তিন মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর বিরানব্বুই সালের মার্চে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

নোটবুক খুলে তাতে সমস্ত ডাক্তার আর অ্যাটেণ্ডিং নার্সদের নাম টুকে নিল রানা। দু'জন সার্জন, একজন স্কিন-গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট, আর আটজন নার্স প্রথম সপ্তাহে চিকিৎসা করেছে ম্যাহোনির। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে। তার বদলে নিয়োগ করা হয়েছিল মাত্র দু'জন ডাক্তার আর তিনজন প্রাইভেট নার্স।

যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেছে রানা—পনেরোটা নাম। পাঁচটা প্রাইমারি, দশটা সেকেণ্ডারি। প্রথম গ্রুপটার উপর ভাল করে নজর দিতে হবে এবার—মানে ওই দুই ডাক্তার আর তিন নার্স। ফোল্ডার বন্ধ করে বয়স্কা নার্সের কাছে ফিরে গেল ও।

'আমার কাজ শেষ,' বলল রানা। 'তবে ইয়ে... আরেকটু উপকার করতে পারেন আমার... মানে, সিনেটরের জন্য?'

'নিশ্চয়ই!' বলল নার্স। 'কী চান বলুন।'

'নামগুলো পেয়েছি, তবে একটু আপডেটিঙের প্রয়োজন। আফটার অল, রেকর্ডগুলো বিশ বছরের পুরনো। এখন কে কোথায় আছে, তা জেনে নিতে পারলে খুব ভাল হয়।'

'এখানে তো ওসব পাবেন না। তবে চাইলে আপনাকে ওপরতলায় পাঠাতে পারি। এখানে সব পেশেন্টদের রেকর্ড,

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট তিনতলায়। ওখানে সবকিছু কম্পিউটারাইজড্।'

'ব্যাপারটা প্রচার হতে দিতে চাইছিলাম না...' ইতস্তত করল রানা।

'কিচ্ছু ভাববেন না। আমার বোনপো আছে ওখানে। ওর উপর আস্থা রাখতে পারেন। যাবেন?'

রানা মাথা ঝাঁকালে ইন্টারকম তুলে নিল নার্স।

মিনিটদশেক পরে তার বোনপোর পাশে দেখা গেল রানাকে। অল্পবয়েসী এক তরুণ, নাম টমি. লেখাপড়ার পাশাপাশি খালার হাসপাতালে পার্টটাইম চাকরি নিয়েছে। তাকে যা বলার বলে দিয়েছে নার্স, তাই খুশিমনেই সাহায্য করছে রানাকে।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' কাজ শুরুর আগে বলল রানা।

'কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' হাসিমুখে বলল তরুণ। 'খালার কাছে শুনেছি সব। সিনেটর ম্যাহোনির জন্য কিছু করতে পারছি, এ তো আমার সৌভাগ্য।' কম্পিউটারের কি-বোর্ড টেনে নিল নিজের দিকে। 'বলুন, কী জানতে চান।'

প্রথম ডাক্তারের নাম দিল রানা—ডা. হ্যারল্ড ফ্ল্যানাগান। ওটা কম্পিউটারে টাইপ করে এন্টার চাপল টমি। স্ক্রিনে ভেসে উঠল দুটো মাত্র শব্দ—*নট ফাউণ্ড।* ভুরু কুঁচকে কি-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টমি। কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাবার পরও কোনও তথ্য হাজির হলো না স্ক্রিনে।

'দ্যাটস্ অড!' বিড়বিড় করল সে।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল টমি। 'কম্পিউটারের রেকর্ড যদি ঠিক থাকে, তা হলে বলতে হয়—আপনার এই ডাক্তারের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই হাসপাতালে একটা প্যারাসিটামলও ইস্যু করেনি সে

কোনোদিন।'

'অসম্ভব!' বলল রানা। 'ম্যাহোনি-র মেডিক্যাল রেকর্ডে নাম আছে তার।'

'অথচ কম্পিউটারে নেই। এর মানে একটাই হতে পারে—ডেটাবেজ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে লোকটার তথ্য। কে মুছেছে, কেন মুছেছে, কবেই বা মুছেছে... তা আমি জানি না।'

'হুম। ঠিক আছে, পরেরটা দেখা যাক। ডা. স্ট্যানলি অ্যাবোট।'

কি-বোর্ড খটখটাল টমি। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। কিন্তু ধরাধামে নেই বেচারা। এই হাসপাতালেই মারা গেছেন ভদ্রলোক—সেরিব্রাল হেমারেজে। একটু অদ্ভুতই বলতে হবে ব্যাপারটা—বয়স মাত্র তিরিশ ছিল তার। এত কম বয়সে হেমারেজ...'

'কবে মারা গেছে?'

'একুশে মার্চ, উনিশশো বিরানব্বুই।'

'হাসপাতাল থেকে ম্যাহোনি ছাড়া পেয়েছিলেন তেরো তারিখে,' বিড়বিড় করল রানা। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মারা গেল তার ডাক্তার? টমির দিকে ফিরল। 'নার্সদের নামগুলো দেখো, প্লিজ।'

ক্যাথারিন কনেলি। মৃত. ২৬-৩-৯২।

অ্যালিস ডানবার। মৃত. ২৬-৩-৯২।

জ্যানেট ফ্রিম্যান। মৃত. ২৬-৩-৯২।

গম্ভীর মুখে চেয়ারে হেলান দিল টমি। বোকা নয় সে, গোলমালের আভাস পাচ্ছে। বলল, 'মনে হচ্ছে মড়ক লেগেছিল, তাই না? বিরানব্বুইয়ের মার্চ মাসটা ছিল ভীষণ অপয়া, বিশেষ করে ছাব্বিশ তারিখটা। একসঙ্গে তিন-তিনজন নার্স মারা গেল...'

‘কীভাবে মারা গেছে, তা লেখা আছে?’

‘উঁহুঁ। তারমানে হাসপাতালের সীমানার ভিতরে মারা যায়নি ওরা।’

‘কিন্তু একই দিনে মারা গেছে—ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। যদি কারণটা জানা যেত...’

‘এক মিনিট,’ বলে উঠল টমি। ‘নীচতলার সাপ্লাইরুমে পুরনো একজন স্টাফ আছে, আমরা সবাই *দাদীমা* বলে ডাকি তাকে। শুনেছি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এখানে কাজ করছে সে। দাঁড়ান, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি... হয়তো মনে আছে তার ঘটনাটা।’

ইন্টারকম তুলে ডায়াল করল সে। ওপাশে কল রিসিভ করা হতেই স্পিকার অন্ করে দিল।

‘ফার্স্ট ফ্লোর সাপ্লাই!’ খনখনে একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

‘হাই, দাদীমা! কেমন আছ? টমি বলছি।’

‘টমি... দুষ্টু টমি! কী চাই?’

‘আমার এখানে এক ভদ্রলোক এসেছেন, পুরনো কয়েকজন স্টাফের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে, বিরানব্বুই সালে তিনজন নার্স একসঙ্গে মারা গিয়েছিল কি না?’

‘কী যে বলো, সে-কথা কি ভোলা যায়। ক্যাথি কনোলি ছিল ওদের মধ্যে, মেয়েটাকে আমি খুবই ভালবাসতাম।’

‘কী ঘটেছিল?’

‘সাগরভ্রমণে গিয়েছিল তিন বান্ধবী। বাতাসে বোট উল্টে গিয়ে তিনজনই ডুবে যায় পানিতে। ওদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।’

এবার প্রশ্ন করল রানা।

‘সাগরভ্রমণ? মার্চ মাসে?’

‘কী আর বলব, কপাল খারাপ হলে যা হয় আর কী। বড়লোকের এক ছেলে ওদেরকে দাওয়াত করেছিল ইয়ট ক্লাবের

পার্টিতে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে রাতের বেলা ওদের খায়েশ জাগল বোট নিয়ে সাগরে যাবার... তখনই ঘটল দুর্ঘটনা!'

'রাতে ঘটেছিল দুর্ঘটনা?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তো লাশগুলো আর খুঁজে পাওয়া গেল না।'

'আর কেউ মরেছে ওই দুর্ঘটনায়?'

'না, স্যর,' জানাল *দাদীমা*। 'সঙ্গের ছেলেগুলো ভাল সাঁতারু ছিল। ওদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন, সেটাই আশ্চর্য।'

'কোথায় ঘটেছিল ওই ঘটনা, মনে পড়ে আপনার?'

'হ্যাঁ। উপকূলের কাছে... মার্বেলহেডে।'

'ধন্যবাদ।' বলে লাইন কেটে দিল রানা। চেহারায় মেঘ জমেছে ওর

'ঝামেলা, তাই না?' ওর মুখ দেখে বলল টমি।

'হ্যাঁ, ঝামেলাই বটে,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'আরও দশটা নাম আছে আমার হাতে। এগুলো দ্রুত চেক করে দিতে পারবে?'

আটজন নার্সের মধ্যে চারজনকে জীবিত পাওয়া গেল। তাদের ভিতর একজন চলে গেছে স্যান ফ্রান্সিসকোতে, ঠিকানা নেই; একজন ডালাসে বাস করছে নিজের মেয়ের সঙ্গে; আর শেষ দু'জন রয়েছে উস্টারের সেইন্ট অ্যাগনেস রিটায়ারমেন্ট হোমে। একজন সার্জন আর স্কিন গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট মারা গেছেন; তবে দ্বিতীয় সার্জন... ডা. নাথান হ্যামার... তিয়াত্তর বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন গত বছর; এখন কুইন্সিতে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন।

'তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?' টমিকে বলল রানা।

'যত খুশি করুন,' হাসল তরুণ। 'ফোন তো আমার না, হাসপাতালের।'

স্ক্রিন থেকে ডা. হ্যামারের নাম্বার দেখে নিল রানা, ডায়াল

করল ওটায়।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে শোনা গেল ভারী কণ্ঠ। 'হ্যামার বলছি।'

'আমার নাম মাসুদ রানা, স্যর,' বলল রানা। 'আমাকে আপনি চেনেন না। তবে জরুরি একটা বিষয়ে তথ্যের জন্য আপনাকে ফোন করেছি। ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেলের একটা কেস... বিশ বছর আগেকার। আপনি একটু সময় দিলে খুব ভাল হয়।'

'পেশেন্টের নাম কী? ওখানে তো বহু রোগী দেখেছি আমি।'

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি, স্যর।'

কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেলেন ডা. হ্যামার। তারপর বিরক্ত গলায় বললেন, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, ব্যাপারটা কবর পর্যন্ত ধাওয়া করে বেড়াবে আমাকে। আরে বাবা, মানুষের কি ভুলচুক হয় না? ডাক্তার হয়েছি বলে কি ফেরেশতা হয়ে গেছি নাকি?'

'ভুলচুক?'

'জেনে রাখো বাছা, অমন ভুল জীবনে খুব কমই করেছি আমি। বারো বছর ডিপার্টমেন্ট অভ সার্জারির হেড ছিলাম, কেউ কোনোদিন অভিযোগ করতে পারেনি আমার বিরুদ্ধে। ওই কেসটায় নাহয় একটা ভুল ডায়াগনোসিস দিয়ে ফেলেছিলাম... কিন্তু তাতে আমার দোষ কোথায়? এক্স-রে আর অন্যান্য টেস্ট রেজাল্ট দেখে তো অমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।'

ডা. হ্যামারের কোনও ডায়াগনোসিস দেখেনি রানা সিনেটরের ফাইলে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কি তা হলে ভুল ডায়াগনোসিসের জন্য সরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওই কেস থেকে?'

'শুধু সরানো?' রাগ ফুটল বৃদ্ধ সার্জনের কণ্ঠে। 'আমাকে আর বেলফোর্ডকে বলতে গেলে লাথি দিয়ে তাড়িয়েছে ম্যাহোনির

পরিবার।'

'বেলফোর্ড... মানে, স্কিন-গ্রাফট্ স্পেশালিস্ট?'

'হ্যাঁ, প্লাস্টিক সার্জনও বলতে পারো ওকে। নিজ পেশায় রীতিমত একজন শিল্পী ছিল ও। অথচ ওকে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আনা হলো পুঁচকে এক ছোঁড়াকে। বেচারা... ম্যাহোনি সুস্থ হবার পর সে নিজেই মারা গেল।'

'সেরিব্রাল হেমারেজে যে-ডাক্তার মারা গেছেন, তার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন সুইস ব্যাটা হাজির ছিল ওখানে। কেন বাঁচাতে পারল না, তা বোঝা মুশকিল।'

'কোন্ সুইস?'

'*হের ডক্টর* বলতাম আমরা ওকে। সার্জন... আমাকে রিপ্লেস করেছিল। জুরিখ থেকে আনা হয়েছিল তাকে। কী দেমাগ, ব্যবহার দেখে মনে হতো আমরা মেডিক্যাল স্কুল থেকে নকলবাজি করে পাশ করেছি!'

'সে এখন কোথায়, বলতে পারেন?'

'নাহ্। ম্যাহোনি সুস্থ হবার পর সুইটজারল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিল। আমি খোঁজখবর রাখার আগ্রহ পাইনি।'

'এক্সকিউজ মি, স্যর। ভুলের কথা বললেন আপনি। কী ধরনের ভুল?'

'সিম্প্‌ল। এক্স-রে আর টেস্ট রেজাল্ট থেকে শেষ কথা বলে দিয়েছিলাম। ম্যাহোনির বাঁচার কোনও আশা ছিল না... অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলছিল।'

'কিন্তু সেখান থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি, রাইট? আপনার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করলেন।'

'নিজেকে নিখুঁত বলে দাবি করছি না আমি। তবে এ-কথা

ঠিক, আমার এখনও বিশ্বাস হয় না, লোকটা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল কীভাবে!'

'সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ, স্যর।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মিনিটখানেক চিন্তা করল রানা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এক্স-রে...'

'কী?' মুখ তুলে তাকাল টমি। 'কীসের এক্স-রে?'

একটা চেয়ার টেনে তরুণের পাশে বসল রানা। 'এই হাসপাতাল সম্পর্কে কতখানি জানো তুমি?'

'ঠিক কী জানতে চান, বলুন তো?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল টমি।

'এখানে পুরনো এক্স-রে রাখার ব্যবস্থা আছে? কোনও ধরনের রেপোজেটরি?'

'কত পুরনো? বিশ বছর?' ভুরু নাচাল টমি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আছে। কার এক্স-রে চান?'

'সিনেটর ম্যাহোনির মুখের।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। দুর্ঘটনায় সিরিয়াস রকমের আহত হয়েছিলেন তিনি, সারা শরীরের হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই প্রচুর এক্স-রে করা হয়েছিল সে-সবের অবস্থা দেখতে। মুখেরও নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে। ওগুলোই আমার চাই... বিশেষ করে দাঁতেরগুলো।'

'আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছেন, মিস্টার।'

'এর জন্য ভাল পারিশ্রমিক পাবে। এক হাজার ডলার।' লোভ দেখাল রানা। 'কাজটা কিন্তু খুবই সহজ। পুরনো এক্স-রে নিশ্চয়ই সোনাদানার মত পাহারা দেয়া হয় না?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল টমি। ভেবে দেখল প্রস্তাবটা। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, আমাকে বিশ মিনিট সময় দিন।'

চলে গেল সে।

টেলিফোনের রিসিভার আবার কানে ঠেকাল রানা। এবার ওর এজেন্সির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তাই ফোন করল ওয়াশিংটন শাখা-প্রধান মাহবুবকে। ওপাশে সাড়া পেতেই তড়িঘড়ি করে বলল, 'মাহবুব, আমি!'

'একটু ধরুন,' রানার কণ্ঠ চিনতে পেরে স্ক্র্যাম্বলার অন্ করল মাহবুব। 'হ্যাঁ, এবার নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন, মাসুদ ভাই। আপনি কোথায়?'

'বস্টনে। শোনো, হাতে সময় নেই, জলদি একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কী কাজ?'

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির ডেন্টিস্টকে খুঁজে বের করো। তার অফিস থেকে ম্যাহোনির দাঁতের এক্স-রে জোগাড় করে আনতে হবে। পারবে?'

'চুরি করতে হলে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, মাসুদ ভাই।'

'না, চুরি না। ভুয়া ডকুমেন্ট ব্যবহার করো, ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইন্সপেকশনের নাম করে ঢোকো ডেন্টিস্টের অফিসে। ডাক্তারের কাজ রিভিউ করার বাহানায় কিছু কেসফাইল নিয়ে আসবে। সিনেটর ম্যাহোনির ফাইল থাকবে ওর মধ্যে। আজ রাতের মধ্যে ওটা আমার হাতে পৌঁছুনো চাই।'

'কোথায় পাঠাব?'

'এজেন্সির বস্টন ব্রাঞ্চে পাঠিয়ো। আমি কালেক্ট করে নেব

সময়মত।'

'বুঝতে পেরেছি, মাসুদ ভাই।'

কথা শেষ করে টমির কম্পিউটারের সামনে বসল রানা। ইন্টারনেটের সংযোগ আছে ওতে। ব্রাউজার খুলে *গ্লোব* পত্রিকার ওয়েবসাইটে ঢুকল। সেখান থেকে গেল আর্কাইভে। একে একে ১৯৯১-এর ডিসেম্বর থেকে পুরনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটতে শুরু করল। ডেভিড ম্যাহোনির দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেল তাতে। ডিসেম্বরের শেষ ক'দিন আর ৯২-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত মুখর হয়ে আছে পত্রিকা তার হালচাল নিয়ে। কিন্তু ওসবে আগ্রহী নয় রানা, অন্য একটা খবর খুঁজছে। এপ্রিলে গিয়ে পেল সেটা। শিরোনামটা এ-রকম:

গোস্তাদের স্কিইং ট্র্যাজেডিতে বস্টনিয়ানের মৃত্যু

ঝটপট খবরটা পড়ে ফেলল রানা। জরুরি তথ্যটা পেল শেষ প্যারায়। তাতে লেখা হয়েছে:

...আল্পসের প্রতি হতভাগ্য যুবকটির অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে পর্বতশ্রেণীর গোড়াতেই চির-সমাহিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পরিবার। জানা গেছে, কল দ্যু পিলঁ গ্রামের ছোট্ট গোরস্থানে শেষ নিদ্রায় শায়িত হবে সে...

কে শুয়ে আছে কল দ্যু পিলঁ-র কবরে? ভাবল রানা। আদৌ কোনও লাশ দাফন করা হয়েছে, নাকি কফিনটা খালি?

খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে।

এক্স-রে নিয়ে ফিরে এসেছে টমি। ওকে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল রানা। রেন্টাল এজেন্সিতে গিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করল, ওটা নিয়ে চলে গেল ম্যাহোনি হল্ দেখতে। বিশাল এক এস্টেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায়; পুরো এলাকার নামই বিখ্যাত পরিবারটার

নামে—ম্যাহোনি ড্রাইভ, ম্যাহোনি হিল, ইত্যাদি। পুরনো আমলের পাথরের প্রাচীরে ঘেরা সীমানা, রাস্তা থেকে ছাত ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ওখানে প্যারাপেট দেখে আন্দাজ করল রানা, পুরনো আমলের দুর্গের আদলে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। চারপাশ ভাল করে দেখে নিল ও, লক্ষ করল—এস্টেটের সামনে, রাস্তার ওপারে নতুন একটা অ্যাপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। ওটার ছাতে উঠতে অসুবিধে হলো না। ওখান থেকে বিনকিউলার দিয়ে তাকাল এস্টেটের ভিতরে।

যা ভেবেছে তা-ই। আসলেই একটা দুর্গ ওটা। ভীমদর্শন এক ইমারত, মোটা আর ভারী পাথরে গড়া। চারকোনায় চারটা টাওয়ার। সামনে কোর্টইয়ার্ডের আদলে রয়েছে বিশাল এক কংক্রিটের উঠান—বোধহয় পার্কিং লট হিসেবে ব্যবহার হয় ওটা। একপাশে গ্যারাজ, তাতে অন্তত বিশটা গাড়ি রাখা যাবে। নিরাপত্তার খাতিরে প্রায় খালিই রাখা হয়েছে চারপাশের জমি। ছোটখাট বাগান আছে, কিন্তু বড় গাছের সংখ্যা একেবারে কম। ইউনিফর্ম-পরা গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে, ওদের ফাঁকি দিয়ে উন্মুক্ত ওই জমি পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

এ-মুহূর্তে অনুপ্রবেশের কোনও ইচ্ছে নেই রানার। তাই রেকি শেষ করে ফিরে এল হোটেলে। দিনের বাকিটা সময় বিশ্রাম নিল, সেইসঙ্গে সাজাল নিজের পরিকল্পনা।

রাত ন'টায় আবার বেরুল ও, তখন মনোলোভা সাজে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে বস্টন নগরী। ডাউনটাউনের ছোট্ট একটা পাবে চলে গেল, রওনা হবার আগে ফোনে কথা হয়েছে রানা এজেন্সির বস্টন শাখার সঙ্গে: জানতে পেরেছে, রাত আটটার ওয়াশিংটন টু বস্টন ফ্লাইটে দরকারি ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়েছে

মাহবুব। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ওটা।

রানা যখন পাবে ঢুকল, ভিতরে তখন বেশ ভিড়। কোমল, মৃদু, ঠাণ্ডা আলোয় স্বপ্নাচ্ছন্ন একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। উদাস চেহারার এক যুবক স্টেজে এসে দাঁড়াল, হাতে স্প্যানিশ গিটার, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভারী, বিষণ্ণ সুরে গান ধরল সে।

গান শোনায় মন নেই রানার, তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল চারদিক। কোন টেবিল খালি নেই। সবার থেকে একটু দূরে, কোণের টেবিলে একা বসে আছে তরুণ এক বাঙালি। ঈগলের মত ধারালো চেহারা, পরনে জিন্স আর লেদার জ্যাকেট, চোখে রিমলেস চশমা। রানা এজেন্সির বস্টন শাখাপ্রধান তুহিন। কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই রানাকে দেখতে পেল সে, ভাঁজটা মিলিয়ে গেল কপাল থেকে। একটা হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর।

দু'সারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে দৃঢ়, দ্রুত পায়ে এগোল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুহিন, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে করমর্দন করল রানার সঙ্গে। বসল রানা। আঙুল তুলে ওয়েইটারকে ডাকল, দু'জনের জন্য কফির অর্ডার দিল।

'এনেছ ওটা?' ওয়েইটার চলে গেলে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' টেবিলের তলা দিয়ে একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল তুহিন। 'সিনেটর ম্যাহোনির ডেন্টাল রেকর্ড।'

'গুড।' প্যাকেটটা কোটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল রানা।

'কিছু মনে করবেন না, মাসুদ ভাই,' তুহিন বলল। 'ব্যাপারটা কী নিয়ে, আমাকে বলা যাবে? ম্যাহোনির পিছনে লেগেছেন কেন আপনি?'

'আপাতত ওসব না জানাই ভাল তোমার জন্য।'

'কিন্তু ঢাকায় চিফ অস্থির হয়ে উঠেছেন। সোহেল ভাই খবর পাঠিয়েছেন আমাদের সব ব্রাঞ্চে—আপনার খোঁজ পাওয়ামাত্র যেন রিপোর্ট করি।'

'বস্টনে এসেছি, এটা জানিয়ে দিতে পারো। অন্যান্য ইনফরমেশন আমি নিজেই পাঠাব যথাসময়ে।'

'বুঝতে পারছি, এ-মুহূর্তে পুলসেরাত পার হচ্ছেন। আমার করণীয় কিছু আছে, মাসুদ ভাই?'

'না, আপাতত একাই এগোতে চাই আমি। সাহায্য দরকার হলে তোমাদেরকে জানাব।'

কফি এসে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপ খালি করে উঠে পড়ল রানা।

পরদিন সকালে অ্যাণ্ডোভারের মেইন স্ট্রিটে হাজির হলো রানা, মার্কাস স্ট্যানটন নামে এক ডেন্টিস্টের অফিসে। রাতে সিনেটর ম্যাহোনির ডেন্টাল রেকর্ডের ফাইল পড়ে দেখেছে ও, জানতে পেরেছে—তাঁর ছেলেবেলায় এই ডাক্তারই পুরো ম্যাহোনি পরিবারের দাঁতের চিকিৎসা করতেন। ভেবে দেখেছে রানা, ম্যাহোনি আর তার ছোটবেলার বন্ধুর মধ্যে যে-রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাতে ওদের একই ডেন্টিস্টের কাছে যাবার কথা। ধারণাটা কতখানি সত্যি, সেটাই দেখতে এসেছে।

অফিসে ঢোকার পর রিসেপশনিস্ট জানাল, ডা. স্ট্যানটন বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। এখন তাঁর জায়গা নিয়েছে তাঁরই ছোট ছেলে—ম্যাথিউ স্ট্যানটন। বাপের মত সে-ও ডেন্টিস্ট। গতকালকের কাভারটাই ব্যবহার করছে রানা, সিনেটরের অফিস থেকে আসা স্টাফ সেজেছে। কাজেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে দেরি

হলো না। ডাক্তারের কাছে সিনেটর আর তার পুরনো বন্ধুর রেকর্ড চাইল ও, বলল—অফিশিয়াল কাজের জন্য ওগুলো প্রয়োজন।

কিছুই সন্দেহ করল না ডাক্তার, প্রিয় সিনেটরের কথা শুনেই গলে গেছে সে। পুরনো সমস্ত রেকর্ড ফেলে রাখা হয়েছে অফিসের স্টোররুমে, অ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে নিজেই ঢুকে পড়ল ওখানে। বেরিয়ে এল ঘণ্টাখানেক পর। সারা শরীরে ধুলোবালি মাখা অবস্থায়। হাতে ধরে রেখেছে পুরনো একটা বাক্স।

'পেয়েছি আপনার জিনিস, মি. রানা,' হাসিমুখে বলল ডা. স্ট্যানটন। বাক্স থেকে দু'সেট এক্স-রে বের করে দিল। 'বাপ রে, স্টোরটার যে এমন দুর্দশা, তা আগে জানা ছিল না। সময় করে পরিষ্কার করতে হবে ওটা।'

'সরি, কষ্ট দিলাম আপনাকে,' ভদ্রতা দেখিয়ে বলল রানা। 'সিনেটরকে বলব আপনার কথা, নিশ্চয়ই খুশি হবেন তিনি।'

'না, না, এ আর এমন কী?' বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল ডাক্তার। 'আমাদের জন্য কত কী করছেন উনি, আমরা বুঝি এইটুকু করতে পারব না?'

'তা হলে আরেকটু কষ্ট দেব আপনাকে।' ব্রিফকেস থেকে গতকাল সংগ্রহ করা এক্স-রে ফিল্মগুলো বের করল রানা। 'এগুলোও সিনেটর আর তাঁর বন্ধুরই। কিন্তু তাড়াহুড়োয় মিশিয়ে ফেলেছি। কোন্টা কার, মনে করতে পারছি না। একটু মিলিয়ে দেবেন?'

'শিয়োর!' সবগুলো এক্স-রে নিয়ে একটা ল্যাম্পের সামনে চলে গেল ডাক্তার। আলো ফেলে মেলাল সেট। তারপর ফিরিয়ে দিল রানার হাতে। 'হয়ে গেছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ডা. স্ট্যানটন।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও। কোনও দরকার পড়লেই সোজা চলে

আসবেন এখানে।'

বিদায় নিয়ে ডেন্টিস্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে উঠে কোলের উপর তুলে নিল ফাইলদুটো। কী দেখবে? উত্তেজনায় কাঁপছে দু'হাত।

ফাইলের উপরে সিনেটর আর তার বন্ধুর নাম লিখে দিয়েছে ডাক্তার। প্রথমে ডেভিড ম্যাহোনিরটা খুলল। ছেলেবেলার এক্স-রে-র সঙ্গে ওতে রাখা হয়েছে হাসপাতাল থেকে আনা এক্স-রে—চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল রানা। কিন্তু ওয়াশিংটনের সেটটা নেই এখানে! তারমানে সিনেটে যে-মানুষটা বসে আছে, সে কোনোদিন অ্যাকসিডেন্ট করেনি ম্যাসাচুসেটস টার্নপাইকে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট যে হতে চলেছে, সে ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড নয়!

প্রমাণ পেয়ে গেছে রানা। কাঁপা হাতে দ্বিতীয় ফাইল খুলল। বন্ধুর ডেন্টাল এক্স-রে-র সঙ্গে ওয়াশিংটনের সেটটা রেখেছে ডাক্তার। আর কোনও সন্দেহ নেই। ফাইল বন্ধ করে উপরে লেখা নামটা পড়ল ও।

মাসিমো গুইদেরোনি—রাখাল বালকের ছেলে!

উনিশ

উত্তেজিত অবস্থায় হোটেলে ফিরে এল রানা। পেয়েছে... অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেছে ও—ডেভিড ম্যাহোনির পরিচয়ধারী সিনেটর

আসলে রাখাল বালক জিয়োভান্নি গুইদেরোনির ছেলে! পরিচয় বদলের এই ঘটনা ঘটেছে বিশ বছর আগে, আসল ম্যাহোনির অ্যাকসিডেন্টের পর। ডা. হ্যামার ভুল করেননি, আসলেই বাঁচানো যায়নি তাঁকে। তার বদলে নিজস্ব প্লাস্টিক সার্জনের মাধ্যমে বদলানো হয়েছে মাসিমোর চেহারা, রাতের অন্ধকারে তাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে ম্যাহোনির বিছানায়। আর ম্যাহোনি চলে গেছেন কবরে... মাসিমোর কবরে! স্কিয়িং অ্যাকসিডেন্টের পুরো ঘটনাই মিথ্যে, ওটা শুধুই একটা কবর রচনার বাহানামাত্র। পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের সবাইকে খুন করা হয়েছে—তরুণ সেই প্লাস্টিক সার্জন, আর তিন নার্স।

ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ফেনিস তথা জিয়োভান্নি গুইদেরোনির প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছে রানা। এত জটিল একটা পরিকল্পনা তৈরি, তারপর আবার সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। মাই গড... মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে নিজের ছেলেকে বসাতে চাইছে সে। পৃথিবীতে এরচেয়ে ক্ষমতাবান পদ আর একটিও নেই। এক অর্থে ধরণীর ঈশ্বরে পরিণত হবে লোকটা। তাকে ঠেকাবার মত মানুষ এখন কেবল একজন—ও নিজে! ভাবতেই বুকটা হিম হয়ে এল। গুইদেরোনিকে শুধু ঠেকালেই চলবে না, কুয়াশা আর সোনিয়াকেও উদ্ধার করতে হবে তার মুঠোর মধ্য থেকে। বড়ই কঠিন দায়িত্ব।

হোটেলে ফিরে দ্রুত ঢাকায় ফোন করল রানা। কথা বলল বিসিআই চিফের সঙ্গে। জানাল সবকিছু। শোনার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতখানি নিশ্চিত তুমি, এম.আর.নাইন?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট, স্যার,' রানা বলল। 'আমার হাতে প্রমাণ আছে। ডেভিড ম্যাহোনি আর মাসিমো গুইদেরোনির ডেন্টাল

রেকর্ড!'

'কিন্তু ওই রেকর্ডকে ভুয়া বলে দাবি করতে পারে লোকটা,' চিন্তিত গলায় বললেন রাহাত খান। 'যে-কোনও অভিযোগ অস্বীকার করা রাজনীতিবিদদের জন্মগত স্বভাব। বলবে তার প্রতিপক্ষ এসব ভুয়া অভিযোগ ছড়াচ্ছে।'

'অভিযোগটা যদি ঠিকমত দাঁড় করানো যায়, তা হলে বাড়তি প্রমাণ জোগাড় করতে কষ্ট হবে না। ডিএনএ টেস্টের জন্য বাধ্য করা যাবে সিনেটরকে। ডেভিড ম্যাহোনির মা বেঁচে আছেন, তার সঙ্গে ডিএনএ ম্যাচিং করলেই ধরা পড়ে যাবে লোকটা।'

'এ-ধরনের পদক্ষেপ নিতে চাইলে বড় ধরনের ব্যাকিং প্রয়োজন হবে তোমার। সমস্যা হলো, মার্কিন প্রশাসনের বড় বড় বিভিন্ন পদে ফেনিসের লোক বসে আছে। তাদের পরিচয় জানা নেই কারও। পদে পদে বাধা পাবে তুমি।'

'আমি যদি বর্তমান প্রেসিডেন্টের কাছে যাই, স্যর?'

'প্রেসিডেন্ট? উনি ক্লিন?'

'আমার তা-ই ধারণা। ওঁকে যদি হাত করতে পারত গুইদেরোনি, তা হলে এ-মুহূর্তে নিজের ছেলেকে হোয়াইট হাউসে বসানোর জন্য মাঠে নামত না। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করত। এর মানে একটাই—বর্তমান প্রেসিডেন্ট, সেইসঙ্গে আগামী নির্বাচনের অন্য কোনও সম্ভাব্য প্রার্থীকে হাত করতে পারেনি সে।'

'হুমম। সেক্ষেত্রে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুনোর একটাই চ্যানেল আছে তোমার হাতে—জর্জ হ্যামিলটন।'

'অ্যাডমিরাল তো অসুস্থ, স্যর,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'না,' নেতিবাচক জবাব দিলেন রাহাত খান। 'লেটেস্ট খবর জানা নেই তোমার—জর্জ এখন অনেকটাই সুস্থ। বাড়িতে ফিরে এসেছে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণগুলো হোয়াইট হাউসে

পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, স্যর। ইয়ে...' ইতস্তত করল রানা, 'মি. লংফেলোর কোনও খবর কি জানা আছে আপনার?'

'মারভিন এখনও হাসপাতালে, পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত হয়নি। বিএসএস এজেন্টরা পাহারা দিচ্ছে ওকে। আমাদের কিছু লোকও রেখেছি হাসপাতালের আশপাশে। ওকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। চিন্তা করতে হলে কুয়াশা আর ওই মেয়েটার ব্যাপারে করো। কীভাবে ওদেরকে উদ্ধার করবে, ভেবেছ কিছু?'

'একটা প্ল্যান নিয়ে কাজ করছি। এখনও ফাইনাল হয়নি।'

'তোমার উপর আস্থা আছে আমার। আশা করি সফল হবে। তারপরেও সাবধানে থেকো। ফেনিসের বিশাল একটা লক্ষ্য ভেস্তে দিতে চাইছ। এত সহজে হার মানতে চাইবে না ওরা। ভেবেচিন্তে পা ফেলো। ঠিক আছে?'

'জী, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, রানা।'

চিফের সঙ্গে কথা শেষ হলে তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটনে ফোন করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বাড়িতে। ফোন ধরল চার্লি—অ্যাডমিরালের শোফার।

'মি. রানা!' রানার গলা চিনতে পেরে বলে উঠল সে। 'নাইস টু হিয়ার ফ্রম ইউ। আজ সকালেই অ্যাডমিরাল আপনার কথা বলছিলেন।'

'হ্যালো, চার্লি!' বলল রানা। 'তুমি ওখানে কী করছ? গাড়ি ছেড়ে একেবারে বাড়ির ভিতরে...'

'অ্যাডমিরালের নিরাপত্তার জন্য থাকছি এখানে,' জানাল শোফার। 'বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আর কাউকে কাছে থাকতে দিচ্ছেন না তিনি।'

'তা-ই? একটু কথা বলা যাবে ওঁর সঙ্গে?'

'অবশ্যই। ধরুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কানে ভেসে এল হ্যামিলটনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

'রানা! মাই বয়! কোথায় তুমি?'

'পরে জানাচ্ছি, স্যর,' রানা বলল। 'এই লাইনটা কি ক্লিন?'

'হ্যাঁ। সকালেই চেক করা হয়েছে।'

'এ-কথা গত মিটিঙের আগেও বলেছিলেন।'

'ভুল বলিনি। তখনও আমার টেলিফোন ক্লিন-ই ছিল। রক ক্রিক পার্কের খবরটা কীভাবে ফাঁস হলো, তা বিরাট এক রহস্য। এনিওয়ে, খবর বলো।'

'আগে আপনার শরীরের অবস্থা জানতে চাই।'

'দুর্বল... হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছি। নইলে আর কোনও অসুবিধে নেই।'

'এ-কণ্ডিশনে চাপের মধ্যে ফেলতে ইচ্ছে করছে না আপনাকে, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। চিফের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি প্রমাণগুলো আপনার হাতে তুলে দিতে পরামর্শ দিয়েছেন।'

'কীসের প্রমাণ?'

ধীরে ধীরে সব খুলে বলল রানা।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এ কী শোনাচ্ছ তুমি? আমেরিকার হবু প্রেসিডেন্ট একজন ছদ্মবেশী? ফেনিসের নেতার ছেলে?'

'অবিশ্বাস্য... কিন্তু সত্যি।' শান্তগলায় বলল রানা।

'আর তুমি প্রমাণ করতে পারবে সেটা?'

'হ্যাঁ। ওগুলো আপনার হাতে পৌঁছে দিতে চাই, যাতে প্রেসিডেন্টকে দেখিয়ে সিনেটর ম্যাহোনি আর জিয়োভান্নি

গুইদেরোনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। ওদেরকে আটকানো গেলে পুরো সংগঠনের কোমর ভেঙে যাবে।'

'আমি একমত। ডেন্টাল রেকর্ডগুলো কীভাবে পাঠাচ্ছ?'

'আমার এজেন্সির স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে। গেটে বলে দিন, রানা এজেন্সির লোক এলেই যেন সরাসরি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাই দ্য ওয়ে, অ্যাডমিরাল, আশা করি বলে দিতে হবে না, প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার আগে সবকিছু গোপন রাখতে হবে আপনাকে? দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না, যত ঘনিষ্ঠ... যত আপন-ই হোক না কেন।'

'জানি। কখন পাঠাচ্ছ জিনিসগুলো?'

'যত দ্রুত সম্ভব। রাতের মধ্যে, বা কাল সকালে পেয়ে যাবেন হাতে। এখন তা হলে রাখি, স্যর।'

'ওকে, রানা। আমি অপেক্ষায় রইলাম।'

কথা শেষ করে হোটেলের লবি থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ আনাল রানা। ওটায় ভরল সমস্ত এক্স-রে এবং কাগজপত্র। মুখ বন্ধ করে উপরে ঠিকানা লিখল অ্যাডমিরালের। এক্স-রে-গুলো কপি করে রাখবে কি না, ভাবল একবার; পরে আবার চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এ-ধরনের কেসে কপি-র কোনও মূল্য নেই। আসল এক্স-রে ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না আদালতে। তা ছাড়া কপি দেখিয়ে বোকাও বানানো যাবে না জিয়োভান্নি গুইদেরোনিকে। পরীক্ষা করলেই আসল-নকল ধরে ফেলতে পারবে সে।

হাতের কাজ শেষ করে কুয়াশা আর সোনিয়ার কথা ভাবতে বসল রানা। এবার ওদেরকে উদ্ধার করা দরকার। আর সেজন্যে ছোট্ট একটা চাল দিতে হবে ওকে। বড় করে কয়েকবার শ্বাস নিল ও, তারপর তুলে নিল রিসিভার। দ্বিতীয়বারের মত ফোন করল

ওয়াশিংটনে। তবে এবার অন্য নাম্বারে।

'সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি'স অফিস।' শোনা গেল সুরেলা কণ্ঠ।

'সিনেটর কি আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'এক্সকিউজ মি, কী ব্যাপারে কথা বলবেন, জানতে পারি? সবার কল সিনেটরের কাছে ফরওয়ার্ড করি না আমরা।'

'ওঁকে শুধু আমার নাম বলুন। তা হলে বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।'

'হোল্ড অন, প্লিজ।'

দু'মিনিটের মত নীরব রইল লাইন। তারপরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির বিখ্যাত কণ্ঠ।

'হ্যালো? কে বলছেন?'

হালকা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ওর নাম শুনে ফোন ধরেছে লোকটা—এ থেকে প্রমাণ হয় অনেককিছু।

শীতল গলায় বলল, 'সুইটজারল্যাণ্ডের কল দ্যু পিলঁ গ্রামে একটা কবর আছে। কিন্তু ওটার ফলকে যার নাম, কফিনে সে-লোক নেই।'

আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর ক্ষণিকের নীরবতা। শেষ পর্যন্ত আবার যখন কথা বলল সিনেটর, কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে। 'ক্...কে বলছেন? কে আপনি?'

'আমাকে আপনি চেনেন, মাসিমো।'

'স্টপ ইট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিনেটর।

'বেশ, নাম উচ্চারণ করব না। কিন্তু আমাকে না-চেনার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মনে হয় না রাখাল বালক তার ছেলের কাছে কোনও কিছু গোপন করে।'

'না-আ! এসব শুনতে চাই না আমি...'

'শুনতে আপনাকে হবে, সিনেটর!' কড়া গলায় বলল রানা। 'খবরদার, লাইন কাটবার চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে। চুপ করে শুনুন আমার কথা। ছোটবেলায় অ্যাণ্ডোভারের এক ডেন্টিস্টের কাছে যেতেন আপনি আর আপনার বন্ধু। ওখানে আপনাদের দাঁতের এক্স-রে করা হয়েছিল, সেই ফিল্ম এখন আমার হাতে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, গতকাল আপনার বর্তমান ডেন্টিস্টের কাছ থেকেও ফাইল নিয়ে এসেছে একদল লোক। ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালে গেলে দেখবেন, ওদের আর্কাইভ থেকে গায়েব হয়ে গেছে ডেভিড ম্যাহোনির অ্যাকসিডেন্ট-পরবর্তী ডেন্টাল এক্স-রের ফিল্ম। সব এখন আমার কবজায়।'

গোঙানি ভেসে এল ইয়ারপিসে।

'শুনতে থাকুন, সিনেটর,' নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলল রানা। 'কুয়াশা আর সোনিয়া যদি বেঁচে থাকে, আপনার কিছুটা আশা আছে। মরে গেলে আপনিও শেষ। মাটির সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দেব আমি। বুঝতে পেরেছেন?'

ভাষা খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল মাসিমো গুইদেরোনির। শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'প্লিজ... বোকামি কোরো না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা...'

'শুনতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তার আগে আগে মুক্তি দিতে হবে আমার বন্ধুদেরকে।'

'এক্স-রে-গুলো?'

'ওদের বিনিময়ে সেগুলো আপনাদের হাতে তুলে দেব আমি।'

'কীভাবে? কখন?'

'সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেব। তার আগে

আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে—আমার বন্ধুরা বেঁচে আছে... হাঁটাচলা করছে ওরা।'

'প্রমাণ?'

'হ্যাঁ। একটা ফোন নাম্বার চাই আমি, সেইসঙ্গে ওদেরকে দেখার সুযোগ। বিনকিউলার আছে আমার কাছে, দূর থেকেই দেখে নিতে পারব। বলা বাহুল্য, বস্টনে আছি আমি; সম্ভবত এ-খবর ইতিমধ্যে পেয়েছেন আপনারা। আজকের দিনটা সময় দিচ্ছি আমার প্রস্তাব ভেবে দেখবার জন্য। কাল সকালে এই নাম্বারে আবার ফোন করব আমি—আপনার জবাব জানব তখন।'

'কিন্তু আগামীকাল সকালে সিনেট অধিবেশন আছে...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মাসিমো।

'ওটা মিস করবেন আপনি,' শীতল কণ্ঠে কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

পোশাক বদলে নিল ও। বাইরে যাবে। তুহিনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনে পাঠাবে ডেন্টাল রেকর্ডগুলো। তা ছাড়া বল মাঠে গড়িয়ে গেছে, খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখার জন্যও বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে ওকে।

পরদিনের সকাল হলো মেঘলা, গুমোট পরিবেশে। আটটা বাজতে না বাজতে ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। ঘুম থেকে উঠে ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল রানা। কঠিন একটা দিন অপেক্ষা করছে সামনে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, কিছুই বলা যায় না। হয়তো বিজয়ীর বেশে কুয়াশা আর সোনিয়াকে নিয়ে ফিরবে ও, কিংবা হারিয়ে যাবে নাম-পরিচয়হীন কোনও কবরের ভিতরে। এমন পরিস্থিতি একেবারে নতুন নয় ওর জন্য, তবু প্রতিবারই বুক ঢিব ঢিব করে; অভিজ্ঞতা আর ট্রেইনিং ছাপিয়ে অস্তিত্বজুড়ে বসতে চায়

ভয়াল আতঙ্ক। ওকে মনে করিয়ে দেয়—সবকিছুর পরেও আর দশজনের মত সাধারণ একজন মানুষই ও।

ব্রেকফাস্টের পর জানালায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখল রানা, তারপর ফিরে এল টেবিলের কাছে। রাতের কাজের ফসল শোভা পাচ্ছে ওতে। বেশ কিছু ঘড়ি কিনে এনেছিল, ওগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। স্পিণ্ডলের কাছে সবক'টার মেইন-হুইলে ড্রিল করেছে, বসিয়েছে নতুন পিনিয়ন স্ক্রু। ব্যালান্স করেছে মিনিয়েচার বোল্ট। ঘড়িগুলো এখন টাইমারে পরিণত হয়েছে—ব্যাটারি টার্মিনালের সঙ্গে বেল-ওয়্যারের সংযোগের জন্য তৈরি। অ্যালার্মের কাঁটার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে ত্রিশ সেকেণ্ড থেকে বারো ঘণ্টার সময়সীমা, তারপর ওগুলো স্পার্কের সাহায্যে বিস্ফোরককে আগুন ধরিয়ে দেবে। কাল বিকেলে তুহিনের কাছ থেকে এক্সপ্লোসিভও সংগ্রহ করেছে।

সাবধানে সবকিছু একটা কাগজের কার্টনে ভরল ও। তারপর ওটা নিয়ে নেমে এল হোটেলের লবিতে। রিসেপশনিস্টকে জানাল, চেক-আউট করতে চায়। বিল রেডি করে যেন ওর কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কার্টনটা ভাড়া করা গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রেখে রুমে ফিরে এল।

ঘড়ি দেখল রানা। আটটা পঁয়ত্রিশ। তারমানে এখনও অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে পৌঁছেনি ওর প্যাকেট। রাতের ফ্লাইটে কোনও টিকেট ম্যানেজ করতে পারেনি তুহিন, তাই আজ ভোরে এজেন্সির অপারেটর শাহেদের মাধ্যমে পাঠাতে হয়েছে জিনিসটা। দশটায় ওয়াশিংটনে ল্যাণ্ড করবে ওর বিমান।

এয়ারপোর্টে ফোন করে ফ্লাইটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। বারো মিনিট দেরি করে টেকঅফ করেছে ওয়াশিংটন-গামী ফ্লাইট সিক্স-ও-টু; তবে ই.টি.এ. পরিবর্তন হয়নি। সন্তুষ্ট হলো

রানা; খুব শীঘ্রি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের হাতে পৌঁছে যাবে সব প্রমাণ। রাতে আরেক দফা কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, ডেন্টাল রেকর্ড হাতে পাবার পর কী ধরনের অ্যাকশন নেয়া হবে, সে-সব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে ওরা। আজই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি... যদি সব ঠিকমত এগোয়, তা হলে আগামীকাল সকালে অ্যারেস্ট করা হবে সিনেটর ম্যাহোনিকে; ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চালানো হবে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সমস্ত জারিজুরি তখন ফাঁস হয়ে যাবে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির। ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠবে তার বিরুদ্ধে—ফেনিসকে লড়তে হবে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে। দেখার মত একটা মজা হবে তখন।

তবে এসব ঘটার আগে... আজই উদ্ধার করতে হবে কুয়াশা আর সোনিয়াকে। কাল সকালে ওদের কোনও মূল্য থাকবে না। প্রতিশোধের নেশায় ওদের প্রাণ নিতে পারে রাখাল বালক। তাই যা করবার, করতে হবে আজই। একটা প্ল্যান এঁটেছে রানা, দেখা যাক সেটা সফল হয় কি না।

আবার ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে ন'টা। মাসিমো গুইদেরোনিকে ফোন করা যেতে পারে এখন।

আজ আর সেক্রেটারি না, লোকটা নিজেই ফোন রিসিভ করল। রানার কণ্ঠ শুনে বলল, 'জিয়োভান্নি গুইদেরোনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'রাখাল বালক স্বয়ং?' কৌতুক ফুটল রানার গলায়। 'আমার শর্ত তো বলেছি গতকাল। উনি রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল মাসিমো। 'টেলিফোন নাম্বার দেয়া হবে তোমাকে। তবে দেখাদেখির ব্যাপারটা...'

'তা হলে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা নেই আমার,

সিনেটর,' কড়া গলায় বলল রানা। 'বিদায়।'

'দাঁড়াও! ফোন রেখো না!'

'কেন? যা বলার, তা তো বলেই দিয়েছি। দূর থেকে আমার বন্ধুদেরকে দেখতে চেয়েছি বিনকিউলার দিয়ে। তাতে যদি আপনারা রাজি না থাকেন, তা হলে এখানেই আমাদের সংলাপ শেষ। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাপই যদি চিন্তা না করে, তা হলে আমার কী করার আছে!'

'না!' তড়িঘড়ি করে বলল মাসিমো। 'ঠিক আছে... ঠিক আছে। তোমার কথাই সই। দেখানো হবে তোমার বন্ধুদেরকে। ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। যখন যোগাযোগ করবে, তখন বলে দেয়া হবে—কোথায়-কখন দেখতে পাবে ওদেরকে।'

'দুঃখিত। আপনাদের ফাঁদে পা দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সময় আর জায়গা আমি ঠিক করব।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আজ বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে... ম্যাহোনি হলে ওদেরকে দেখতে চাই আমি। উত্তরদিকে, জ্যামাইকা পণ্ডের দিকটার জানালায়।'

'ম্যাহোনি হলের নাম্বারই আমি দিতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।'

না শোনার ভান করে বলে চলল রানা, 'দু'জনকে দুটো কামরায় রাখবেন। ভিতরে আলো জ্বলা চাই। হাঁটাহাঁটি করবে ওরা, কথা বলবে... সোজা কথায় ওরা যে জ্যান্ত আর সুস্থ আছে, সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনাদেরকে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো মাসিমো। 'তোমার কথামত সব অ্যারেঞ্জ করা হবে।'

'বাই দ্য ওয়ে, সিনেটর, আপনার লোকজনকে বলে দেবেন—আমাকে যেন খোঁজার চেষ্টা না করে। ধরতে পারলেও

লাভ হবে না। এক্স-রে-গুলো থাকবে না আমার সঙ্গে। বরং এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি, যাতে আমি গায়েব হলে ওগুলো পৌঁছে যায় ওয়াশিংটনে।'

'কথা দিলাম, তোমাকে খোঁজার চেষ্টা করবে না কেউ।'

'ভেরি গুড।'

'এক মিনিট, রানা! তুমি জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে কথা বলবে না?'

'বিকেলে... যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন আর কী। সাড়ে পাঁচটায় ফোন করব আমি ম্যাহোনি হলে। নাম্বার দেয়ার প্রয়োজন নেই, ওটা টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে খুঁজে নিতে পারব।'

'কিন্তু উনি এখুনি কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে।'

হাসল রানা। 'চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?'

'বি সিরিয়াস, রানা। গুইদেরোনি নিশ্চিত হতে চান, তুমি এক্স-রে-গুলোর ডুপ্লিকেট তৈরি করবে না।'

'বিশ থেকে ত্রিশ বছরের পুরনো ফিল্ম ওগুলো, ডুপ্লিকেশনের জন্য হার্ড লাইটের তলায় যদি রাখি, স্পেক্টোগ্রাফে তার চিহ্ন দেখা যাবে। হাতে পাবার পর চেক করে নিতে পারবেন। ডোন্ট ওয়ারি, খামোকা নিজের বিপদ বাড়াবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

'প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো। এখুনি কথা বলা উচিত তোমার। উনি বলেছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।'

'সবকিছুই জরুরি।'

'ভুল করছ তুমি, মাসুদ রানা। মস্ত ভুল।'

'আমাকে যদি আজ বিকেলে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তা হলে ভুলটা ধরিয়ে দেবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন গুইদেরোনি। আপনার পথও পরিষ্কার হয়ে যাবে। গুড বাই।'

কথা না বাড়িয়ে লাইন কেটে দিল রানা।

ওর ধারণাই ঠিক—ম্যাহোনি হলে বন্দি করে রাখা হয়েছে কুয়াশা আর সোনিয়াকে। সে-কারণেই ওর শর্ত দ্রুত মেনে নিয়েছে মাসিমো। জায়গাটা দুর্ভেদ্য, কাউকে লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ। উদ্ধার করাও এককথায় অসম্ভব। কিন্তু রানার কাজ হিসেবি চাল দিয়ে ওদেরকে বের করে আনা।

ডায়াল ঘুরিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে এবার রিং করল ও।

'রানা? সারারাত আমার ঘুম হয়নি।'

'অনেকেই কাল রাতে ঘুমাতে পারেনি, স্যর।'

'প্যাকেজের খবর কী?'

'রওনা হয়ে গেছে। ইস্টার্নের ফ্লাইট সিক্স-ও-টু। দশটায় ল্যাণ্ড করবে ওয়াশিংটনে।'

'হাতে বেশি সময় নেই। চার্লিকে এয়ারপোর্টে পাঠালে অসুবিধে আছে? প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে আমার, দুপুর দু'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। তার আগে এভিডেন্সগুলো স্টাডি করে নিতে চাই। চার্লি গেলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারবে।'

'ঠিক আছে, পাঠান ওকে। কিন্তু কী আনছে, সেটা বলবেন না। শুধু মেসেঞ্জারের নাম জানাবেন—শাহেদ আহমেদ।'

'ওকে। আর কিছু?'

'কুয়াশা আর সোনিয়া কোথায় আছে, তার আভাস পেয়েছি। আপনার কাছে কাগজ-কলম আছে?'

'হ্যাঁ। বলো।'

'ম্যাহোনি হলে রাখা হয়েছে ওদেরকে। ওটা বস্টনের উত্তরে, একটা পাহাড়ের চূড়ায়, জ্যামাইকা পণ্ডের উপরে। জিয়োভান্নি গুইদেরোনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সময় দেব আমি। তখনই উদ্ধার করে আনব ওদের।

আপনার সাহায্য দরকার।'

'লোকাল ল-এনফোর্সমেন্ট হলে চলবে?'

'স্পেশাল ফোর্স হলে বেশি ভাল হয়। রীতিমত একটা অভিযান চালানোর কথা ভাবছি আমি।'

'হুম। দেখি কী করা যায়। প্ল্যান অভ অ্যাকশন কী হবে?'

'সাড়ে এগারোটায় ওখানে ঢুকব আমি। তার পনেরো মিনিট পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলবে ওরা। চারদিকে যত রাস্তা আছে, সব আটকে দিতে হবে। সাবধানে কাজ করতে বলবেন ওদেরকে, ম্যাহোনি হলের সীমানায় প্রচুর গার্ড আছে। মেইন গেটে পৌঁছুনোর আগে, অ্যাপ্রোচ রোডের মাথায় একটা গার্ড পোস্ট আছে—ওটা দখল করে কমাণ্ড সেন্টার বানাতে পারবে ওরা। আর হ্যাঁ, অপারেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দিতে হবে। জ্যাম করে দিতে হবে সেলফোনেরও সিগনাল।'

'বলে যাও।'

'ঠিক সোয়া বারোটায় ম্যাহোনি হল্ থেকে বেরিয়ে আসব আমি... আশা করছি কুয়াশা আর সোনিয়াকে সহ। মেইন গেটে পৌঁছুনোর পর দাঁড় করাব গাড়ি। ওখানে দু'বার ম্যাচ জ্বালব আমি—ওটাই সঙ্কেত। গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করবে স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোরা।'

'টাইম এদিক-সেদিক হবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'খুব বেশি না। গুইদেরোনিকে জানাব, ঠিক সোয়া বারোটায় আমি যদি গেটে না পৌঁছি, আমার লোক এক্স-রে নিয়ে ফিরে যাবে ওখান থেকে।'

'কিন্তু ওগুলো তো এমনিতেও থাকছে না তোমার কাছে। ধাপ্পা দিতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাও?'

'আমার অভিনয় অত কাঁচা হবে না, স্যর। তারপরেও যদি

গোলমাল দেখা দেয়, ডাইভারশনের ব্যবস্থা থাকবে। ওদেরকে বলবেন রেডি থাকতে।'

'মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছ কিন্তু তুমি, রানা।'

'না নিয়ে উপায় নেই আমার, স্যর।'

'তা আমি জানি।'

আধঘণ্টা পর বিল মিটিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। কয়েকটা হার্ডওয়্যার স্টোর ঘুরে কিনে নিল ড্রাইসেল ব্যাটারি, প্লাস্টিক কন্টেইনার, অ্যাডহেসিভ টেপ, বেল-ওয়ায়্যারের রোল আর কালো স্প্রে-পেইন্ট। গাড়িতে বসে টাইমার, এক্সপ্লোসিভ আর সদ্য-কেনা জিনিসগুলোর সাহায্যে তৈরি করল দশটা বোমা। ঘড়ি দেখল—বারোটা চল্লিশ। টাইমারে এগারো ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের কাউন্টডাউন সেট করল—প্রতিটা দশ সেকেণ্ড পর পর বিস্ফোরিত হবে। কাজ শেষে টেপ দিয়ে মুড়ে ফেলল সবক'টা বোমা, স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে রঙ করে নিল। কার্টনে ভরে ওগুলো রেখে দিল পিছনের সিটে।

গাড়ি চালিয়ে এরপর ওয়েস্ট রক্সবিউরিতে গেল রানা। একটা পে-ফোন খুঁজে নিয়ে ডিপার্টমেন্ট অভ স্যানিটেশনে রিং করল।

'কমপ্লেইন সেকশন।' রিসিভারে শোনা গেল কর্কশ গলা।

'এক্সকিউজ মি, আমি ম্যাহোনি ড্রাইভ থেকে বলছি। একটা কমপ্লেইন লেখাতে চাই।'

'বলুন কী সমস্যা।'

'এখানকার সিউয়ারেজ লাইন বন্ধ হয়ে গেছে, ম্যান! বিষ্ঠা-আবর্জনা উপচে আমার লন ভরে যাচ্ছে।'

'কোথায় বললেন?' ত্রস্ত হয়ে উঠল ওপাশের লোকটা।

'ম্যাহোনি ড্রাইভ। বিচনাট টেরাসের কাছে। ভয়াবহ অবস্থা

এখানে! তাড়াতাড়ি একটা কিছু করুন!'

'আমরা এখুনি একটা ট্রাক পাঠাচ্ছি, স্যর।'

'প্লিজ, যত দ্রুত সম্ভব পাঠান!'

স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের সার্ভিস ট্রাক ম্যাহোনি ড্রাইভের একশো গজ দূরে পৌঁছুতেই রেইনকোট পরা একজন মানুষ বৃষ্টি ভেদ করে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দু'হাত নাড়ছে পাগলের মত। ব্রেক কষে থামল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিরক্ত গলায় জানতে চাইল, 'অ্যাই, কী হয়েছে তোমার? গাড়ি থামালে কেন?'

জবাব না দিয়ে হাতছানি দিল মানুষটা। ডাকল তাকে। বোধহয় সাহায্য চাইছে। আশপাশে তাকাল ড্রাইভার। বৃষ্টি-বাদলের কারণে রাস্তা শূন্য। কী সমস্যা হয়েছে কে জানে, বোধহয় আর কাউকে না পেয়ে থামিয়েছে তাকে লোকটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল সে, নেমে এল ট্রাক থেকে।

ড্রাইভার নাগালের মধ্যে পৌঁছুতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রেইনকোট-ধারীর শরীরে। প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকল সে অপ্রস্তুত ড্রাইভারের চোয়ালে। মাপা আঘাত, এক ঘুসিতেই কাত হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল লোকটা। আগামী কয়েক ঘণ্টা জ্ঞান ফিরবে না।

এর পনেরো মিনিট পরে ম্যাহোনি এস্টেটের প্রহরীরা লক্ষ করল, স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের একটা ট্রাক উদয় হয়েছে তাদের সামনের রাস্তায়। পঞ্চাশ গজ পর পর থামছে ওটা, ভিতর থেকে নেমে একজন লোক কী যেন করছে প্রতিটা ম্যানহোলে। সন্দেহজনক গতিবিধি, তাই স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসে ফোন করে জানতে চাইল তারা ঘটনা।

'বিচনাট আর ম্যাহোনি ড্রাইভ এলাকায় ব্লকেজের রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, স্যর,' জানানো হলো ওখান থেকে। 'আমাদের

লোক পাঠানো হয়েছে ওখানে—পুরো লাইন চেক করে দেখবার জন্য।'

এরপর ট্রাকটাকে আর সন্দেহ করল না কেউ।

রেইনকোট পরে স্যানিটেশন কর্মীর ছদ্মবেশে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রানা। তিনটে বেজে গেছে ইতিমধ্যে, শুরু হয়েছে সোনিয়া আর কুয়াশাকে দেখানোর সময়। উত্তরদিকে নজর থাকবে প্রহরীদের, বিনকিউলার হাতে কেউ আছে কি না, তা স্পট করায় ব্যস্ত থাকবে ওরা। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ও।

ম্যাহোনি ড্রাইভ প্রায় তিনশো গজ দীর্ঘ। সবমিলিয়ে গোটাবিশেক ম্যানহোল আছে ওতে। প্রতিটার সামনে ট্রাক থামাচ্ছে রানা, টুলকিট আর হোসপাইপ নিয়ে নামছে সুয়ারেজ লাইনের ভিতরে; বাছাই করা দশটার ভিতরে গুঁজে দিচ্ছে হাতে তৈরি বোমাগুলো।

কাজ যখন শেষ হলো, তখন চারটে বাইশ বাজে ঘড়িতে। ট্রাক নিয়ে বিচনাট টেরাসে ফিরে এল ও। গালে চাপড় দিয়ে জ্ঞান ফেরাল ড্রাইভারের। তাকে ড্রাইভিং ক্যাবের ভিতরেই ফেলে রেখেছিল ও।

'ক্... কী হয়েছে?' চোখ মেলেই রানাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল লোকটা।

'কিছু না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিছুটা সময়ের জন্য তোমার ট্রাকটা ধার নিয়েছিলাম, এখন ফেরত দিচ্ছি। কিছু খোয়া যায়নি তোমার, কোনও ক্ষতিও হয়নি। আর হ্যাঁ, সুয়ারেজ লাইনে কোনও সমস্যা নেই। আমি চেক করে দেখেছি।'

'তুমি পাগল!' রাগী গলায় বলল ড্রাইভার।

পকেট থেকে একশো ডলারের পাঁচটা নোট বের করল রানা।

বলল, 'আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হতে পারে, তবে তোমার অসুবিধার জন্য কিছু টাকা দিতে চাই আমি। পাঁচশো ডলার। একটাই শর্ত, কাউকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। যদি বলো, তোমাকে খুঁজে বের করব আমি।'

থতমত খেয়ে গেল ড্রাইভার। 'পাঁচশো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভাল করে ভেবে দেখো, চোয়ালে একটু ব্যথা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি তোমার। মাঝখান থেকে পাঁচশো ডলার আয় করছ মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে।'

'তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, মিস্টার?'

'দেখো, তোমাকে বোঝানোর সময় নেই আমার হাতে,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'টাকাটা নেবে কি নেবে না?'

লোভের কাছে হার মানল লোকটা। হাত বাড়িয়ে নিল পাঁচশো ডলার।

নির্ধারিত সময় শেষ হবার ঠিক তিন মিনিট আগে ওদেরকে দেখল রানা। ম্যাহোনি হলের উত্তরদিকে আরেকটা উঁচু বিল্ডিং খুঁজে পেতে সময় নষ্ট হয়েছে ওর। ছাত থেকে বিনকিউলার দিয়ে তাকাল দুর্গপ্রতিম বাড়িটার দিকে। দোতলার আলোকিত জানালায় প্রথমেই দেখল কুয়াশাকে। বাঙালি বিজ্ঞানীর চেহারা বদলে গেছে—মুখের একটা পাশ ঢাকা পড়ে আছে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজে, শার্টের বুকের যে-টুকু খোলা—সেখানেও একই দশা। শারীরিক অত্যাচারের স্পষ্ট আলামত। তবে বেঁচে আছে সে, গাঁট্টাগোঁট্টা একজন প্রহরীর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে কামরার ভিতরে। মহৎ মানুষটার এই অবস্থা দেখে ক্রোধ অনুভব করল রানা।

আস্তে আস্তে বিনকিউলার ঘোরাল ও। পরমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড একটা বিট মিস করে গেল। ওই তো, জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে

সোনিয়া। সুন্দর মুখটা আতঙ্কে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বেচারি এদিক-সেদিক; রানাকেই খুঁজছে সম্ভবত। বোঝা গেল ওর উপর তেমন একটা অত্যাচার চালানো হয়নি। অন্তত শরীরের যে-টুকু দৃশ্যমান, সেখানে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা টিকে থাকো তোমরা, কুয়াশা... সোনিয়া,' বিড়বিড় করল রানা। 'আসছি আমি।'

এরপরেই বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

বিশ

'তুমি সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল মাসিমো গুইদেরোনি। আগের চেয়ে অনেকটাই শান্ত তার কণ্ঠ। উদ্বেগ থাকলেও তা দমিয়ে রেখেছে।

রাস্তার পাশের একটা ফোনবুদ থেকে সিনেটরকে রিং করেছে রানা। ম্যাহোনি হল থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

মাসিমোর প্রশ্নের জবাব দিল না ও। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কুয়াশা কতটা আহত?'

'রক্ত হারিয়েছে ও। দুর্বল।'

'তা আমি দেখেছি। চলাফেরা করতে পারবে?'

'হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে... যদি ওটাই জানতে চাও আর কী।'

'হ্যাঁ, সেটাই জানতে চেয়েছি। কুয়াশা আর সোনিয়াকে

গাড়িতে তুলে ম্যাহোনি হল্ থেকে বেরিয়ে আসব আমি। গেট দিয়ে বের হয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেব এক্স-রে-গুলো।'

'জিয়োভান্নি গুইদেরোনির সঙ্গে দেখা করবার কথা তোমার।'

'তাও করব। আমার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন জমা হয়েছে। সেগুলোর জবাব পাওয়া দরকার।'

'পাবে। কখন দেখা করবে?'

'রিটজ্ কার্লটনে আপনাদের নির্দেশ মোতাবেক ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। সোমনাথ চ্যাটার্জি... মনে আছে? আজই উঠব। মি. গুইদেরোনিকে বলবেন, ওখানে যেন ফোন করেন আমাকে। সাবধান করে দিচ্ছি, সিনেটর, শুধুই ফোন... সৈন্য-সামন্ত বা গুণ্ডা-পাণ্ডা নয়। রিটজ্ কার্লটনে এক্স-রে নিয়ে উঠব না আমি।'

'তা হলে কোথায় রাখছ ওগুলো?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। পাশের বুদে ঢুকে ফোন করল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে। ইতিমধ্যে ডেন্টাল রেকর্ডগুলো পেয়ে গেছেন তিনি। কাজ কতটা এগোল, তা জানা প্রয়োজন। রাতের অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে।

অ্যাডমিরাল না, ফোন ধরল চার্লি। জানাল, 'মি. রানা, অ্যাডমিরাল এখনও হোয়াইট হাউসে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার ফোন এলে রিসিভ করার জন্য। একটা মেসেজ দিয়েছেন—সব ঠিকঠাক আছে। তিনটে সময় বলেছেনঃ সাড়ে এগারোটা, পৌনে বারোটা আর সোয়া বারোটা। ওগুলো ফাইনাল তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, চার্লি।'

ফোনবুদ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ল রানা। এক টুকরো হলুদ কাগজ নিয়ে তাতে মার্কার দিয়ে বড় বড় করে একটা মেসেজ

লিখল, সেটা ভরল একটা ম্যানিলা এনভেলাপে। ওটা নিয়ে চলে গেল নিউবেরি স্ট্রিটে। ফোনবুদের ডিরেক্টরি থেকে একটা মেসেঞ্জার সার্ভিসের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। খুঁজে বের করল ওটা।

শুকনোমত এক মহিলা বসে আছে ফ্রন্ট ডেস্কে। তার সামনে গিয়ে পুলিশের একটা ভুয়া পরিচয়পত্র দেখাল রানা। বলল, 'আমি বস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি—ইন্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন সেকশন।'

'পুলিশ?' আঁতকে উঠল মহিলা। 'হা যিশু! এখানে তো কোনও...'

'রিল্যাক্স, ম্যা'ম। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আমরা একটা মহড়া দিচ্ছি। যে-কোনও ইমার্জেন্সিতে পুলিশের রেসপন্স কেমন, তা পরীক্ষা করে দেখব। তাই আজ রাতে এই এনভেলাপটা পৌঁছে দিতে হবে বয়েলস্টোন স্টেশনে। এটা পাবার পর থেকে শুরু হবে রিঅ্যাকশন টাইমের হিসাব। পারবেন আপনারা?'

'নিশ্চয়ই, অফিসার।'

'গুড। চার্জ কত পড়বে?'

'তার দরকার হবে না, অফিসার। নাগরিক হিসেবে পুলিশকে এটুকু সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু ফ্রি সার্ভিস নিতে পারব না আমরা। তা ছাড়া অফিশিয়াল রেকর্ডের জন্য এখানকার রিসিট আর আপনার নাম দরকার হবে।'

'ঠিক আছে। আমার নাম এডিথ হ্যালোরান। আর নাইট ডেলিভারির জন্য লোকাল এরিয়ায় আমরা দশ ডলার নিই।'

পকেট থেকে টাকা বের করে দিল রানা। 'রিসিট দিন আমাকে। আর হ্যাঁ... ডেলিভারিটা হতে হবে আজ রাত পৌনে

এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। লিখে রাখুন। টাইমিংটা খুব ইম্পরট্যান্ট। আপনি ওটা নিশ্চিত করবেন তো?'

'অবশ্যই। আমি নিজেই ডেলিভারি দিয়ে আসব। বারোটা পর্যন্ত এমনিতেই আমার শিফট কিনা!'

'ধন্যবাদ, এডিথ।'

'ইটস্ মাই প্লেজার,' হাসল মহিলা।

রাত ন'টা বিশে হোটেল রিটজ্ কার্লটনের লবিতে ঢুকল রানা। রিসেপশনে সোমনাথ চ্যাটার্জির নাম বলতেই রুমের চাবি পাওয়া গেল। এলিভেটরের দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একজন পোর্টার।

'এক্সকিউজ মি. মি. চ্যাটার্জি... একটা মেসেজ আছে আপনার জন্য।'

পোর্টারের হাত থেকে একটা খাম নিল রানা। ওটা খুলতে খুলতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাচাই করল লোকটার মুখ। ভাবলেশহীন; নিম্নআয়ের একজন মানুষের মধ্যে যতটা বিনয় থাকা উচিত, তা লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফেনিসের লোক সম্ভবত। শার্ট খুললে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে বৃত্তাকার উল্কির।

খামের ভিতর থেকে একটা চিরকুট বেরুল। তাতে একটা ফোন নম্বর। কাগজটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ফেলল রানা।

'কোনও সমস্যা?' ভুরু কোঁচকাল পোর্টার।

হাসল রানা। 'তোমার বসকে গিয়ে বলো, নম্বর দেখে ফোন করি না আমি নাম দেখে করি। যাও, ভাগো!'

হতভম্ব লোকটাকে পিছনে ফেলে এলিভেটরে উঠল ও। নামল ছ'তলায়। স্যুইটে গিয়ে রুম সার্ভিসের মাধ্যমে ডিনারের অর্ডার দিল।

খাওয়াদাওয়া করছে ও, এমন সময় বাজতে শুরু করল স্যুইটের ফোন। ধরল না রানা, তাড়াহুড়োও করল না। ধীরে-সুস্থে ডিনার শেষ করল, সিগারেট ধরাল। শেষ পর্যন্ত যখন তৃতীয়বারের মত চিৎকার শুরু করল যন্ত্রটা, তখনই রিসিভার তুলল ও।

'হ্যালো?'

'তুমি একটা গোঁয়ার লোক, মাসুদ রানা!' গমগম করে উঠল চড়া, ভারী কণ্ঠ। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে কেন তুলনা করা হয়, বুঝতে অসুবিধে হলো না। আসলেই গলার স্বরে দুরন্ত ঝঞ্ঝার তেজ মিশে আছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির।

হাসল রানা। 'তা হলে ভুল করিনি আমি? ওই পোর্টার আসলে রিটজ কার্লটনের কর্মচারী নয়, বুকের মাঝখানে উল্কিকরা একটা চক্কোর আছে ওর!'

'ওই চক্র আমাদের গর্ব, মিস্টার। যারা ওই চিহ্ন ধারণ করছে, তাদেরকে ছোট করে দেখো না। অসাধারণ একদল নারী-পুরুষ ওরা, আমাদের অসাধারণ লক্ষ্যের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে।'

'আরেকটা নাম আছে এদের—সুইসাইডাল ম্যানিয়াক,' বিদ্রূপ করল রানা। 'কোত্থেকে জোগাড় করেন এ-সব পাগল-ছাগল? কোনও মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করেছেন বুঝি?'

রেগে গেলেও, গলার স্বরে কিছু বোঝা গেল না। শান্ত কণ্ঠে গুইদেরোনি বলল, 'যত ঠাট্টাই করো, তাতে সত্যটা বদলাবে না, রানা। ধর্ম আর আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে অতীতেও ছিল, আজও আছে।'

'কাদের কথা বলছেন? হাসাসিন? শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ্‌র খুনি গোত্র?'

'আই সি! পাদ্রোনির ব্যাপারে স্টাডি করেছ তুমি!'

'খুবই নিবিড়ভাবে।'

'স্বীকার করছি, হাসাসিনদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল দিক দিয়ে অনেক মিল আছে আমাদের। কিন্তু আল্টিমেট গোল সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'বিশ্বজয়? মানবজাতির উপর প্রভুত্ব? হাহ্!'

'এসব নিয়ে টেলিফোনে আপনার সঙ্গে তর্কে নামতে চাই না আমি,' বিরস গলায় বলল রাখাল বালক। 'দেখা হওয়া প্রয়োজন আমাদের। একটা গাড়ি পাঠাব?'

'না, ধন্যবাদ।'

'কাম অন, একরোখামির কোনও দরকার নেই।'

'একরোখা নই আমি, সতর্ক। চাইলে ভীরুও বলতে পারেন। কিন্তু নিজস্ব একটা শিডিউল আছে আমার, সেই অনুসারে দেখা করব আপনার সঙ্গে। ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় আসব। যত বক্তৃতা দিতে চান, দিতে পারবেন তখন। সোয়া বারোটায় আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে বেরিয়ে আসব। একটা সঙ্কেত দেয়া হবে, আমরা গাড়িসহ্ গেটে পৌঁছুলে এক্স-রে-গুলো চলে আসবে ওখানে। ওগুলো গার্ডের হাতে দিয়ে চলে যাব আমরা। এই-ই আমার প্ল্যান, মি. গুইদেরোনি। সামান্য যদি এদিক-সেদিক হয়, চিরকালের মত এক্স-রে-গুলো হারাবেন আপনি। ওগুলো উদয় হবে অন্য কোনও বিশেষ জায়গায়।'

'কিন্তু জিনিসগুলো পরীক্ষা করার অধিকার আছে আমাদের!' প্রতিবাদ করল রাখাল বালক। 'অ্যাকিউরেসি আর স্পেক্ট্রো-অ্যানালিসিসের জন্য সময় দরকার!'

ঢোঁক গিলেছে লোকটা। মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ইতস্তত করবার অভিনয় করল ও। বলল, 'যুক্তি আছে আপনার কথায়। ঠিক আছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জাম গেটে রাখার ব্যবস্থা

করুন। ভেরিফিকেশনে চার-পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। ততক্ষণ ওখানে দাঁড়াব আমরা। তবে হ্যাঁ... গেট ওই সময় খোলা রাখতে হবে।'

'আমি রাজি।'

মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো রানার। পাঁচ মিনিট খোলা থাকবে গেট, এস্টেটের ভিতরে কমাণ্ডো ঢোকানোর জন্য সময়টা যথেষ্ট-র চেয়েও বেশি।

'বাই দ্য ওয়ে,' রানা বলল, 'আপনার ছেলেকে যা বলেছি, তা সত্যি...'

'আশা করি তুমি সিনেটর ম্যাহোনির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ওঁকে তো বলেছি, এক্স-রে-গুলো ইন্ট্যাক্ট অবস্থায় পাবেন আপনারা। কপি-টপি তৈরি করে বিপদ বাড়াবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তোমার এই অ্যারেঞ্জমেন্টে একটা গলদ চোখে পড়ছে আমার।'

'গলদ?'

'হুঁ। সাড়ে এগারোটা থেকে সোয়া বারোটা... মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আমাদের আলাপের জন্য সময়টা মোটেই যথেষ্ট নয়।'

'আপাতত তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'যদি দ্বিতীয়বার কথা বলবার খায়েশ জাগে আমার মনে, আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা তো জানা থাকছেই। তাই না?'

খনখনে গলায় হেসে উঠল রাখাল বালক। 'অবশ্যই! সো সিম্পল! তুমি দেখছি খুব যুক্তিবাদী মানুষ, রানা।'

'চেষ্টা করি আর কী। সাড়ে এগারোটায় দেখা হচ্ছে তা হলে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। মূর্তির মত বসে রইল কিছুক্ষণ।

এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, প্রস্তুতিপর্ব এত সহজে সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত পদক্ষেপের জন্য রয়েছে ব্যাকআপ... সমস্ত ব্যাকআপের জন্যও রয়েছে বিকল্প। রাতের অভিযানের জন্য এখন পুরোপুরি তৈরি ও।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা ঊনত্রিশে গাড়ি নিয়ে ম্যাহোনি হলের মেইন গেটে পৌঁছুল রানা। হর্ন বাজাতেই খুলে গেল পাল্লা, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়াতে হলো গার্ড পোস্টের পাশে। টর্চের আলো ফেলে ওর চেহারা দেখল ইউনিফর্মধারী একজন লোক, তারপর হাতের ইশারায় সামনে এগোবার নির্দেশ দিল।

এস্টেটের বিশাল লনের মাঝ দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা রাস্তা, ওটা ধরে বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে পৌঁছুল। বিশাল গ্যারাজটার দরজা খোলা; পেরুনোর সময় কৌতূহলী দৃষ্টি দিল ও, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—ভিতরে অনেকগুলো লিমাজিন দাঁড়িয়ে আছে, সংখ্যায় পনেরোটার কম নয়। ধোপদুরস্ত শোফাররা রয়েছে কাছাকাছি, গল্পগুজবে মত্ত। সম্ভবত পরস্পরের পরিচিত তারা। ভুরু কোঁচকাল রানা। অতিথি রয়েছে ম্যাহোনি হলে? কারা?

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল বিশাল বাড়িটার উপর চোখ পড়ায়। কাছ থেকে এখন ম্যাহোনি হলকে দেখতে পাচ্ছে ও। একই সঙ্গে ভয় এবং শ্রদ্ধা জাগাবার মত চেহারা। কালো আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে সগর্ব ভঙ্গিতে। মিসেস ম্যাহোনির কথাই ঠিক, এখান থেকে পুরো বস্টন নগরী দেখা যায়। দেয়ালের ওপারে, দূরে মিটমিট করছে ব্যস্ত নগরীর শত-সহস্র বাতি। পাহাড়ের মাথায় বসা ম্যাহোনি হল্ যেন রাজপ্রাসাদ, অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলছে সাধারণ জনপদের দিকে।

পোর্চের তলায় পৌঁছুলে অস্ত্রধারী দু'জন লোক এগিয়ে এল।

রানা গাড়ি থেকে নামতেই উল্টো ঘুরবার ইশারা করল। পা ফাঁক করে, গাড়ির হুডের উপর দু'হাত মেলে দাঁড়াতে হলো ওকে। দক্ষ হাতে চালানো হলো শরীরতল্লাশি। মান-ইজ্জতের ধার ধারল না, অস্ত্র লুকানোর মত যত জায়গা আছে, সব আঁতিপাঁতি করে খুঁজল তারা। কিছু আনেনি রানা, তাই রেহাই পেল মিনিটদুই পর। এসকর্ট করে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ির ভিতরে।

ম্যাহোনি হলের অভ্যন্তরে পা রেখে টের পেল রানা, কেন এ-বাড়িটা কিনে নিয়েছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। স্টেয়ারকেস, ট্যাপেস্ট্রি আর ঝাড়বাতি মিলিয়ে শুধু হলঘরের সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এ-ধরনের কাঠামো আর একটামাত্র জায়গায় দেখেছে রানা—পোর্তো ভেচিয়োয়... ভিলা বারেমির পোড়া ধ্বংসস্তূপে। ও-রকম একটা আবাসে থাকতে চাইবে রাখাল বালক, এটাই তো স্বাভাবিক।

'এ-দিকে আসুন, প্লিজ।' হলঘরের পাশে একটা দরজা খুলে ধরল গার্ড। 'তিন মিনিট পাবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরায় ঢুকল রানা, দেখতে পেল সোনিয়া আর কুয়াশাকে। ছোট একটা খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানীকে—বিকেলে যা দেখেছিল, তারচেয়েও খারাপ অবস্থা; পুরো শরীর এখন রক্তে ভেজা। বোঝা গেল, খুব বেশিক্ষণ হয়নি আরেকদফা অত্যাচার চালানো হয়েছে তার উপর। সোনিয়া পাশে বসে শুশ্রূষা করছিল ওর, দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল মেয়েটা, তারপরই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল রানাকে। ফিসফিস করে উচ্চারণ করছে ওর নাম, চোখে নামছে অশ্রুর অঝোর ধারা। ফোঁপানোর সময় কেঁপে উঠছে সারা দেহ।

'শান্ত হও,' ওর কপালে আলতো চুমো দিয়ে বলল রানা। 'আমি এসে গেছি। একটু পরেই তোমাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যাব, কিচ্ছু ভেবো না।'

নিজেকে সামলে নিল সোনিয়া। হাত ধরে টানল রানাকে। 'এদিকে এসো। কুয়াশা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কাছে যেতেই বুক টনটন করে উঠল রানার। ভয়াবহ অবস্থা কুয়াশার। মারের চোটে চোখদুটো বুজে গেছে প্রায়, মুখের একপাশে চামড়া বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই আর। দগদগ করছে ঘা। ব্যাণ্ডেজের তলায় কী অবস্থা, কে জানে। শ্বাস টানছে খুব কষ্ট করে। দ্রুত হাসপাতালে নিতে না পারলে ওকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। অব্যক্ত ক্রোধে দাঁত পিষল রানা।

রানাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠল কুয়াশা, ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুল না গলা দিয়ে।

'কথা বলবার দরকার নেই, বিশ্রাম নিন আপনি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'কষ্ট করে আর ঘণ্টাখানেক টিকে থাকুন, কুয়াশা। এরপরই হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন আপনি। আমি কথা দিচ্ছি।' সোনিয়ার দিকে ফিরল ও। 'এসব ঘটল কী করে? বিকেলেও দেখেছি ওঁকে... এত খারাপ অবস্থা ছিল না।'

'আধঘণ্টা আগে উপরতলা থেকে এখানে আনা হয়েছে আমাদেরকে,' জানাল সোনিয়া। 'সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কী যেন ভূত চাপল মি. কুয়াশার মাথায়... ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক গার্ডের উপর। তাকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে নামলেন নীচে। টুঁটি চেপে ধরেছিলেন লোকটার। অন্য গার্ডরা পিছন থেকে লাথি-গুঁতো আর রাইফেলের বাট দিয়ে যত আঘাতই করল, কিছুতেই ছাড়লেন না; গলা টিপে একেবারে খুনই করে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে ওঁর

নিজের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে গেছে... দেখতেই পাচ্ছ।'

'এ-রকম পাগলামির মানে কী?' বিস্মিত দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল কুয়াশা। কানে কানে কিছু বলতে চায়। রানা তার শরীরের উপর ঝুঁকতেই চাদরের তলা থেকে কী যেন একটা বের করে আনল, গুঁজে দিল কোমরে। চমকে উঠল রানা। একটা পিস্তল! এবার বুঝল কুয়াশার ওই কাণ্ড ঘটানোর কারণ। মরা গার্ডের হোলস্টার থেকে হাতসাফাই করে অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছে সে।

'আপনি একটা জিনিয়াস, কুয়াশা,' নিচুগলায় বলল রানা।

ব্যথাতুর একটা হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে। অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা... সবাই... আজ এখানে, রানা। এই সুযোগ... নষ্ট করা... যাবে না।'

'কাদের কথা বলছেন?'

'কাউন্সিল...'

'ফেনিসের কাউন্সিল?'

মাথা একটু ঝোঁকাল কুয়াশা। ঠোঁটের কাছে দুটো আঙুল তুলল।

'সিগারেট চাইছেন?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল রানা।

সিগারেট নিল না কুয়াশা, শুধু দেশলাই। মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল বাক্সটা।

দরজা খুলে গেল ঝট্ করে। গার্ড ফিরে এসেছে। কর্কশ গলায় বলল, 'সময় শেষ। মি. গুইদেরোনি অপেক্ষা করছেন।'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল রানা। উল্টো ঘোরার আগে ওভারকোটের তলায় ভাল করে লুকাল পিস্তলটা। সোনিয়াকে বলল,

'তৈরি থেকো। খুব শীঘ্রি তোমাদের নেবার জন্য ফিরে আসব আমি।'

বৃহদায়তন লাইব্রেরির একটা বড় ডেস্কের পিছনে বসে আছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাথাভর্তি সাদা চুল। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পঁচাশি বছর বয়স, অথচ এখনও কাঠামোটা লাইটপোস্টের মত ঋজু। গলার চামড়া শুধু সামান্য ঝুলে পড়েছে, চেহারায় বলিরেখা নেই বললেই চলে। হাবভাবে মনে হলো, দুনিয়ার সবাইকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

রানাকে দেখে চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রাখাল বালকের মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওয়েলকাম টু ম্যাহোনি হল্, মি. মাসুদ রানা। শিডিউলটার ব্যাপারে আরেকটু ভেবে দেখবে নাকি? চল্লিশ মিনিট বড্ড কম সময়। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

'পরে কখনও শুনব,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'আজকের শিডিউল নড়চড় হবে না।'

'আই সি!' চেয়ারে বসে পড়ল গুইদেরোনি। রানাকেও ইশারা করল বসতে। 'আমাকে বিশ্বাস করছ না তুমি।'

বসল রানা। বাঁকা সুরে বলল, 'করা কি উচিত? ফেনিসের চরিত্র সম্পর্কে জানা আছে আমার।'

'তা তো জানবেই। প্রায় চারদিন পেয়েছি আমরা কুয়াশাকে ইন্টারোগেট করবার জন্য। প্রথমে মুখ খোলেনি, তবে কেমিক্যাল ইনজেক্ট করার পর গড়গড় করে বলে দিয়েছে সবকিছু। বড় বড় বেশ ক'টা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সংগঠনের কানেকশন খুঁজে পেয়েছ তোমরা। ধারণা করছ, ওদের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন টেরোরিস্ট গ্রুপের খরচ জোগাচ্ছি আমরা। তাই না? ভুল হয়নি তোমাদের। খুব কম ফ্যানাটিক দলই আমাদের

সাহায্যের কথা অস্বীকার করতে পারবে।'

'আশা করি একটা পরিকল্পনা আছে আপনাদের? শুধু বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দুনিয়া জয় করা যায় না।'

'এখানেই তুমি ভুল করছ, রানা।' হাসল গুইদেরোনি। 'পুরনো একটা কাঠামোর জায়গায় নতুন কাঠামো তৈরি করতে চাইলে প্রথমে কী করতে হয়? আগেরটা ভেঙে ফেলতে হয়... ঠিক?' সামনে ঝুঁকল একটু। 'পৃথিবীর বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য টেরোরিজমের চেয়ে ভাল পথ আর দ্বিতীয়টি নেই। সন্ত্রাসের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলব আমরা। বেঁচে থাকা যখন কঠিন হয়ে উঠবে, তখন সাধারণ মানুষ নেমে আসবে রাস্তায়—অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। কীভাবে ঠেকাবে ওদেরকে সরকার? নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার দিয়ে? সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে? না, রানা, পদত্যাগ করতে হবে ওদেরকে। ছেড়ে দিতে হবে ক্ষমতা। আর তখনই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের জায়গায় আসবে যুক্তিবাদীরা। সন্ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা হটিয়ে ফিরিয়ে আনবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি।'

'যুক্তিবাদী?'

'এগজ্যাক্টলি,' মাথা ঝাঁকাল রাখাল বালক। 'আজকের যুগে বর্তমান সরকার-ব্যবস্থা অচল, রানা। মানবজাতির পুরো ইতিহাস-জুড়ে ওটা যেভাবে চলেছে, সেভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। যদি চলে, তা হলে এই গ্রহ আগামী শতাব্দীর মুখ দেখবে না। সরকার বলতে আমরা যা বুঝি, তাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে।'

'কী দিয়ে?'

'যুক্তিবাদী... দার্শনিক-সম্রাটদের একটি নতুন জাতি দিয়ে। এমন সব মানুষ, যারা প্রগতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; জানে, কী অমিত

সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এ-গ্রহের সম্পদ, প্রযুক্তি আর উৎপাদন-ক্ষমতার মাঝে। কারও ধর্ম-বর্ণ বা জন্মগত শিকড় নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা, মাথা ঘামায় শুধু যোগ্যতা নিয়ে—পৃথিবী নামের এই বিশাল বাজারকে চালাবার জন্য কার কতখানি অবদান, সেটা নিয়ে!'

'মাই গড! আপনি কর্পোরেট ব্যবসার কথা বলছেন!'

'তাতে কোনও সমস্যা আছে? কর্পোরেট স্ট্রাকচারের চেয়ে কার্যকর আর কোনও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়ায়? নিজেই ভেবে দেখো, শাসনক্ষমতা যদি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়; তারা যদি বিশাল এক কোম্পানির মত চালাতে শুরু করে পৃথিবীকে—কতখানি বাড়বে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি! অপচয় বন্ধ হবে... বন্ধ হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর সরকারি দুর্নীতি। তেল দেয়া একটা মেশিনের মত চলবে শাসনযন্ত্র, প্রগতি আর উন্নতির শিখরে উঠতে পারব আমরা।'

'থিয়োরি হিসেবে মন্দ নয়,' মন্তব্য করল রানা। 'তবে... শুধুই থিয়োরি।'

'হতাশ হলাম, রানা,' বিতৃষ্ণা ফুটল গুইদেরোনির চেহারায়। 'ভেবেছিলাম আর কেউ না হোক, তুমি বুঝবে আমাদের আদর্শ আর তার প্রয়োজনীয়তা। যে-দেশ থেকে এসেছ, মানে বাংলাদেশের কথা বলছি, সেটা ব্যর্থ শাসন-ব্যবস্থার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।'

'কিন্তু ওই দেশে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারছি আমি।'

'স্বাধীনতা? ওটা আমাদের সিস্টেমেও থাকবে। প্রতিটা মানুষ সমান সুযোগ পাবে তার সুপ্ত প্রতিভা আর প্রোডাক্টিভিটিকে জাগিয়ে তোলার জন্য। যে যত সাফল্য দেখাবে, ততই বাড়বে তার আয় এবং স্বাধীনতা।'

'আর কেউ যদি প্রোডাক্টিভ হতে না চায়? চাহিদা যদি অল্প হয়

তার? সাফল্যের পিছনে না ছুটে যদি শুয়ে-বসে কাটাতে চায় জীবন?'

'অমন মানুষ পৃথিবীর বোঝা, রানা। তাদের স্থান হবে না আমাদের সমাজে।'

'কে দেবে সেই সিদ্ধান্ত? আপনি?'

'না। পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হবার ইচ্ছে আমার নেই। ম্যানেজমেন্ট পার্সোনেলের ট্রেইণ্ড ইউনিট থাকবে আমাদের, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দুনিয়াকে পরিচালনা করবে তারা।'

'দিবাস্বপ্ন আর কাকে বলে!' হেসে উঠল রানা।

চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল গুইদেরোনির। 'বিদ্রূপ করে তুমি শুধু সময়ই নষ্ট করছ, রানা। আমাদের সিস্টেমে কোনও গলদ নেই। দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ কোম্পানি চলছে আধুনিক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। তাদের কেউ পথে বসছে না। কারণ, ধ্বংসের পথে চলে না ওরা। হিংসাবিহীন, প্রতিযোগিতার পন্থা অবলম্বন করে। নতুন পৃথিবীও সেভাবেই চালানো হবে। সরকারের উপর আর নির্ভর করা চলে না। অস্ত্র প্রতিযোগিতা আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকাও, বুঝবে। ফোক্সওয়াগেনের সঙ্গে ক্রাইসলার কি যুদ্ধ বাধিয়েছে? পেপসি কি বোমা মেরেছে কোকা-কোলার ফ্যাক্টরিতে? পেন্টিয়াম কি হামলা করেছে অ্যাথলনের কর্মচারীদের উপর? না, মি. রানা। রক্তপাতের কোনও স্থান নেই ব্যবসাজগতে। ঠিক তা-ই প্রতিষ্ঠা করা হবে নতুন পৃথিবীতে। আমাদের একমাত্র লড়াই হবে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে। এভাবেই রক্ষা পাবে পুরো মানবজাতি। মাল্টিন্যাশনাল বিজনেস কমিউনিটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভয়াবহ প্রতিযোগিতা আছে ওখানে, আগ্রাসন আছে... কিন্তু

কোনোটাই সহিংস নয়। ব্যবসায়ীরা অস্ত্র ধরে না।'

'কিন্তু ফেনিস ধরছে। দিব্যি খুন করছে নিরীহ মানুষকে।'

'ওদের কেউই নিরীহ নয়, রানা। আমাদের সাফল্যের পথের কাঁটা, অথবা ওদের মৃত্যু আমাদের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক,' ভাষণ দেবার ঝোঁক চেপে বসেছে গুইদেরোনির মধ্যে। 'শান্তি আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য এ-মুহূর্তে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় নেই আমাদের। কী ধারণা তোমার, সরকার আর রাজনৈতিক নেতারা কি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে? ওদেরকে বাধ্য করবার জন্যই এ-পথ বেছে নিয়েছি আমরা। আমাদের কর্মকাণ্ডে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছে ওরা—একে একে হারাচ্ছে জন-সমর্থন, কিংবা করছে পদত্যাগ। সে-সব জায়গায় নিজেদের লোক বসাচ্ছি আমরা। ইটালিতে পার্লামেন্টের প্রায় বিশ শতাংশ আমাদের দখলে। জার্মানিতে বারো, জাপানে একত্রিশ, চিনে পাঁচ আর ইংল্যাণ্ডে পনেরো শতাংশ! রেড ব্রিগেড, বাদের-মেইনহফ, আল-কায়েদা বা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সাহায্য ছাড়া কি এসব সম্ভব হতো? সন্ত্রাসের প্রতিটা ঘটনায় লক্ষ্যের কাছে এক পা করে এগোচ্ছি আমরা—শান্তিময়, সুশৃঙ্খল পৃথিবীর দিকে!'

'পঁচাত্তর বছর আগে এমন দর্শন ছিল না গিলবার্তো বারেমি-র,' বলল রানা।

'খুব একটা পার্থক্য ছিল তা-ও বলা যায় না,' গুইদেরোনি বলল। 'দুর্নীতিবাজদেরকে খতম করতে চেয়েছিলেন তিনি, আজকের যুগে সে-কাজ করতে গেলে পুরো সরকার-ই ধ্বংস করে দিতে হয়। আমরা তা-ই করছি। একটা নিয়ম দেখিয়ে গেছেন তিনি—রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পথ। আমাদের সরবরাহ করা খুনিরা হত্যা আর রাহাজানির মাধ্যমে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মধ্যে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে

ধ্বংস করতে শুরু করেছে। কিন্তু পাদ্রোনির পরিকল্পনার সমাপ্তিটা ঠিক গোছানো ছিল না। সরকার ধ্বংসের পর কীভাবে ক্ষমতা দখল করা হবে, কীভাবে চালানো হবে নতুন পৃথিবীকে... ছিল না সেসবের দিক-নির্দেশনা। ওটাই খুঁজে নিয়েছি আমরা। পূর্ণতা দিয়েছি তাঁর স্বপ্নের। এখন শুধু সেটাকে সফল করবার অপেক্ষা।'

'স্বীকার করছি, আপনার কথায় যুক্তি আছে,' লোকটাকে খুশি করবার জন্য বলল রানা। 'কিছুটা কনভিন্স হয়েছি বললেও ভুল হবে না। হয়তো আরও আলাপ করব আপনার সঙ্গে... মানে, আমার বন্ধুরা মুক্তি পাবার পর।'

'আমার কথায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছ শুনে ভাল লাগছে,' হাসিমুখে বলল গুইদেরোনি, পরমুহূর্তে শীতল হয়ে গেল কণ্ঠ। 'তারচেয়েও ভাল লাগছে একজন অবিশ্বাসীর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে। রিয়েলি, রানা, খুব ভাল অভিনয় জানো তুমি।'

'অভিনয়!'

'নয়তো কী?' গর্জে উঠল রাখাল বালক। 'এসবের অংশ হতে পারতে তুমি। শুরুতে তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেও পরে আবার মত পাল্টাই আমি। রক ক্রিক পার্কের ওই ঘটনার পরে কাউন্সিলের সভা ডাকি, তাদেরকে নতুন করে তোমার আর কুয়াশার মূল্যায়নের নির্দেশ দিই। ওরা জানায়—কুয়াশা আমাদের কাজে আসবে না; কিন্তু তুমি একটা অমূল্য সম্পদ, মাসুদ রানা। তোমার সাহায্যে বড় বড় বহু সংগঠনকে হাতের মুঠোয় নিতে পারতাম আমরা। এমনকী তুমি আমাদের নিরাপত্তাও দিতে পারতে। দিনের পর দিন তাই চেষ্টা চালিয়েছি আমরা—তোমার নাগাল পেতে, তোমাকে দলে টানতে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। বড্ড ঘাড়ত্যাড়া লোক তুমি, একবার যেটা মাথায় ঢোকে, তা বের করতে চাও না। অপরিণামদর্শী আদর্শবাদী। এখনও আমাকে

ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ। না... তোমাকে বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যাবে না!'

খেপে গেছে অর্ধোন্মাদ লোকটা। রানা প্রতিক্রিয়া দেখাল না। শান্ত গলায় বলল, 'আমার ব্যাপারে যে-কোনও ধারণা পোষণ করবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে আজ এখানে এসেছি আমি, সেটা না ভুললেই ভাল করবেন।'

'হাহ্, উদ্দেশ্য?' ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল গুইদেরোনির। 'উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে তোমার। কুয়াশা আর ওই মেয়েটাকে চাও তো? পাবে। মিলন ঘটবে তোমাদের, আমি কথা দিচ্ছি। এই বাড়ি থেকেও বেরুবে... কিন্তু এরপরে দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তোমাদেরকে।'

'বোকামি করবেন না, গুইদেরোনি,' সতর্ক করল রানা। 'আপনার ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে... তবে সেটা ডেভিড ম্যাহোনির পরিচয়ে। আমাকে যদি খুন করেন, তা হলে মুখোশ খুলে যাবে তার। আসল ডেন্টাল রেকর্ডগুলো রয়েছে আমার লোকের হাতে।'

'কচু আছে তোমার হাতে!' চরম বিদ্রূপ প্রকাশ পেল গুইদেরোনির কণ্ঠে। ডেস্কের উপর রাখা ইন্টারকমের বোতাম টিপল। কাকে যেন নির্দেশ দিল, 'ওকে নিয়ে এসো ভিতরে।' মিটিমিটি হাসি নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল এরপর।

কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল লাইব্রেরির দরজা। হুইলচেয়ারে বসিয়ে একজন মানুষকে নিয়ে আসা হলো কামরার ভিতরে। সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন! প্রায়-অচেতন দশা তাঁর। কপালের একপাশে বিশ্রী একটা কালসিটে।

যে-লোক হুইলচেয়ার ঠেলছে, তাকেও ভাল করে চেনে ও।

'হ্যালো, মি. রানা!' মুচকি হেসে অভিবাদন জানাল চার্লি—নুমা চিফের শোফার-কাম-দেহরক্ষী।

একুশ

থমকে গেছে রানা, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না দৃশ্যটা। চার্লি... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দশ বছরের পুরনো শোফার... সে কীভাবে ফেনিসের লোক হয়? আচমকা ও বুঝতে পারল, রক ক্রিক পার্কে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নুমা চিফের নিরাপদ টেলিফোনে মিটিং ঠিক করবার পরও কীভাবে হাজির হয়েছিল ফেনিসের খুনিরা। চার্লিই খবর দিয়েছিল ওদেরকে।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সরোষে এগোতে শুরু করল বেঈমান শোফারের দিকে।

'খবরদার!' হুইলচেয়ারের পিছন থেকে একটা হাত তুলে আনল চার্লি। মুঠোয় ধরে রেখেছে নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক। 'যেখানে আছেন, ওখানে থাকলেই ভাল করবেন, মি. রানা।' বিনয়ের মুখোশ খসে পড়েছে তার চেহারা থেকে।

থেমে গেল রানা। তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। দাঁতে দাঁত পিষে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছ তুমি ওঁর?'

'তেমন কিছু না, পিস্তলের বাট দিয়ে সামান্য একটু আঘাত,' চার্লি বলল। 'কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না কিনা! হোয়াইট হাউসে যাবার জন্য জেদ ধরেছিলেন।'

'কবে বিক্রি হয়েছ তুমি এদের কাছে?'

চার্লির হয়ে জবাবটা দিল গুইদেরোনি। বলল, 'আমাদের আদর্শের অনুসারী হয়েছে ও, রানা। এর সঙ্গে টাকাপয়সার কোনও সম্পর্ক নেই। মেরিন সার্জেন্ট ছিল চার্লি, জানো নিশ্চয়ই? দেশের জন্য বহুবার জীবন বিপন্ন করেছে, অথচ রিটায়ার হবার পর সামান্য পেনশন ছাড়া আর কিছুই দেয়নি ওকে সরকার। অভাব-অনটনে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল... চিকিৎসার অভাবে একমাত্র সন্তান মারা গেছে ওর, এটা জানো? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমরা ওকে দলে টেনে নিই। এখানে এসে সত্যিকার আদর্শের সন্ধান পেয়েছে ও। পেয়েছে বেঁচে থাকার প্রেরণা।'

'আমার ধারণা ছিল, ওর দুর্দশার কথা জেনেই শোফারের চাকরিটা দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল,' বলল রানা।

'না, রানা। তার বহু আগেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ও। ইন ফ্যাক্ট, নুমা চিফের কাছে আমরাই পাঠিয়েছিলাম ওকে। দুঃখকষ্টের কাহিনিটা খুব কাজে লেগেছে তখন। ধীরে ধীরে অ্যাডমিরালের আস্থা অর্জন করেছে ও। তাঁর উপর দিনরাত নজর রেখেছে আমাদের হয়ে। তার সুফল তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছ!' জোরে হেসে উঠল গুইদেরোনি। 'তোমার ধাপ্পা ধরা পড়ে গেছে, রানা। মাটি হয়ে গেছে প্ল্যান-প্রোগ্রাম। ডেন্টাল রেকর্ড আর এক্স-রে-গুলো এখন আমার হাতে! ওগুলো আর কোনোদিনই পৌঁছুবে না প্রেসিডেন্টের কাছে। উদ্ধার পাবারও উপায় নেই তোমার। স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোরা আজ কেন... কোনোদিনই আসছে না ম্যাহোনি হলে।'

মনে মনে কপাল চাপড়াল রানা, পুরোপুরি ফাঁদে পড়ে গেছে। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল ওর পরিকল্পনা নিয়ে, তাই কুয়াশার কাছ থেকে পিস্তল পাবার পরও সেটা বের করার প্রয়োজন মনে করেনি।

আর এখন... চাইলেও ওটা ব্যবহার করতে পারবে না। চার্লি নিষ্কম্প হাতে অটোমেটিক তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

'আমি কথা বলব ওঁর সঙ্গে।' পিস্তলকে পরোয়া না করে সামনে বাড়ল রানা। হাঁটু গেড়ে বসল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সামনে। 'স্যর, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রানা...' দুর্বল গলায় বললেন তিনি, 'আমি দুঃখিত, রানা। কিছুই করতে পারিনি। হোয়াইট হাউসে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আমার মিটিং ক্যানসেল করেছে ওরা, তারপর ধরে নিয়ে এসেছে এখানে... প্রাইভেট একটা বিমানে। কেউ জানে না কী ঘটেছে... কেউ আসছে না সাহায্য করতে...'

'এনভেলাপটা?'

'তোমার লোক চার্লিকে চেনে, তাই ওর হাতে তুলে দিয়ে বস্টনে ফিরে গেছে। স্যরি, রানা... ওটা আমার হাতেই পৌঁছেনি!' আহত চোখে তাকালেন তিনি এক সময়ের বিশ্বস্ত শোফারের দিকে। 'আর কিছু করার নেই আমাদের, সব শেষ হয়ে গেছে...'

'কিছুই শেষ হয়নি, অ্যাডমিরাল,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'এখনও সফল হয়নি ওদের নোংরা পরিকল্পনা।'

'কিন্তু হোয়াইট হাউস দখল করতে চলেছে ওরা! আমেরিকার প্রশাসন হবে আসলে ফেনিসের প্রশাসন!'

'ওদের এই স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হবে না।'

'হবে, রানা, হবে!' গমগম করে উঠল গুইদেরোনির কণ্ঠ। 'দুনিয়াও বদলে যাবে। পৃথিবীর বুক থেকে সংঘাত আর হিংসা দূর হবে, নেমে আসবে হাজার বছরের শান্তি।'

'হাজার বছর?' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আরেক ম্যানিয়াক বলেছিল এ-কথা। রাইখ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে। কী পরিণতি হয়েছে, তা

নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না?'

'এ-ধরনের তুলনা অর্থহীন। হিটলারের সঙ্গে কোনও মিল নেই আমাদের।' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এল গুইদেরোনি। দু'চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠেছে। 'আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি তাদের নেতা বাছাই করতে পারবে, বজায় রাখতে পারবে আত্ম-পরিচয়। কিন্তু সরকার পরিচালিত হবে কোম্পানির সাহায্যে। বিশ্ববাজারে নানা ধরনের অবদান রাখার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে সংহতির।'

'আত্ম-পরিচয়?' রেগে গেল রানা। 'ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক আর কর্মচারীদের কোনও আত্ম-পরিচয় থাকে?'

'বৃহত্তর স্বার্থে কিছুটা ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে।'

'তারমানে রোবট বানাতে চান আপনি মানুষকে।'

'কিন্তু শান্তিতে থাকবে ওরা, বেঁচে থাকবে—ধুঁকে ধুঁকে মরবার চেয়ে ওটা কি অনেক ভাল নয়?'

'না। ভুল করছেন আপনি, মি. গুইদেরোনি। মস্ত ভুল। দুনিয়া রসাতলে গেলেও মানুষ কোনোদিন দাসত্ব মেনে নেবে না। বিসর্জন দেবে না নিজের সত্তা, বা স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই তোমার, মাসুদ রানা,' কঠিন হয়ে উঠল রাখাল বালকের কণ্ঠ। 'একটাই জিনিস বিসর্জন দেবে তুমি—নিজের প্রাণ।'

বেল্টে গোঁজা পিস্তলের ওজন অনুভব করছে রানা। বুঝতে পারছে, খুব শীঘ্রি ওটা বের করতে হবে ওকে। খুন হয়ে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু মরবার আগে সামনের উন্মাদটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ও। এখন শুধু সিদ্ধান্ত নেবার অপেক্ষা।

'আমাকে, বা এখানে বন্দি অন্যদেরকে খুন করে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না আপনি, মি. গুইদেরোনি,' বলল ও। 'কী করছি

আমরা... কী আবিষ্কার করেছি, তার খবর অনেকেই জানে। শুধু প্রমাণ নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে ওরা, এমনটা ভাবলে বিরাট ভুল করবেন। নিজেই তো বললেন, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছাড়বে না কোনও সরকার। তার আগে আপনাদেরকে ঠেকানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। নিশ্চিত থাকুন।'

এমনভাবে হেসে উঠল গুইদেরোনি, যেন খুব মজার কথা বলছে রানা। বলল, 'আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও তোমার কোনও ধারণা নেই, রানা। যারা অ্যাকশন নেবে বলে ভাবছ, তাদের সবাই এখন আমাদের পকেটে। আজ রাতে তাদের অনেকেই হাজির আছে এখানে। দেখতে চাও?'

লাইব্রেরির একপ্রান্তে চলে গেল সে। কর্ড টেনে দেয়াল ঢেকে রাখা বিশাল দুটো পর্দা সরাল। ওপাশটা কাঁচের তৈরি, স্বচ্ছ দেয়াল ভেদ করে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক কনফারেন্স রুম। মাঝখানে বৃত্তাকার এক টেবিল ঘিরে বসে আছে বেশ কিছু মানুষ। সভা চলছে ওখানে। পর্দা সরাবার পরেও কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না তাদের মাঝে। রানা বুঝল, কাঁচটা আসলে একমুখী। ওপাশ থেকে লাইব্রেরির অভ্যন্তর দেখা যায় না।

কনফারেন্স রুমের একপাশের দেয়ালে বড় একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ঝুলছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন মানুষ পয়েন্টার হাতে নির্দেশ করছে সেটার বিভিন্ন অংশ, ব্রিফ করে চলেছে সভায় উপস্থিত সঙ্গীদেরকে। কথা শোনা গেল না, রুমটা সাউণ্ডপ্রুফ। তবে লোকটাকে চিনতে পারল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ; জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের মৃত্যুর পর এ-লোকই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তাঁর।

'জেনারেলকে মনে হয় চিনতে পেরেছ তুমি,' রানার মুখভঙ্গি লক্ষ করে বলে উঠল রাখাল বালক। 'ওকে এই পদে বসানোর

জন্যই সরিয়ে দেয়া হয়েছে আগের জেনারেলকে। একটু ভাল করে তাকাও, বাকিদেরকেও চিনতে পারবে।'

একে একে কনফারেন্স টেবিলে বসা মুখগুলো ভাল করে লক্ষ করল রানা। শিরদাঁড়ায় বইতে শুরু করল শীতল স্রোত। সেক্রেটারি অভ স্টেট, সিআইএ-র ডিরেক্টর, এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, প্রেসিডেন্টের চিফ অ্যাডভাইজর... এমনি বেশ কিছু নামীদামি মার্কিন ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাচ্ছে—মাসিমো গুইদেরোনি ওরফে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনির দু'পাশে বসে আছে। শুধু তাই নয়, সভায় উপস্থিত রয়েছে রাশান অ্যাম্বাস্যাডর, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চিফ, চিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জার্মান পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার-সহ অন্তত বিশজন উচ্চপদস্থ লোক। ইটালি থেকে বার্নার্দো পাভোরোনিও এসেছে, ছবি দেখা থাকায় চেনা গেল তাকে। এতগুলো প্রভাবশালী লোক ফেনিসের সদস্য, তা ভাবা যায় না!

পায়ে পায়ে কাঁচের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ওর কাছে এসে মুচকি হাসল গুইদেরোনি। 'ইম্প্রেসিভ, তাই না? তাও তো এখানে কাউন্সিলের সবাই নেই! ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকায় সবার পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।'

'আর কে কে আছে এই কাউন্সিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিস্তারিত তালিকা চাও? আমার ডেস্কে আছে। কিন্তু দেখে কী লাভ? কাউকে ওদের নাম জানাবার সুযোগ পাচ্ছ না তুমি।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে চোখ পড়ল রানার। দৃষ্টির ইশারায় কী যেন বলতে চাইছেন তিনি। পিছন থেকে হুইলচেয়ারের পাশে চলে এসেছে চার্লি, একহাতে আস্তে আস্তে চাকা ঘুরিয়ে ওর দিকে ঘুরতে শুরু করেছেন তিনি। বুঝতে পারল রানা তাঁর মতলব—থাবা দিয়ে চার্লির হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিতে চাইছেন

অ্যাডমিরাল। ইশারা করছেন কথা চালিয়ে যেতে, যাতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকে গুইদেরোনি আর বেঈমান শোফারের।

চট করে ঘড়ি দেখে নিল রানা। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ম্যাহোনি ড্রাইভে সেট করা বোমাগুলো ফাটতে শুরু করবে আর ছ'মিনিট পর। ওটাই ওর শেষ ভরসা। বিস্ফোরণগুলো ডাইভারশন হিসেবে কাজ করবে. সেই সুযোগে যদি বেরিয়ে পড়া যায় এই মৃত্যুপুরী থেকে! কিন্তু তার আগে ঘায়েল করতে হবে চার্লি আর রাখাল বালককে। কনফারেন্স রুমে একজন অস্ত্রধারী প্রহরী আছে বটে, কিন্তু একমুখী কাঁচ আর সাউণ্ডপ্রুফ কামরার কারণে লাইব্রেরিতে কী ঘটছে, তার কিছুই টের পাবে না সে। এখন শুধু কথা বলে ব্যস্ত রাখতে হবে দুই শত্রুকে।

'গুইদেরোনির দিকে ফিরল ও। 'ভিলা বারেমির সেই রাতের কথা মনে আছে আপনার, যে-রাতে গিলবার্তো বারেমিকে খুন করেছিলেন?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল বৃদ্ধ ম্যানিয়াক। 'ওটা ভুলবার মত স্মৃতি নয়। তবে পাদ্রোনিকে খুন করিনি আমি, শুধু আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি। খামোকা ওই কথা টানছ কেন?'

'একটা খটকা দূর করবার জন্য। বুঝতে পারছি না, কী ভেবে মাত্র দশ বছর বয়সী একটা বাচ্চার হাতে ফেনিসকে ছেড়ে গেলেন কাউন্ট বারেমি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

'এ-ই কথা?' একটু যেন আগ্রহী হয়ে উঠল গুইদেরোনি। 'বয়স দশ বছর হলেও তার চারগুণ ম্যাচিউর্ড ছিলাম আমি... চারগুণ জ্ঞান ছিল আমার। বুঝলে না এখনও? চাইল্ড জিনিয়াস ছিলাম আমি, রানা... একজন প্রডিজি। ওই বয়সেই শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। কথা বলতে পারতাম

ছ'টা ভাষায়! সেটা জানতে পেরে আমাকে নিজের শিষ্য বানিয়ে নেন পাদ্রোনি। ঔরসে জন্ম না নিয়েও আমি হয়ে উঠেছিলাম তাঁর আরেক সন্তান। আমার কাছে ফেনিসকে দিয়ে যাবেন না তো কার কাছে দিয়ে যাবেন? আমার ভবিষ্যৎও ঠিক করে দিয়ে যান তিনি...'

আড়চোখে অ্যাডমিরালকে দেখল রানা, এখনও ঘুরছেন তিনি। 'ম্যাহোনি পরিবারের সঙ্গে তা হলে কাউন্ট বারেমি-ই চুক্তি করে গিয়েছিলেন আপনার ব্যাপারে?'

মাথা ঝাঁকাল গুইদেরোনি। 'আমেরিকা ছিল লজিকাল চয়েস। এ-দেশে তখন বিস্ময়কর গতিতে শিল্প-বিপ্লব ঘটছে। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন সুযোগ। প্রতিভাবান একজন শিশুর বিকাশের জন্য এরচেয়ে ভাল পরিবেশ আর হতে পারে না।'

'আপনি তো বিয়ে করেছিলেন?'

'বিয়ে না, আমি শুধু আবাদের জন্য একখণ্ড জমি সংগ্রহ করেছিলাম—নিখুঁত একজন নারী, যার গর্ভে আমার উত্তরসূরি জন্ম নিতে পারে। আমাদের ছকে ওর ভূমিকা বহু আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল।'

'আসল ডেভিড ম্যাহোনির মৃত্যুও কি সেই ছকেরই অংশ?'

'যে-প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা, তা না করলেই কি নয়?' বিরক্ত স্বরে বলল গুইদেরোনি। 'যথেষ্ট কথা হয়েছে, এবার তোমাকে বিদায় জানানোর পালা।'

আর দেরি করা চলে না। জায়গামত পৌঁছে গেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝোঁকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে হুইলচেয়ার থেকে ঝাঁপ দিলেন নুমা চিফ, খপ্ করে ধরে ফেললেন চার্লির পিস্তলধরা হাত, শুরু হলো ধস্তাধস্তি। তবে তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। হঠাৎ গর্জে উঠল অস্ত্রটা, কাত

হয়ে পড়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

ঝট্ করে সিধে হলো চার্লি, পিস্তল ঘোরাল রানার দিকে। তবে ততক্ষণে ওর হাতেও বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার দেয়া পিস্তলটা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার চাপল ও, কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়ল বিশ্বাসঘাতক শোফার। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আছাড় খাওয়ার আগেই।

যন্ত্রচালিতের মত দরজার দিকে ঘুরে গেল রানা। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করে পরমুহূর্তে দুই গার্ড ঢুকল লাইব্রেরিতে—এরাই ওকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছিল, লাইব্রেরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল হলঘরে। নিমেষে আগুন ঝরাল ওর পিস্তল। ধরাশায়ী হলো দুই গার্ড। এবার জিয়োভান্নি গুইদেরোনির দিকে ব্যারেল ঘোরাল রানা।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে ফেনিস-অধিপতি। নিজের দিকে পিস্তল তাক হতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল, নড়ে উঠল সে। ছুটে পালাতে চাইল, কিন্তু থেমে গেল রানার মৃত্যুশীতল কণ্ঠ শুনে।

'ডোন্ট মুভ, মি. গুইদেরোনি!'

চকিতে কাঁচের দেয়ালের দিকে তাকাল রানা। কনফারেন্স রুমে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালের এপাশে কী ঘটেছে, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই তাদের কারও।

'ক্... কীভাবে?' তোতলাল গুইদেরোনি। 'বাড়িতে ঢোকার আগে সার্চ করা হয়েছে তোমাকে। পিস্তল পেলে কোথায়?'

'আপনার চেয়ে অনেক বড় আরেক জিনিয়াসের কাছ থেকে।' পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে, কলার চেপে তাকে ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন, আপনার মত নরকের কীটকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। কথামত যদি কাজ না করেন,

খুব আনন্দের সঙ্গে ট্রিগার চাপব আমি...'

'না!' আতঙ্ক ফুটল রাখাল বালকের চেহারায়। 'মেরো না আমাকে। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি...'

'হবেও না কোনোদিন,' হিংস্র গলায় বলল রানা।

বয়েলস্টোন স্ট্রিটের পুলিশ স্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট বিরক্ত চোখে তাকাল সামনে দাঁড়ানো শুকনো মহিলার দিকে। মেসেঞ্জার সার্ভিসের ইউনিফর্ম পরে আছে, চেহারায় রাগ। অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনি খামটা অমন হেলাফেলা করে ফেলে রাখলেন কেন?'

'দেখুন ম্যা'ম,' বলল সার্জেন্ট, 'আপনার কাজ ডেলিভারি দেয়া. ডেলিভারি দিয়েছেন। এখন আমি কী করি, সেটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে আপনার।'

'কিন্তু আপনাদের লোক তো বলেছিল, মেসেজটা জরুরি! ওটা এভাবে ফেলে রাখলে চলবে কী করে?'

'আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ। ইন্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন সেকশনে কাজ করে। বলল আজ রাতে নাকি মহড়া আছে আপনাদের, সেটার জন্য এই মেসেজটা পৌনে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছুতে হবে এখানে!'

'আজ কোনও মহড়া নেই আমাদের। ইন্টার-ডিভিশনাল এগজামিনেশন নামেও কোনও সেকশন নেই আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে।' সন্দিহান হয়ে উঠল সার্জেন্ট। তাড়াতাড়ি খামটা খুলল। ভিতর থেকে বেরুল হলুদ একটা কাগজ—কালো মার্কার দিয়ে তাতে একটা চিঠি লেখা হয়েছে। চোখ বুলিয়েই আঁতকে উঠল সে। চেঁচাল, 'অ্যাই, কে আছ... এই মহিলাকে আটকাও!'

চোখের পলকে উদয় হলো দু'জন পুলিশ, ধরে ফেলল এডিথকে। সে-ও চেঁচাতে শুরু করল।

হইচই শুনে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্টেশনের ডিউটি অফিসার। ডেস্ক সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? গোলমাল কীসের?'

জবাব না দিয়ে তার হাতে হলুদ কাগজটা ধরিয়ে দিল সার্জেন্ট। পড়ল অফিসার:

বস্টনের বেজন্মা পরিবার আর অ্যালাব্যাস্টার ব্রাইডের রক্ষাকর্তাদের জন্য আমাদের এই বার্তা। নিপাত যাক ধনী রক্তচোষারা! ধ্বংস হোক ম্যাহোনি হল্! তোমরা যখন এ-বার্তা পড়ছ, তখন আমাদের বোমা ধ্বংস করতে যাচ্ছে মানবজাতির কলঙ্ক জিয়োভান্নি গুইদেরোনিকে। সুইডসাইড স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে তার প্রাসাদে. ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে সব। এই শহর মুক্তি পাবে শয়তানটার অশুভ ছায়া থেকে।

—থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি অভ লিবারেশন অ্যাণ্ড জাস্টিস।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল পুলিশ অফিসার। দ্রুত নির্দেশ দিল সার্জেন্টকে। 'এক্ষুণি ফোন করো ম্যাহোনি হলে, ওখানকার সিকিউরিটিকে জানিয়ে দাও কী ঘটতে চলেছে। আশপাশে যত প্যাট্রোল কার আছে, সবাইকে যেতে বলো ওখানে। কুইক! আমি যাচ্ছি সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে। সোয়াট টিম চাই আমাদের!'

গুইদেরোনির দিকে পিস্তল তাক করে রেখে অ্যাডমিরাল

হ্যামিলটনকে পরীক্ষা করল রানা। বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। তাঁকে একটা রুমাল দিল ও, ক্ষতটা চেপে ধরে রাখতে বলল। তারপর মনোযোগ দিল ফেনিস-অধিপতির দিকে।

'কী চাও তুমি?' খ্যাপাটে গলায় প্রশ্ন করল গুইদেরোনি। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে।

'আগে যা চেয়েছি, তা-ই,' রানা বলল। 'আমার বন্ধুদেরকে উদ্ধার করতে। তবে এখন নতুন দুটো জিনিস যোগ হয়েছে। কাউন্সিল মেম্বারদের একটা তালিকা আছে বলেছিলেন... ওটা সঙ্গে নিয়ে যাব। আর নেব ডেন্টাল রেকর্ডগুলো। বের করুন ওগুলো।'

নড়ল না গুইদেরোনি। 'খামোকা সময় নষ্ট করছ, রানা। কিছুতেই পালাতে পারবে না তুমি। বাড়ির ভিতর-বাইরে অসংখ্য গার্ড। কনফারেন্স রুমের মত লাইব্রেরিটাও সাউণ্ডপ্রুফ বলে এখনও কিছু টের পায়নি ওরা, কিন্তু নিশ্চিত থাকো—বাইরে পা রাখামাত্র বাধা দেয়া হবে তোমাকে।'

'ওটা আমি বুঝব,' রানা নির্বিকার। 'তালিকাটা... প্লিজ।'

চোয়াল শক্ত করে ডেস্কের পিছনে গেল গুইদেরোনি। ড্রয়ার থেকে বের করে আনল একটা ফাইল। ওটা হাতে নিয়ে পলকের জন্য চোখ বোলাল রানা। অনেকগুলো নাম-ঠিকানা লেখা আছে ভিতরে। রয়েছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে পাঠানো প্যাকেটটাও। সন্তুষ্ট হয়ে কোটের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সব।

ঠিক এই সময়ে ডেস্কে রাখা ইন্টারকম বেজে উঠল। জবাব দেয়া না হলে অস্বাভাবিক দেখাবে, তাই রানা বলল, 'স্পিকার অন্ করুন।'

সুইচ টিপল গুইদেরোনি। শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ:

'বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত, স্যর। আমি সিকিউরিটি সেন্টার

থেকে বলছি। বস্টন পুলিশ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা—থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি নামে একটা সন্ত্রাসীদল নাকি বোমা হামলা করতে চলেছে এখানে। আমাদের লিস্টে এ-জাতীয় কোনও সংগঠনের নাম নেই। হুমকিটা ভুয়া হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু বস্টন পুলিশ কোনও কথা শুনতে চাইছে না। ওরা সোয়াট টিম পাঠাচ্ছে এখানে।'

রাজি হবার জন্য ইঙ্গিত করল রানা। তাই গুইদেরোনি বলল, 'ঠিক আছে, আসতে দাও ওদেরকে। কিন্তু এস্টেটের ভিতরে ঢুকতে দিয়ো না, বাইরে পাহারা দেবে।' শেষ কথাটা নিজেই যোগ করল। এরপরে ইন্টারকমের লাইন কেটে দিয়ে হাসিমুখে তাকাল রানার দিকে।

'কাজটা ভাল করলেন না,' থমথমে গলায় বলল রানা।

'পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে?' হাসি বিস্তৃত হলো গুইদেরোনির। 'ঢুকলেই বা কী করতে পারবে? ভেবেছ ওরা উদ্ধার করবে তোমাদেরকে? বড্ড কাঁচা চাল দিয়েছ তুমি, রানা। থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি... হাহ্! অ্যামেরিকান আর্মিও এখন তোমার কাজে আসবে না। বাড়ির বাইরে পা দেয়ামাত্র তোমাদেরকে গুলি করে ফেলে দেবে আমার লোক। অর্ডার দেয়া আছে।'

'আপনি সঙ্গে থাকলেও?'

মুখের হাসি মুছে গেল গুইদেরোনির।

'জী, মি. গুইদেরোনি,' বলল রানা, 'আপনিও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। এসকর্ট করে বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।'

'কক্ষনো না।'

'তা হলে আপনাকে বেহুঁশ করে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাতেও কাজ হবার কথা।'

নিষ্ফল আক্রোশে গরগর করে উঠল রাখাল বালক। তাকে

পাত্তা না দিয়ে আবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে গেল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, হাঁটতে পারবেন আপনি?'

'না, রানা,' মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আমার কথা ভুলে যাও।'

'উঁহুঁ। আপনাকে ফেলে যাচ্ছি না আমি।'

অ্যাডমিরালের আপত্তির মুখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা, তাঁকে প্রায় জোর করেই ওঠাতে শুরু করল হুইলচেয়ারে। ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ টুটে গেল গুইদেরোনির দিক থেকে, নড়ে গেল পিস্তলের নল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার শরীরে। ডেস্কের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল, লুকানো খোপ থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট পিস্তল। চমকে ওদিকে তাকাল রানা, পরক্ষণে অ্যাডমিরালকে নিয়ে ঝাঁপ দিল মেঝেতে।

আগুন বর্ষণ করল গুইদেরোনির পিস্তল, ওদের শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। মেঝেতে একটা গড়ান দিল রানা, পিস্তল সোজা করে পাল্টা গুলি করল ও-ও, নিশানা ঠিক করবার জন্য সময় নিল না।

ফেনিস-অধিপতির গলায় আঘাত হানল বুলেট। ঘড়ঘড় শব্দ তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। একহাতে চেপে ধরল ক্ষতস্থান, অন্যহাতে ধরা পিস্তল তাক করে আবার গুলি করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না রানা। ট্রিগার চাপল নিষ্কম্প হাতে। হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ক্ষত নিয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ল মহাপ্রতাপশালী জিয়োভান্নি গুইদেরোনি। একটু ঝাঁকুনি খেয়ে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

'স্যর, আপনি ঠিক আছেন?' অ্যাডমিরালকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন হ্যামিলটন। তাকালেন গুইদেরোনির লাশের

দিকে। 'ওকে খুন করে ফেললে? এখন তা হলে এ-বাড়ি থেকে বের হবে কীভাবে?'

'ডাইভারশনের সুযোগ নিতে হবে আমাদেরকে।' ঘড়ি দেখল রানা। সময় হয়ে গেছে প্রায়, আর এক মিনিট পর ফাটতে শুরু করবে ম্যাহোনি ড্রাইভে পেতে রাখা বোমাগুলো।

কনফারেন্স রুমের দিকে তাকাল ও। জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফের ব্রিফিং থেমে গেছে, সবার মধ্যে চাঞ্চল্য। না, লাইব্রেরির বন্দুকযুদ্ধ টের পায়নি ওরা, তবে সম্ভবত পুলিশ আসবার খবর পেয়েছে। তাদের কাছে উচ্চপদস্থ এতজন লোকের সমাবেশ ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে যাবে, তাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে ওরা। তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো, বোধহয় কী করা হবে, তা নিয়েই।

'সময় নেই আমাদের হাতে,' অ্যাডমিরালকে হুইলচেয়ারে ওঠাতে ওঠাতে বলল রানা। 'ওরা কনফারেন্স রুম থেকে বেরুলেই সর্বনাশ।'

'আটকে রাখা যায় না?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যামিলটন।

'হয়তো,' বলল রানা। 'চলুন দেখা যাক।'

হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে হলঘরে বেরিয়ে এল রানা, আসার পথে নিহত গার্ডের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে বাড়তি পিস্তল। হলঘর এ-মুহূর্তে খালি। চারপাশে যতগুলো প্যাসেজ দেখতে পেল, সবগুলোর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি টেনে দিল ও। এতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আটকা পড়বে বাড়ির ভিতরের লোকজন। এরপর অ্যাডমিরালকে নিয়ে চলে গেল সোনিয়া-কুয়াশার কামরার দিকে। তালা ঝুলছে বাইরে, লাথি মেরে পাল্লা ভেঙে ফেলল রানা, ঢুকল ভিতরে।

দুই বন্দিকে ব্যস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। শরীরের বেহাল দশাকে পাত্তা না দিয়ে উঠে পড়েছে কুয়াশা। সোনিয়ার সাহায্য

নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে বালিশ, বিছানার চাদর আর তোষক। ছড়িয়ে রেখেছে সারা ঘরময়। খাটের পায়াও ভেঙেছে, ন্যাকড়া পেঁচিয়ে বানিয়ে নিয়েছে দুটো মশাল।

'কী করছেন আপনারা?' বিস্মিত রানা প্রশ্ন করল।

'আগুন লাগাবার প্ল্যান করেছেন মি. কুয়াশা,' জবাব দিল সোনিয়া।

'ভাল আইডিয়া,' মাথা ঝাঁকাল রানা। বাড়িতে আগুন দেখা দিলে কাউন্সিলের লোকেরা আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। বাধ্য হবে বেরিয়ে আসতে—পুলিশের সামনে... দুনিয়ার সামনে! 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করো: সময় নেই আমাদের হাতে...'

কথা শেষ হতে না হতে দূর থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ—প্রথমে একটা, দশ সেকেণ্ড পর আরেকটা। ফাটতে শুরু করেছে ম্যাহোনি ড্রাইভের তলায় লুকিয়ে রাখা বোমাগুলো। তার পিছু পিছু ভেসে এল উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচি—বাড়ির ভিতর-বাহির দু'দিক থেকেই।

'কুইক!' বলে সামনে বাড়ল রানা। কুয়াশা ইতিমধ্যে মশালদুটো জ্বেলেছে, একটা নিয়ে নিল তার হাত থেকে। আগুন ধরাল মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা তুলা আর ন্যাকড়ার স্তূপে। ধরাল জানালায় ঝুলতে থাকা পর্দাতেও।

ততক্ষণে আরও চারটে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। কুয়াশাকে টেনে ওঠাল রানা, নিজের কাঁধে ভর রাখতে দিল। সোনিয়াকে বলল, 'হুইলচেয়ার ঠেলো তুমি, সোনিয়া।'

ব্যস্ত ছিল বলে এতক্ষণ খেয়াল করেনি, কিন্তু এবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল কুয়াশা। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'উনি কোত্থেকে?'

'রাখাল বালকের কাজ,' রানা জানাল। 'ধরে নিয়ে এসেছে।

আর কথা নয়, চলুন।'

কামরা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে তখন নরক ভেঙে পড়েছে। বাড়ির ভিতরেও কমবেশি একই অবস্থা। বন্ধ দরজার ওপাশে আটকা পড়েছে মানুষ, ধুমধাম বাড়ি পড়ছে পাল্লায়। কনফারেন্স রুমের দিকের দরজাটা প্রায় ভেঙে পড়েছে, খুব শীঘ্রি বেরিয়ে আসবে সশস্ত্র গার্ডরা।

রানাকে ছেড়ে দিল কুয়াশা। খুঁড়িয়ে সরে গেল দু'পা।

'কী করছেন আপনি?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যা করতে চাইছ, তাতে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা,' শান্ত কণ্ঠে জানাল কুয়াশা। 'দু-দু'জন আহত মানুষকে বয়ে নিতে গেলে কেউই বেরোতে পারবে না এখান থেকে। বাইরের গার্ডরা বাধা দেবে তোমাকে, দরজা ভেঙে হামলা চালাবে ভিতরের লোক-ও। ফাঁদে পড়ে যাবে তুমি।'

'কী বলতে চান?'

'পিস্তল দাও, এদিকটা আমি কাভার দেব। বোঝা কম থাকবে তোমার, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর সোনিয়াকে নিয়ে সহজেই পালাতে পারবে।'

'না, কুয়াশা!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আপনাকে রেখে যাব না আমি।'

'পাগলামি কোরো না!' ধমক দিল কুয়াশা। 'চারজনের চেয়ে একজনের মরা ভাল না? তা ছাড়া একা মরব না আমি, ফেনিসের মাথাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।' বন্ধ দরজার দিকে ইশারা করল ও।

'প্লিজ, কুয়াশা...' অনুরোধ করবার চেষ্টা করল রানা।

এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে পিস্তল নিয়ে নিল অকুতোভয় মানুষটা। নরম গলায় বলল, 'যাও। যেতেই হবে তোমাকে। আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফেনিসের অভিশাপ এখনও

ছড়িয়ে আছে পুরো দুনিয়াজুড়ে। যদি দু'জনেই মারা যাই, তা হলে সে-অভিশাপ দূর করবার মত কেউ থাকবে না।'

স্থির হয়ে রইল রানা। কী করতে চলেছে কুয়াশা, তা জানতে পেরে শ্রদ্ধায় নুয়ে আসছে মাথা। প্রিয়জন হারাবার মত ব্যথায় ভরে যাচ্ছে অন্তর। চোখ ভরে আসতে চাইছে পানিতে।

কামরা থেকে মশাল নিয়ে এল কুয়াশা। হলঘরের একপাশে আগুন ধরাতে ধরাতে চেঁচাল, 'যাও, রানা! যাও!!'

দাঁতে দাঁত পিষে ভাবাবেগ দমন করল রানা। কোমর থেকে বাড়তি পিস্তলটা বের করল, যেটা লাইব্রেরির মৃত গার্ডের কাছ থেকে এনেছে। তারপর সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুভ!'

'কিন্তু কুয়াশা...' বলার চেষ্টা করল সোনিয়া।

'ফরগেট হিম,' রুক্ষ গলায় বলল রানা। 'এগোও।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দেখতে পেল পোর্চের তলায় গাড়ির দীর্ঘ সারি। গোলমালের আভাস পেতেই বাহন নিয়ে ছুটে এসেছে বিশ্বস্ত শোফাররা, তাদের মনিবদেরকে সরিয়ে নেবার জন্য। ইঞ্জিন চালু রেখে ড্রাইভিং সিটে অপেক্ষা করছে, মুহূর্তের নোটিশে কেটে পড়বার জন্য তৈরি। সন্দেহ নেই, এদের প্রত্যেকে ফেনিসের অনুগত।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল গুলিবর্ষণের শব্দ। দরজা ভেঙে ফেলেছে গার্ডের দল। বেরিয়ে আসতে চাইছে হলঘরে, গুলি করে ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখছে কুয়াশা।

একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ, তারপর আবার বাড়ির ভিতরে গোলাগুলি... হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে শোফারের দল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল রানা। এক ঝটকায় অ্যাডমিরালকে কাঁধে তুলে নিল, তারপর তীরবেগে নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে গেল প্রথম গাড়িটার কাছে।

ঝট্ করে ব্যাকডোর খুলল রানা, অ্যাডমিরালকে খড়ের তৈরি পুতুলের মত ছুঁড়ে দিল পিছনের সিটে—এখন তাঁর সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর দেবার সময় নেই। সোনিয়াও এসেছে পিছু পিছু, ওর জন্য দরজাটা খোলা রেখে সামনে এগিয়ে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে ফেলল ও, ভিতরে বসা হতভম্ব শোফারের চোয়ালে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি ঝাড়ল। তারপর কলার চেপে ধরে বের করে আনল ভিতর থেকে, ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও। ইঞ্জিন চালুই আছে, গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর।

টায়ার ঘর্ষণের বিচ্ছিরি শব্দ হলো, জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল গাড়ি। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, আড়াআড়িভাবে লন পেরিয়ে এস্টেটের ফটকে পৌঁছুতে চাইছে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, কোথায় লাগল বোঝা গেল না। হঠাৎ করে সামনে একদল গার্ড উদয় হলো, কর্ডন করবার ভঙ্গিতে এগোবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। সবার হাতে উজি সাবমেশিনগান—ধরেছে উঁচু করে, ফায়ার করতে যাচ্ছে গাড়ির উপর।

নিচু হয়ে গেল রানা, কুঁকড়ে ফেলল শরীরকে, কিন্তু গতি কমাল না। প্রচণ্ড গতিতে কর্ডনকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ি। দু'জন পড়েছে বাম্পারের সামনে, ট্রিগার চাপার সময় পায়নি, তার বদলে আছড়ে পড়ল উইণ্ডশিল্ডের উপর, মড়মড় করে ভাঙল কাঁচ। দলা-পাকানো লাশদুটো মুহূর্তের জন্য স্থির থাকল, তারপর খসে পড়ল মাটিতে। কর্ডনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল, সেখান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল রানা বেষ্টনী ভেদ করে।

পলায়নরত বাহনটার পিছু পিছু দৌড়াতে শুরু করল বাকি গার্ডরা, অস্ত্র তুলে ফায়ারও করছে একই সঙ্গে। গাড়ির পিছনে

ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

'মাথা নামিয়ে রাখো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে গাড়ি, একটু পরে পিছে ফেলে দিল পদব্রজে ছুটতে থাকা ধাওয়াকারীদের। সামনে আরও গার্ড আছে, কিন্তু গুলি করল না। গেটের ওপাশে হাজির হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী, সম্ভবত তাদের সামনে অযাচিত দৃশ্যের অবতারণা করতে চায় না। তার বদলে বন্ধ করে দিতে শুরু করল মেইন গেটের পাল্লা। ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, গেট পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে।

গাড়ির চেসিসের ধাক্কায় বেঁকে গেল পাল্লা, ছিটকে গেল দু'দিকে। সেই ধাক্কায় উড়ে গেল কয়েকজন গার্ড। এস্টেটের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি। রাস্তার উপর জটলা পাকিয়ে থাকা পুলিশ-সদস্যরা ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল ওটার গতিপথ থেকে।

আচমকা একটা পুলিশ ভ্যান দেখতে পেল রানা, পার্ক করে রাখা হয়েছে ঠিক ওর মুখোমুখি। ব্রেক কষল ও, বন বন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং। মাতালের মত ঘুরে গেল গাড়ি, কিন্তু থামল না পুরোপুরি। স্কিড করে সোজা আছড়ে পড়ল ভ্যানের গায়ে। চেসিসের ডানপাশ থেঁতলে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

স্টিয়ারিঙের সঙ্গে ভীষণ এক বাড়ি খেয়েছে রানা, কপাল কেটে ঝরঝর করে নামছে রক্ত। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল উবু হয়ে। চারপাশে হইচই শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছুটে এল ইউনিফর্মধারী পুলিশ, ওকে টেনে-হেঁচড়ে নামাল গাড়ি থেকে। বনেটের উপর উপুড় করে ফেলা হলো ওকে, দু'হাত পিছমোড়া

করে লাগিয়ে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ।

বাধা দিল না রানা। ম্যাহোনি হলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ও। আগুন ধরে গেছে প্রাসাদোপম বিশাল বাড়িটাতে। লেলিহান শিখায় পুড়ছে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির আবাস... কাউন্সিল অভ ফেনিসের মিলনস্থল।

'থামো তোমরা!' শোনা গেল বাজখাঁই গলা। ধমক দিয়ে উঠেছেন অ্যাডমিরাল **হ্যামিলটন**। **'আমি অ্যাডমিরাল** জর্জ হ্যামিলটন, ডিরেক্টর অভ ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। এখানকার ইনচার্জ কে? তোমাদের পুলিশ চিফের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

পরিচয় পেয়ে সটান স্যালিউট ঠুকল পুলিশেরা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে। আর কোনও চিন্তা নেই, পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য মাঠে নেমে পড়েছেন নুমা চিফ। বুকটা হু-হু করছে শুধু কুয়াশার কথা ভেবে। ওদেরকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিল আশ্চর্য, মহৎ মানুষটা।

হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হলো। **ওর পাশে এসে দাঁড়াল** সোনিয়া। একই অনুভূতি কাজ করছে ওর ভিতরেও। চোখ দিয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। সোনিয়াকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। দু'জনে একসাথে মাথা নোয়াল জ্বলন্ত ম্যাহোনি হলের দিকে ফিরে... এক অকুতোভয় বীরের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

বাইশ

পরের এক মাসে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটল গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দৃশ্যপটে। বড় বড় বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ অনেক মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, গ্রেফতার হলেন, কিংবা প্রাণ হারালেন রহস্যময় দুর্ঘটনায়, আত্মহত্যা করলেন, এমন লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বলা বাহুল্য, এর সবই ঘটল ম্যাহোনি হল থেকে রানার উদ্ধার করে আনা ডেন্টাল রেকর্ড এবং ফেনিস কাউন্সিলের তালিকার বদৌলতে। সংবাদপত্রগুলো মুখর হয়ে রইল নানা ধরনের গুজব এবং বানোয়াট কাহিনিতে, কিন্তু আসল ঘটনা জানতে পারল না সাধারণ মানুষ। মূল সত্যকে ধামাচাপা দেয়া হলো রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে।

এ-কাজে সবচেয়ে ব্যস্ত রইল আমেরিকান প্রশাসন। জনগণের কাছে সিনেটর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড-এর মৃত্যুর বিবরণ দেয়া হলো নিয়তির নির্মম পরিহাস হিসেবে—ম্যাসাচুসেটস্ হাইওয়েতে সড়ক-দুর্ঘটনায়। ঠিক এমনই একটা দুর্ঘটনা থেকে বিশ বছর আগে *রক্ষা* পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে ব্যথিত হলো সরকার। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশের জন্য একটা বিমানে চেপে রওনা হলেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সেটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ক্র্যাশ করল কলোরাডো পর্বতমালায়। জানা

গেল, তাতে সেক্রেটারি অভ স্টেট, নতুন জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ, সিআইএ ডিরেক্টর, এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর-সহ বেশ ক'জন উঁচুসারির ব্যক্তিত্ব মারা গেছেন। প্রচারমাধ্যমে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল প্রেসিডেন্টের—নির্দেশ দিলেন, আগামীতে উঁচু পদের কর্মকর্তারা একসঙ্গে বিমানভ্রমণ করতে পারবেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ-ধরনের প্রাণহানি এক অপূরণীয় ক্ষতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। টানা সাতদিন রাষ্ট্রীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ঘোষণা দিলেন তিনি।

ম্যাহোনি হলের অগ্নিকাণ্ড এবং তাতে জিয়োভান্নি গুইদেরোনির মৃত্যু নিয়েও নানা রকম বিবৃতি দিল সরকার। গঠন করা হলো উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত কমিটি। মাসশেষে তাদের দেয়া রিপোর্টে জানা গেল, থার্ড ওয়ার্ল্ড আর্মি অভ লিবারেশন অ্যাণ্ড জাস্টিস নামে একটি সংগঠন ওই ঘটনার জন্য দায়ী। এফবিআই এবং ইন্টারপোল থেকে হুলিয়া জারি করা হলো ওই সংগঠনের সদস্যদের নামে। সরকার এ-ও জানাল, জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারের হত্যাকাণ্ড আসলে ওরাই ঘটিয়েছে। জনৈক মাসুদ রানার নামে ইতিপূর্বে জারি করা হুলিয়া ফিরিয়ে নিল তারা। রাশাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলো মনসুর আলী কুয়াশার ব্যাপারে।

পত্রিকাঅলারা অনেক খোঁজাখুঁজি করল এই বিশেষ দু'জন মানুষকে—তাদের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও পাওয়া গেল না ওদেরকে। কেন ওদের নামে মিথ্যে অভিযোগ দেয়া হয়েছিল, কীসের ভিত্তিতে তা আবার প্রত্যাহার করে নেয়া হলো—এসব সাধারণ মানুষ জানতে পারবে না কোনোদিনই।

ক্যারিবিয়ানের এক অজ্ঞাত দ্বীপ।

কটেজের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। শেষ বিকেলের মোলায়েম রোদে সৈকতের বালির উপর শুয়ে আছে সোনিয়া। পরনে একটা টু-পিস বিকিনি, চোখে সানগ্লাস। পায়ের কাছে অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে ফেনাঅলা ঢেউ। রেডিও সেটের পাওয়ার অফ করে কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল ও-ও। ফুসফুস ভরে টেনে নিল তাজা হাওয়া, চোখ বোলাল চারপাশে।

গত একমাস থেকে ছোট্ট এই দ্বীপে আছে ওরা—বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে। পরিস্থিতি গরম থাকায় রানাকে গা ঢাকা দেবার জন্য বলেছিলেন তিনি। তা ছাড়া বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল ওর। চিফের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে রানা—গত কিছুদিনে নারকেল গাছে ছাওয়া ছোট্ট এই স্বর্গে ভালোবাসা, সমুদ্রস্নান আর প্রলম্বিত আড্ডা ছাড়া আর কিছুই করেনি ওরা দুজন।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোনিয়া। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'কথা বলছিলাম আমার বন্ধু সোহেলের সঙ্গে,' জানাল রানা। 'ছুটি শেষ, তলব পাঠিয়েছেন আমার চিফ।' বালিতে ওর পাশে বসে পড়ল ও।

'চলে যাবে তুমি?' ধড়মড় করে উঠে বসল সোনিয়া। 'তা হলে আমার কী হবে?'

'সেটা সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভর করছে। রেড ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইটালিয়ান পুলিশ বড় ধরনের অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে। তোমার সাহায্য চাইছে ওরা। চাইলে যেতে পারো রোমে। ভাল বেতন, সেইসঙ্গে আলাদা সিকিউরিটিও পাবে।'

'যেতে বলছ?'

'জোর দেব না, তবে এটুকু বলব—গেলে উপকৃত হবে বহু

মানুষ। যে-দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে তোমাকে, তা আর কোনও তরুণ-তরুণীর বেলায় ঘটবে না। জেনে রেখো, শুভ যদি অশুভের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়, তা হলে কোনোদিনই শান্তি আসবে না পৃথিবীতে।'

একটু ভাবল সোনিয়া। 'ঠিক আছে, যাব তা হলে। আর কিছু না হোক, মি. কুয়াশার জন্য। ওঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চাই আমি... পৃথিবীকে মুক্ত করতে চাই সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে।'

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানো?' ইতস্তত করে বলল রানা। 'সোহেল বলল, ম্যাহোনি হলের ধ্বংসস্তূপে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কুয়াশার লাশ পাওয়া যায়নি।'

'কী?' চমকে উঠল সোনিয়া। 'উনি মারা যাননি?'

'না, না, সে-কথা বলছি না। আসলে... শিয়োর হতে পারছে না কেউ। বেশ ক'টা লাশ আইডেন্টিফিকেশনের অযোগ্য অবস্থায় পাওয়া গেছে—খুব বেশি পুড়ে গেছে ওগুলো, কিংবা ইঁট-পাথরের তলায় পড়ে থেঁতলে গেছে। ওর মধ্যে থাকতে পারে কুয়াশা। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'ইশ্‌শ্‌... যদি সত্যিই বেঁচে থাকতেন!' গলা ধরে এল সোনিয়ার।

'থাক, ওর কথা ভেবে এখন আর মন খারাপ কোরো না।' ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'কাল চলে যেতে হবে... আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের হাতে। চলো, এই সময়টুকু স্মরণীয় করে রাখি।'

চোখ মুছল সোনিয়া। 'কীভাবে?'

'অনেক রকম আইডিয়া আছে আমার মাথায়,' অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে সবগুলোর শুরু হচ্ছে এভাবে...'

সোনিয়াকে চুমো খেতে গেল ও। পারল না। ধাক্কা দিয়ে ওকে

সরিয়ে দিল মেয়েটা। খিলখিল করে হেসে ছুটতে শুরু করল পানির দিকে। ওকে তাড়া করল রানা। পানির ধারে গিয়ে ধরে ফেলল জাপটে, দু'জনে পড়ে গেল ফেনাময় ঢেউয়ের মাঝখানে।

একটু ধস্তাধস্তি করল সোনিয়া, তারপর হার মানল। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া। কিন্তু থেমে গেল মাঝপথে। বিস্মিত হয়ে তাকাল দূরের নারকেল-বীথির দিকে। মিষ্টি একটা সুর ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'শুনতে পাচ্ছ?' বলল রানা। 'সরোদ বাজছে!'

'তো?'

'অস্বাভাবিক না? এই দ্বীপে অল্প ক'ঘর জেলে ছাড়া আর কেউ থাকে না। তা হলে সরোদ বাজাচ্ছে কে?'

'কী বলতে চাও?'

জবাব দিল না রানা। একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভাবছে গিয়ে দেখবে কি না কে ওই সরোদশিল্পী।

'না, যেয়ো না।' ওর মনের কথা পড়তে পেরেই যেন বলে উঠল সোনিয়া। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওকে। 'ভালই তো লাগছে, বাজতে দাও।'

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সোনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিল ও। উত্তাল ঢেউয়ের তলায় ঢাকা পড়ে গেল দুটো শরীর। প্রকৃতিও মেতে উঠেছে যেন সরোদের সুরে।

***